এইচএসবিসি-কালি ও কলম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

# রাজনটী

## স্বকৃত নোমান

BanglaBook.org

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভূগোল দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে দিনে দিনে প্রসারের দিকে। তার গভীরতা মান্যতাপ্রার্থী। বিনোদনের পাল্টা এই সিরিয়াস ধারার কলেবরবৃদ্ধি—এটা সৎসাহিত্যের জন্যে শুভলক্ষণ। ধারাটি আবরণে ক্ষীণ তবে দূরগামী স্থায়ী। শওকত ওসমান, সরদার জয়েনউদ্‌দীন, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আলাউদ্দিন আল আজাদ থেকে ক্ষীণ অথচ বেগবতী ধারায় বয়ে চলেছে এই প্রবাহটি। তরুণ ঔপন্যাসিক স্বকৃত নোমানের *রাজনটী* তার চতুর্থ উপন্যাসমাত্র। বিষয়ে সিরিয়াস প্রকরণে নিরাবেগ। একদা সর্বজনবন্দিতা ও পরিণামে সবার অলক্ষ্যে রাজপুরীত্যাগিনী হেলায় হারানো রাজসমারোহ থেকে শুধুমাত্র আত্মসম্মানটুকু সম্বল করে অজানা পথে অনির্দেশিত নিয়তিযাত্রা, নায়িকা গুলনাহারের একক অভিযাত্রা; সব মিলিয়ে পাঠককে অশ্রুচাপা রুদ্ধশ্বাস সহযাত্রী করে নেয় শেষ ছত্র অব্দি। বাঙালি নারীর এই সম্মান সুরক্ষার দূরপাল্লার একক অভিযান বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ শিল্পসৃষ্টি। ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্মৃত এক কিংবদন্তী লেখকের যাদুকলমে আধুনিকতার হাড়মাংসযোজনায় অমরত্ব লাভ করেছে *রাজনটী* উপন্যাসে।

আবুবকর সিদ্দিক
৩.১১.২০১০

প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

আলোকচিত্রী : অনু হোসেন

স্বকৃত নোমান। কথাসাহিত্যিক। জন্ম ১৯৮০ সালের ৮ নভেম্বর, ফেনীর পরশুরাম উপজেলার সীমান্তবর্তী বিলোনিয়ায়। জ্ঞানার্জন ও লেখালেখিকে জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করেন। স্বভাবে অন্তর্মুখী, আবেগপ্রবণ, যুক্তিবাদী ও প্রকৃতিমনস্ক।

প্রকাশিত উপন্যাস : রাজনটী, বেগানা, হীরকডানা, কালকেউটের সুখ, শেষ জাহাজের আদমেরা।

গল্পগ্রন্থ : নিশিরঙ্গিনী, বালিহাঁসের ডাক, ইবিকাসের বংশধর।

মুক্তগদ্য : উপন্যাসের পথে।

পুরস্কার : এইচএসবিসি-কালি ও কলম পুরস্কার ২০১১, ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল হুমায়ূন আহমেদ তরুণ সাহিত্যিক পুরস্কার ২০১৫, শ্রীপুর সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫, এক্সিম ব্যাংক-অন্যদিন হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬।

বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে কর্মরত।

মেইল : swakritonoman@gmail.com

**www.BanglaBook.org**

# রাজনটী

# রাজনটী

## স্বকৃত নোমান

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার একযুগ পেরিয়ে

**রাজনটী**
*উপন্যাস*
**স্বকৃত নোমান**

**স্বত্ব**
লেখক

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

**প্রথম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারি ২০১১

**প্রকাশক**
**ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ**
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail ittadisutrapat@yahoo.com
web www.ittadigranthoprokash.com

**পরিবেশক**
**যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা**, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
**যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা**, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন

**অনলাইন পরিবেশক**
rokomari.com/ittadi

**প্রচ্ছদ**
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

**অক্ষরায়ন**
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

**ছাপাখানা**
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

**মূল্য**
২৫০ টাকা

Rajnoti by Swakrito Noman, Published by Ittadi Grantho Prokash, New Edition February 2018. Price Tk. 250, ISBN: 984 70289 0190 9

উৎসর্গ

জাকির তালুকদার
চঞ্চল আশরাফ
জ্ঞানযোগী দুই অগ্রজ

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রাজনটী উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। একই বছর এই উপন্যাস *এইচএসবিসি-কালি ও কলম* তরুণ কথাসাহিত্য পুরস্কার পায়। বোধ করি পাঠকরাও গ্রহণ করেছেন উপন্যাসটি। এই উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া যতটা পেয়েছি তা এর আগে লেখা উপন্যাসগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। হয়ত বিষয়বস্তুর কারণে পাঠকরা এটি গ্রহণ করেছেন। প্রায় সোয়া দুই শ বছর আগের একজন নটী এবং তার অর্থে নির্মিত একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে এমন বিষয়বস্তুর উপন্যাস পাঠকদের অবশ্য ভালো লাগারই কথা।

উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশের ছয় বছর পরের কথা। একদিন রাত করে বাসায় ফেরার পর পড়তে কিংবা লিখতে ইচ্ছে করছিল না। ক্লান্ত ছিলাম কিছুটা। আমার কোনো বই প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর সাধারণত পড়ি না। পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সেদিন কী ভেবে আলমিরা থেকে উপন্যাসটি নামিয়ে পড়তে শুরু করলাম। বিস্তর ভুলত্রুটি, শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যের দুর্বলতা চোখে পড়ল।

আমি উপন্যাসটি পুনর্লিখন করতে পারতাম। করলাম না। কারণ, আমি কী ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে লেখালেখির পথ অতিক্রম করেছি, তার সাক্ষী হিসেবে থাকুক উপন্যাসটি। তাতে পরবর্তীকালের পাঠক বুঝতে পারবেন আমার লেখালেখির ধারাবাহিকতা। তাই এই সংস্করণে কিছু শব্দ ও বাক্য সম্পাদনা এবং আঞ্চলিক ভাষার সংলাপকে প্রমিতকরণ ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন করিনি। উপন্যাসটির তৃতীয় মুদ্রণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ।

হোর্হে লুইস বোর্হেস ঠিকই বলেছিলেন, যা কিছু আমি প্রকাশ করি তা সবই খসড়া। সব মৌলিক রচনাই অবিরাম সংশোধনযোগ্য।

**স্বকৃত নোমান**
০১.০২.২০১৮

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভাটিবাংলার সুধাবতী নামের নদীর তীরে লোকপুরাণের যে নারীকে নিয়ে এই কাহিনির শুরু, তার নাম গুলনাহার। এই নাম না হয়ে তার অন্য কোনো নামও হতে পারত। যেমন ধরুন নূরজাহান। স্বীকার করি, এ নামেই সে ব্রাত্যজনদের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু মুখে মুখে ফেরা সেই নামটি কাহিনির বৃত্তে বন্দী করতে চায় না এই কথক। তাই তার নাম দিয়েছে গুলনাহার। কিংবা ধরুন, সুধাবতী নামের কোনো নদীর অস্তিত্ব নেই ভাটিবাংলায়। কিন্তু যে নামেই হোক নদী তো আছে নিশ্চয়ই! এই কাহিনি পাঠের শুরুতে খরস্রোতা সেই নদীটিকে সুধাবতী হিসেবে ধরে নিতে আপত্তি তো থাকার কথা নয়।

বহু বছর আগে সুধাবতীর উজানে জয়গুনপুর পরগণার আদিগন্ত বিস্তৃত এক মাঠ থেকে কাহিনির শুরু। মাঠের চারদিকে জনবসতি। পশ্চিমে বিহগরা গ্রাম, তারপর ছোট ছোট টিলা আর মাঝারি পাহাড়সারি। বিহগরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বসতি। তখন শেষ বিকেল, সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরি নেই। মিইয়ে এসেছে গ্রৈষ্মিক সূর্যের তেজ। অগুনতি নারী-পুরুষ আর শিশু আলপথ ধরে হাঁটছে বিহগরার দিকে। বৈশাখের উন্মাতাল বাতাসে উড়ছে তাদের ধুতির পাড়, শাড়ির আঁচল। মেলা থেকে ফিরছে তারা। বছরের ঠিক এই সময়টায় জয়গুনপুরের শিবমন্দিরের মাঠে মেলা বসে। অনেক বড় মেলা। দুর্গা বা খার্চি পূজার মেলার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা বহু পূজার্থীর সমাগম ঘটে। শূদ্রদের সঙ্গে যোগ দেয় গড়িয়া পূজার্থীরাও। পূজা উপলক্ষ্যে মোট চার দিন চলে মেলা। সেদিন ছিল মেলার তৃতীয় দিন। সারা দিন কাঠফাটা রোদ, বিকেলে কালো মেঘে ছেয়ে গেল দক্ষিণ আকাশ। মেঘ দেখে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ির পথ ধরল পূজার্থীরা। কিন্তু খানিক পর মেঘ কেটে গেল। দক্ষিণে কোথাও হয়ত কালবোশেখি হানা দিয়েছে। বৃষ্টিধোয়া ফুরফুরে বাতাসে তারই আভাস।

বিহগরার দিকে হাঁটতে থাকা দলটির সঙ্গে ছিল গুলনাহারও। দুপুর থেকে মেলার মাঠে ঘুরেফিরে সে বেলা পার করেছে। আকাশে মেঘ দেখে মন্দির-

চত্বরে গিয়ে বসেছিল। পূজার্থীদের ভিড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে মেলাভাঙা মানুষের সঙ্গে সেও বিহগরার পথে হাঁটা ধরল। এ ছাড়া যাবে আর কোন দিকে? যাওয়ার মতো আর তো কোনো পথ নেই।

সে একাকী হাঁটে। সূর্যাস্তের পথে মেঘের বড় খণ্ডটি থেকে তার চোখ সরে না। সেই কখন থেকে কালো মেঘের খণ্ডটি স্থির হয়ে আছে। দেখতে ঠিক ঊনকোটির বিশাল শিবমুণ্ডের মতো। লম্বা দুই কান, গোলাকার মুখমণ্ডলে অপূর্ব হাসি, চোখের তির্যক চাহনি, প্রশস্ত কপালের তৃতীয় চোখ—এতদূর থেকেও সব স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গুলনাহার ভাবে, মেঘও কি তবে দেবতার রূপ ধারণ করে? জাজিনগরবাসীর ভক্তি দেখে বরুণ দেবতার নির্দেশে বুঝি সাগরের জল মেঘ হয়ে মহাদেবের রূপ নিয়েছে! কে জানে, এ হয়ত তারই দেখার ভুল। মন্দির-চত্বরে বসে বসে মূর্তিটার সঙ্গে ঊনকোটির পাষাণকুণ্ডের পাশে পাহাড়ের গায়ে খোদিত শিবমুণ্ডের মিল খোঁজার চেষ্টা করেছিল। গেল ফাল্গুনে অশোকাষ্টমীর মেলায় মুজরো করতে গিয়ে ঊনকোটি দেখতে গিয়েছিল। ভাবনায় এতক্ষণ শিবমুণ্ড ছাড়া আর কিছু ছিল না বলেই হয়ত মেঘের খণ্ডে শিবের ছায়া দেখছে। এমনও হতে পারে, ভক্তদের মঙ্গল কামনায় মেঘের আসনে চড়ে দেখা দিয়েছে শিব।

গুলনাহার ভাবে, জমিনের আল ধরে সারে সারে হেঁটে-চলা মানুষেরা কি ব্যাপারটা খেয়াল করেনি? করেনি তা তো নিশ্চিত। করত যদি, এতক্ষণে পূজার ধুম পড়ে যেত, উলুধ্বনি উঠত দিকে দিকে, জগত-সংসার ভুলে অপলক চোখে সূর্যাস্তের পথে চেয়ে থাকত সবাই।

মাঠের মাঝখানে এসে একবার পেছনে ফিরে তাকাল গুলনাহার। তার পেছনে বেশ খানিকটা দূরে একদল এবং খানিকটা সামনে আরেক দল মানুষ। সামনের মানুষেরা হারাধন নামের কোনো এক সন্ন্যাসীর কথা বলছে, গতদিনের পূজায় যে পিঠে হুক বিঁধিয়ে চড়কগাছে চড়েছিল। হারাধন নামটি শুনে হামজার কথা মনে পড়ে গেল তার। হামজার কথা ভাবতে ভাবতে সে হাঁটে। আলপথ শেষ করে গ্রামের রাস্তায় ওঠে। একটা টিলার দিকে উঠে গেছে রাস্তাটি। লালমাটির উঁচু-নিচু চওড়া রাস্তার দুপাশে কাঁটা-গুল্মের ঝোপ। জলের অভাবে সজীবতা হারিয়েছে। বড় দহনকাল। প্রচণ্ড খরায় রং মুছে গেছে প্রকৃতির। আম কাঁঠাল নারিকেল সুপারিগাছের আড়ালে গ্রামের বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট মেটে-গুদাম, বাঁকা-তেরচা দেওয়াল, তবে যত্ন করে লেপামোছা। মেলা থেকে আসা মানুষেরা একজন দুজন করে নিজ নিজ

BanglaBook.org

বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। একটা সময় গুলনাহার খেয়াল করল তার সামনে আর কেউ নেই। গাছগাছালির কারণে পেছনের দলটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সে একাকী হাঁটতে থাকে।

বৈশাখের আউলা বাতাসে পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণ ভেসে এল। জয়গুনপুরের কিছু গাছে বৈশাখের শুরুতেই কাঁঠাল পাকতে শুরু করে। যবনেরা ছাড়া এই কাঁঠাল কেউ খায় না। কারণ তার মালিক দেবাদিদেব মহাদেব। জগতের রক্ষক তিনি, মানুষের স্রষ্টা। জাজিনগরের ঘরে ঘরে চলে তার পূজা-অর্চনা। বিপদে পড়লে মানুষ দিনের পর দিন পড়ে থাকে তার আরাধনায়। থাকবে না? জাজিনগরবাসীর জন্য কি তার দয়া কম ছিল? মহারাজ দৈত্য-পুত্রের অত্যাচারে জাজিনগরবাসী যখন, তখন তিনিই তো সশরীরে এসেছিলেন এই রাজ্যে। সংহারমূর্তি ধারণ করে অনাচারী অধার্মিক অবিশ্বাসী দৈত্য-পুত্রের বুকে ত্রিশূল বসিয়ে হত্যা করেছিলেন। এবং হেড়ম্বরবাসী যখন অপমান-অপদস্থ করে জাজিনগরবাসীকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনিই তো আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন। কণ্ঠে ফণিহার, পরনে বাঘের চামড়া, হাতে শিঙা ও ডম্বরু, ললাটে অর্ধচন্দ্রের চিহ্ন। তাকে দেখে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল মানুষের মনে। প্রসন্ন হয়ে তিনিই তো হীরাবতীর গর্ভে মহারাজ ত্রিলোচনের জন্ম দিয়েছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন চতুর্দশ দেবতার মুখ। সেই সর্বশক্তিমান করুণাময় দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশে বছরের প্রথম ফলটি উৎসর্গ না করে জাজিনগরের মানুষেরা মুখে তোলে কেমন করে!

পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণে গুলনাহারের খিদে উসকে ওঠে। বুকের ডানপাশটা চিন-চিন করে। আজকাল খিদা লাগলে এমনই হয়। কখনো বমির ভাবও হয়। চালভাজা চিবুলে ব্যথা খানিকটা দমে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভেতর থেকে। এক ফোঁটা ঘাম ঘাড় বেয়ে বুকের দিকে নেমে গেল। যেন একটা মুক্তোদানা। পথের ধুলোবালি এতটুকু মলিন করতে পারেনি তার শরীর। দখিনা বাতাসের ঝাপটা কাঁধের আঁচলটা খসিয়ে দিল। পত পত করে উড়তে লাগল আঁচলটি। দেখতে দেখতে পায়ের কাছে উঠল একটি ধুলোঘূর্ণি। ঘুরন্ত বাতাস একবার ডানে আবার বামে মোড় নিয়ে শাঁই শাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে পথের সমস্ত ধুলোবালি খড়কুটো লতাপাতা জড়ো করে উপরের দিকে ছুড়ে মারল। চোখে অন্ধকার দেখল গুলনাহার। ঘূর্ণিটা টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমে গেছে ততক্ষণে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দিগন্তটানা হলুদ আবির এবং মেঘের খণ্ডটি। দিন ও রাতের এই সন্ধিক্ষণে

BanglaBook.org

গ্রামের পথ ছেড়ে বহু দূরে চলে এসেছে গুলনাহার। এদিকে আর বাড়িঘর চোখে পড়ে না, সরু পথের দুই ধারে শুধু গাছের সারি। অশোক অর্জুন শাল শিরীষ পাইন গজারি আর অনামা-অচেনা কত কত গাছ! বনের ভেতরে একটানা ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ডাক। অসংখ্য চোরাকাঁটা বিঁধেছে গুলনাহারের শাড়ির আঁচলে। রাস্তার দুই ধারে ধানক্ষেতের মতো গজিয়ে আছে চোরাকাঁটার ঝোঁপ। এই দহনকালেও তাদের মরণ নেই। দেখতে শুকনো খড়ের মতো, কিন্তু গোড়া ধরে টান দিলেই বোঝা যায় দণ্ডটা কেমন সজীব। কাঁটাগুলো জোঁকের মতো শুঁড় বাড়িয়ে রাখে, লোকজন হাঁটতে গেলেই টুপ করে ঝুলে পড়ে কাপড়ে।

জোনপহর। পুবের আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। গাছগাছালির ফাঁক-ফোঁকর গলিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে পথের ওপর। সৃষ্টি হয়েছে আলো-আঁধারির এক রহস্যময় জাল। ফেলে আসা দূরের লোকালয় থেকে আড়বাঁশির সুর ভেসে আসছে। কোনো উদাসী প্রেমিক বুঝি নির্জন টিলায় বসে মোহময় সুর তুলেছে তার মুরলিতে। দখিনা বাতাসে সেই সুর একবার স্পষ্ট হয় তো ফের শূন্যে মিলিয়ে যায়।

গাছগাছালির ফাঁকে আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু নির্জন পাহাড়ি পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, গুলনাহারের জানা নেই। এই উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় কোথাও কেউ নেই যে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে। অবশ্য জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করছে না সে। যত দুর্গমই হোক, এ পথে সে হাঁটবে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় শেষ হয়ে যাবে পথ। তখন হয়ত হিংস্র কোনো জন্তু-জানোয়ার বিকট হুঙ্কার দিয়ে, অথবা বিষধর কোনো সাপ হিংস্র ফণা তুলে পথ আগলে দাঁড়াবে। সে পালানোর চেষ্টা করবে না। একবার নয়, সাপ হাজার বার দংশন করুক, রক্তাক্ত করে দিক দুই পা, জন্তু-জানোয়ারেরা ছিঁড়েখুঁড়ে খাক তাকে, একটুকও নড়বে না সে। তাতেই বরং মুক্তি। অপমানের তীব্র জ্বালা থেকে মুক্তি।

বুকের ভেতর অপমানের জ্বালাটা গুলিয়ে উঠল আবার। মেলায় মানুষের ভিড়ে, পসারিদের হাঁকডাকে, ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে সব ভুলে ছিল এতক্ষণ। এখন, জোছনামাখা এই পাহাড়ি নির্জন পথ সবকিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে আবার। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসে তার। দলার মতো কিছু একটা গলার দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে। হাঁটার গতি সে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। রাত ধীরে ধীরে গভীরতার দিকে গড়ায়, মোহময়ী রূপ নেয় পৌর্ণমাসীর চাঁদ। গাছের ডালে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ হয়, কোথাও একটা ব্যাঙ সাপের মুখে পড়ে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে থেমে থেমে ডেকে চলে।

BanglaBook.org

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। এদিকে গাছপালা কিছু নেই। একটি বড় টিলার কাছে এসে সরু পথটা দুই দিকে চলে গেছে—টিলার ধার ঘেঁষে একটি উত্তরে এবং অন্যটি দক্ষিণের বিস্তৃত মাঠের দিকে। ডান নাকি বাম—কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারে না সে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নেমে পড়ল মাঠে। এই মাঠের শেষ কোথায় আন্দাজ করতে পারে না, তবু তার মন এদিকেই টানছে। হাঁটতে হাঁটতে মনের মুকুরে কেবলই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কমলাঙ্কের হরিদশ্ব গ্রাম। কি অমলিন পৌর্ণমাসী! মাঠের ভেতর প্রসারিত ঢেউ তুলে চাঁদের আলো খেলায় মেতেছে। দুরন্ত চাঁদ রাতের অবগুণ্ঠন লুটে উদোম করে দিয়েছে প্রকৃতির গুপ্ত অবয়ব। বনমোরগ শকুন কি কাকের হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। পড়ে আছে একটি মরা কুকুর। দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে চারপাশ। ঘূর্ণায়মান বাতাস গন্ধটাকে একবার এদিকে আনে তো ফের ঐদিকে নিয়ে যায়। নাকে হাতচাপা দিয়ে গুলনাহার হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে দূর দক্ষিণে গাছগাছালির ঝাপসা রেখা দেখতে পায়।

মাঠ পেরোতেই দ্বিতীয় প্রহরে গড়াল রাত। দূরে চাঁদের আলোয় বালুচর চিকচিক করে, সুধাবতীর জলপ্রবাহের মৃদু শব্দ শোনা যায়। অমরপুর কি তারও পুবে দূর পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নানা পাহাড়ি পথ বেয়ে সোনামুড়া-কমলাঙ্ক হয়ে খরস্রোতা এই নদী সমুদ্রকন্যা মেঘনায় মিশেছে। এতক্ষণে যেন সঠিক পথের দিশা পেল গুলনাহার। নদীর তীর ধরে হাঁটলে কাল বিকেল নাগাদ নিশ্চয়ই কমলাঙ্ক পৌছানো যাবে। কিন্তু আর যে কুলোচ্ছে না শরীরে! তীব্র ক্ষুধায় বমি আসতে চাইছে বারবার। একটা সোনালু গাছের ডাল ভেঙে তাতে ভর দিয়ে সুধাবতীর ঢালু পাড় বেয়ে নিচে নামল সে। নদীর এক আঁজলা জলে গলাটা ভেজাল।

নদীর পাড়ে উঠে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার। বড় বড় টিলা ডানে রেখে সমান্তরাল বয়ে গেছে সুধাবতী। টিলাগুলোতে জুম চাষ শুরু হয়ে গেছে। বছরের শেষ দিন উষালগ্নে নাচ-গানসহ গড়িয়া পূজা শেষ করে বীজ বোনা শুরু করে পাহাড়িরা। ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য বাঁশ আর খড়ের ছোট ছোট টঙঘর তৈরি করে তারা। এরকম একটা টঙ মনে মনে কামনা করে গুলনাহার। এছাড়া এত রাতে যাবে আর কোথায়? আশপাশে কোনো লোকালয় আছে কিনা তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। একটু বিশ্রাম দরকার তার। ক্লান্ত শরীরটাকে কিছুতেই আর সামনে টেনে নিতে পারছে না।

পথের দুই ধারে ওড়কলমির ঘন ঝোপ, তারই মাঝখানে সরু রাস্তা। কলমির ডগাগুলো পথের ওপর ঝুঁকে। যেন কলমির সামিয়ানা। দু-হাতে

BanglaBook.org

সেগুলো সরিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। বিরক্তির সঙ্গে কিছুটা ভয়ও লাগছে। মনে পড়ছে কৈশোরের কথা। জয়গুনপুরের সুধাবতীর পারেই ছিল সোবানালির বাড়ি। রাস্তার দু-ধারে বিস্তৃত আখক্ষেত আর কলমির ঝোপ পার হয়ে বাড়ি যেতে হতো। বর্ষার মৌসুম ছিল সেবার। সুধাবতীর জল দুই কূল উপচে পড়ার জোগাড়। জল বাড়ছে তো বাড়ছেই, কমার কোনো লক্ষণ নেই। ভাটির দিকে স্থানে স্থানে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ জনপদ তলিয়ে দিচ্ছে।

এক বিকেলে শোনা গেল আখক্ষেতে বিশাল এক কালন্তর সাপ নাকি একটা কলাগাছ পেঁচিয়ে শুয়ে আছে। টাক্কাল কুড়াল কোদাল নিয়ে ছুটল গ্রামবাসী, হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব উঠল দিকে দিকে। ক্ষেতের চারপাশ লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কেউ সাপটির সামনে যাওয়ার সাহস পায় না। অতিউৎসাহী ছেলেপেলেরা দূর থেকে বড় বড় ঢিল ছুড়ে মারে, তবু সাপটির নড়চড় নেই। গরম জল এনে গায়ে ছিটানোর পর সাপটি কলাগাছের আগা থেকে মাথাটা বড়শির মতো বাঁকিয়ে মোথার দিকে সরিয়ে আনলো। ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো গাছটি। তারপর সন্ধ্যা নাএল। মশাল জ্বালিয়ে পাহারা বসানো হলো রাতে। অন্ধকারে যদি কারো বাড়িঘরে ঢুকে পড়ে! পাহাড়ি কালন্তর। বড় বিষধর কীট।

ক্রমে বাড়তে থাকে গাঙের জল। ঝুর ঝুর শব্দে আখক্ষেতের মাটি ভেঙে পড়ে। কার ক্ষেত তলিয়ে গেল, কার বাড়ি ভাসিয়ে নিল সেদিকে কারো খেয়াল নেই। ভাঙনোন্মত্ত গাঙের চেয়ে সাপটিকেই তখন ভয়ংকর শত্রু বলে মনে হয় সবার। যেভাবেই হোক, মানুষের এই শত্রুকে বধ করতে হবে, গ্রামছাড়া করতে হবে।

ভোরে শত শত গ্রামবাসীর চোখের সামনে কলাগাছটি মোথাসুদ্ধ উপড়ে নিল স্রোত। মোচার দিকে মাথাটি ভাসিয়ে রেখে ভেসে যেতে লাগল সাপটিও। তীব্র স্রোতের ঘূর্ণিপাকে সাপসুদ্ধ কলাগাছটিকে ডুবে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রামবাসী।

সেই কতদিন আগের কথা! দেড় যুগ তো হবেই। সাপটির কথা মনে পড়ায় গুলনাহরের গায়ে কাঁটা দেয়। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগোনোর পর কলমির ঝোপ ফুরিয়ে এল। গাছপালাহীন খোলামেলা নদীর পাড়। ক্লান্ত গুলনাহার রোদে-জ্বলা খসখসে বিবর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল। সামনে এক পা বাড়ানোর শক্তি নেই। মাথার ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠছে, ঘাড়ের উপরটায় ছুটন্ত ঘোড়ার পদাঘাত পড়ছে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মেলাদিন আগের গানের চরণ ক'টি মনে পড়ে—

BanglaBook.org

কাঁদিয়া রজনী পোহায়
আঁখিজলে হৃদি ভেসে যায়
মনের আগুন তবু নিভে না যে তায়।

সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় থাকতে প্রায়ই গানটি গুনগুন করে গাইত। রোজ এসে তাকে যে লোকটি গানের তালিম দিয়ে যেত, তার কাছে শিখেছিল গানটি। শেষের চরণগুলো ভুলে গেছে এতদিনে।

হঠাৎ গুলনাহারের চোখ স্থির হয় একটা আলোকবিন্দুর দিকে। ভাটির দিকে নদীর পাড় ঘেঁষে জ্বলছে আলোটা। বাতির আলো, না বালুচরে চাঁদের প্রতিফলন—ভালো করে ঠাওর করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, বাতিরই আলো। মিটিমিটি জ্বলছে। এই গভীর নির্জন পথে বাতির আলো দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলো সে। আলোকবিন্দুর দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। নদীর পাড়ে একটা জীর্ণ কুটিরে জ্বলছে বাতিটা, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোকবহ্নি। মেটে-গুদামটির বাঁ-দিকে একটি প্রাচীন মন্দির। চাঁদের আলোয় সেটির প্রাচীনত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। ধাতব কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠছে চূড়ায়। পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে একটি বট কি অশ্বত্থ চারপাশে শাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে। বাতাসে রি-রি শব্দ উঠছে পাতায় পাতায়। তিন-দুয়ারী মন্দিরের পশ্চিমের দুয়ারটি বন্ধ, পুবেরটার কপাট নেই। মাঝের কক্ষটির দুয়ার খোলা। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনো বিগ্রহ আছে কি-না বোঝার উপায় নেই। মন্দির-লাগোয়া কুটিরটির দুয়ার বন্ধ। ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যায় না। আছে তো নিশ্চয়ই। নইলে বাতি জ্বলবে কেন। জীর্ণ কপাটের ফাঁকে ভেতরে উঁকি দিয়ে মোমবাতির আলোয় পাঠরত এক বুড়োকে দেখতে পেল গুলনাহার। মুহূর্তে অর্ধেক ক্লান্তি দূর হয়ে শরীরটা হালকা হয়ে উঠল। বুড়োকে একবার ডাক দেওয়ার ইচ্ছে হলো তার। কী ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত ভাবছে, এত রাতে পুরুষের আশ্রয় চাওয়া কি নিরাপদ? হোক সে সাধু-সন্ন্যাসী বা মন্দির-পুরোহিত। জগত-সংসারের আর কিছু না চিনুক, এই জীবনে সে পুরুষ চিনেছে। বেশ ভালোভাবেই। পুরুষের চরিত্র তার নখদর্পণে। পুরুষের মনোরঞ্জনেই তো সে কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের অনেক সময়। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি রড নেই! প্রাচীন মন্দিরটা দেখে শরীরটা বিশ্রাম কামনা করছে খুব। ভেঙে আসছে প্রতি অঙ্গের জোড়া। এক মুহূর্তও তর সইছে না আর।

পুব কক্ষের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল গুলনাহার। শুকনো পাতা চূর্ণ হওয়ার ঝুরঝুর শব্দ উঠল। তুলতুলে নরম কিছু একটার সঙ্গে পা লাগল তার। হাত দিয়ে পরখ করে দেখল একটা ছাগল কি ভেড়া। মানুষের হাতের

BanglaBook.org

স্পর্শ পেয়ে একবার ডেকে উঠল পশুটা। ডাক শুনে ছাগল বলে নিশ্চিত হতে পারল। কুকুর ভেবে খানিকটা ভয় পেয়েছিল প্রথমে। ভয়টা কেটে গেছে এখন, কিন্তু বুকের দুরু দুরু স্পন্দন থামছে না। সমস্ত কক্ষে মল-মূত্রের উৎকট গন্ধ। দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। খানিকের মধ্যে গভীর অবসাদে দু-চোখের পাতা বুজে এল। একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। বড় বেশি ক্লান্ত, অবসন্ন সে। এই মন্দির-কক্ষে কোনোরকমে রাতটা কাটিয়ে ভোরে আবার শুরু করবে যাত্রা।

মাত্র কদিন আগে রাতের ঠিক এই সময়টায় জলসার নাচ-গানে মশগুল ছিল গুলনাহার। সেদিন যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুর আমতলীর নহবৎখানায় জলসার আয়োজন করেছিলেন। সন্ধ্যার পরপরই ডেকে আনা হয় গুলনাহারকে। পেটে অম্লজনিত অসুস্থতায় ভুগছিল সে। দুপুরের দিকে একবার বমিও হয়। সন্ধ্যার আগে চৌকাঠে কর্পূর জ্বালিয়ে কোঠার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হামজাকে বলে দিয়েছিল আগামী তিন দিন মুজরোর ব্যাপারে কাউকে যেন পাকা কথা না দেয়।

সন্ধ্যার পর বাইরে হৈচৈ শোনা গেল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে গুলনাহার নিচে নেমে বাইরে এসে দেখল হামজা এক লোকের সঙ্গে তর্ক করছে। রাগে তোতলাচ্ছে। রাগ উঠলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তোতলাতে শুরু করে।

কে হামজা? হাঁক দিয়ে জানতে চাইল গুলনাহার।

হামজা বলল, দেখ লোকটার কাণ্ড! আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, তবু সে বাড়াবাড়ি করছে।

কোন লোকটা? সামনে এগিয়ে গেল গুলনাহার। আবছা অন্ধকারে আগন্তুকের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি গিয়ে চেহারাটা ভালো করে দেখে বলল, ও, আপনি?

যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুরের সঙ্গে লোকটিকে সে বহুবার দেখেছে। বিহার কি বেনারসের দিকে বাড়ি, থাকে নরসিংগড়ের ওদিকে। বিরজা মাসির কোঠায়ও মাঝেমধ্যে দেখা যায়। মহলের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নয়, তবু সবসময় দুর্গামণি ঠাকুরের পাছে পাছে থাকে। লোকটি জানাল, যুবরাজ এক্ষুনি ডেকে পাঠিয়েছেন গুলনাহারকে। দুদিন পর তিনি বেশ কদিনের জন্য কৈলাসহরে চলে যাবেন। যাওয়ার আগে বন্ধুবান্ধব নিয়ে জলসা বসাতে চান এবং তা আজ রাতেই।

BanglaBook.org

আজ রাইতেই? জিজ্ঞেস করল গুলনাহার।

লোকটি বলল, জি হ্যাঁ। আভি মেরে সাথ যানে কি লিয়ে কাহা। এক টমটম ভেজা হ্যায়, রাস্তে মে ঠের কর আয়া। যুবরাজজি আফ কি লিয়ে ভেজা।

গুলনাহার বলল, আমতলী তো বেশি দূরে নয়। এটুকু পথ, টমটমের কী দরকার ছিল? হেঁটেই তো যাওয়া যেত।

গুলনাহার কথা বাড়াল না, ঘরে ঢুকে দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নিল। নতুন বানানো লেহেঙ্গাটি গায়ে দিল, পায়ে ঘুঙুর পরল, সুরমা লাগিয়ে চোখ দুটো মোহময়ী করে তুলল, সুগন্ধি আতর ছিটাল সারা গায়ে, খোঁপায় একটা রক্তজবা গুঁজে দিল। হোক অসুস্থ, যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুর তলব করেছেন বলে কথা! আজকাল মহারাজের মতিগতি ভালো ঠেকছে না তার। তেমন একটা আসেনই না গুলনাহারের কোঠায়। গত তিন মাসে তো একবারও নয়। হামজার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জেনেছে কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে কী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে তো আশপাশের রাঁড়ের বাড়ির সস্তা বাইজিদের জীবন শুরু করতে হবে গুলনাহারকে। এই দুষ্কালে বাইরে মুজরো করে কয় টাকা পাওয়া যায়? বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মহারাজ একদিন এলে যা মেলে তার সিকি ভাগও নয়। ভাগ্যিস অনুগ্রহ করে এই বাড়িটায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মহারাজ। বলতে গেলে বাড়িটা এখন তারই। রাজা একবার যা দান করেন তা কি আর ফিরিয়ে নেন?

এর আগে রাজমহলের কাছে আনন্দময়ী মন্দিরের পেছনে একটা দোতলা দালান ঘরে থাকত গুলনাহার। নিচতলায় থাকত কয়েকজন দাসী আর হামজা। দোতলার পুরোটাই ছিল তার। এটাই ছিল মহারাজের জলসাঘর। শুরুর দিকে প্রায় রোজই আসতেন মহারাজ। রাত দ্বিতীয় প্রহর শুরু হলে কারো সাধ্য ছিল না তাকে আটকে রাখার, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সোজা চলে আসতেন জলসাঘরে। তিনি এলে পুরো ঘর রণিত হতো নৃত্যপরা গুলনাহারের নূপুর নিক্বণে। ওখানে থাকতে থাকতে গুলনাহার ওই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজনটীর শান-শওকত ছেড়ে হঠাৎ এই কোঠায় এসে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেশ সময় লেগেছিল। কে জানে কী মতি হলো মহারাজের, এক রাতে জলসা শেষে হঠাৎ বললেন, গুল, এখন থেকে তুমি আর এখানে থাকতে পারবে না।

কথাটি যত সহজে বললেন মহারাজ, তত্টা কঠিনভাবে গুলনাহারের বুকে গিয়ে বিঁধল। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সে জাজিনগরের মাইনেধারী

BanglaBook.org

রাজনটী। মহারাজের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে, রাজসভার বহুবৈচিত্র্যময় পোশাক পরিহিত সভাসদদের মধ্যে সেও একটা স্থান দখল করে আছে। মনে তার কত আশা। দিনরাত সংগীতের রেয়াজ করে কণ্ঠটাকে মধুর থেকে মধুর করে তুলেছে, সবসময় চেষ্টা করেছে নাচের দূরায়ত্ত মুদ্রাগুলো আয়ত্ত করে নিতে। একটাই উদ্দেশ্য—মহারাজের ভেতরে মুগ্ধতা তৈরি করা। সাবেরি বাঈয়ের কাছে যেদিন শুনেছে মুর্শিদাবাদের নবাব মীর জাফর আলী খাঁ মণি ও বব্বু বাইজির সংগীত-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের বিয়ে করলেন, সেদিন থেকে একটা গুপ্ত স্বপ্নের বীজ তার ভেতর ডালপালা মেলতে শুরু করে। সে জানে, কোনোদিনই যে এই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। সবাই কি আর মীর জাফর আলী খাঁ? কোম্পানির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলে মীর জাফর স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করেছিলেন বলেই হয়ত মনের সব সাধ মেটাতে পেরেছিলেন। দেশে আরো কত নবাব, কত জমিদার, কেউ তো আর বাইজির প্রেমে পাগল হয়ে তাদের বিয়ে করে ঘরে তোলে না। আর জাজিনগরের মহারাজের সেই সুযোগ কোথায়? কোম্পানির সঙ্গে তার বিবাদ সবসময় লেগেই আছে। তবু স্বপ্নটাকে সবার অলক্ষ্যে লালন করেছে গুলনাহার। পূরণ না হোক, স্বপ্ন লালনে তো বাধা নেই। তাই হঠাৎ মহারাজের এমন একটি সিদ্ধান্তে প্রথমে সে মর্মাহত হয়েছিল।

এখানে থাকতে পারব না? অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল গুলনাহার।

বড় একটা গোলমাল হয়ে গেছে। চন্দ্ররেখা তোমার ব্যাপারটিকে কিছুতেই ভালো চোখে দেখছে না আজকাল।

গুলনাহার চোখ নামায়।

মহারাজ বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সাবেরি বাঈয়ের কোঠার পাশে সুন্দর একটা বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমার জন্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে উঠতে হবে তোমাকে। আমৃত্যু ওখানেই থাকবে। যতদিন বেঁচে আছি তোমার মাইনে বন্ধ হবে না।

ডানাভাঙা পাখির হাল হলো গুলনাহারের। আজকাল শোনা যাচ্ছে উত্তর দেশের বহু বাইজি ও রক্ষিতা নাকি দক্ষিণ দেশে এসে ভিড় করছে। বহু নামি-দামি রাজনটী হারেম ছেড়ে রাঁড়ের বাড়ির বেশ্যাদের বৃত্তি গ্রহণ করছে। কেউ কেউ জাজিনগরের নানা এলাকায়ও নাকি আস্তানা গেড়েছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় বিহ্বল বোধ করতে লাগল গুলনাহার। স্পষ্টই টের পায় রাজনটী থেকে তাকে যে অপসারণ করা হচ্ছে। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই হয়ত মাইনে চালু রাখার কথা বলেছেন মহারাজ। আবার এটাও

BanglaBook.org

সন্দেহ হলো, তাকে বিদায় করে দিয়ে মহারাজ নতুন নটী আনছেন না তো! এরকম হলে অবশ্যই দুঃখের কারণ ছিল। কিন্তু পরে রানী চন্দ্ররেখার কথা বলায় সন্দেহটা কেটে গেল। রানীর কারণেই মহারাজ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। রানীর প্রতি তার ভালোবাসার কমতি নেই। থাকবে কেন? রানী তো আর যেনতেন ঘরের মেয়ে নন। একে তো মণিপুরের রাজকন্যা, তার উপর এই রাজ্যের রানী। তার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব তো দিতেই হবে মহারাজকে।

শেষমেশ নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিল গুলনাহার। মহারাজের আদেশের তো আর হেরফের করা যায় না। বলল, মহারাজের যা খুশি হয় করুন, আমি তো আপনার সেবাদাসী মাত্র।

তারপর থেকে একজন দাসী ও হামজাকে নিয়ে সে এই বাড়িতে আছে। দোতলা মাটির ঘর, উপরে গজারি কাঠের ছাদ, তার উপর শনের ছাউনি। লোকে বলে গুলবাইজির কোঠা। সামনে ছোটখাটো একটা বাগান। মহারাজের আদেশে মহলের মালি এসে বুনে দিয়ে গেছে ফুলের চারাগুলো। কোঠাটির নিচতলায় দুটি বড় আর তিনটি ছোট কক্ষ। সামনের বড় কক্ষটি অতিথিদের জন্য। প্রায়ই সেখানে জলসা বসে। আসেন রাজপাদোপজীবী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মহারাজ এলে সেখানেই আসন নেন। দোতলায় একা থাকে গুলনাহার। আশপাশে আছে আরো দুটি বাইজিবাড়ি। লোকে বলে রাঁড়ের বাড়ি। জনা দশেক মেয়ে নিয়ে দুই মাসি থাকে। তাদের মধ্যে নাচওয়ালির সংখ্যা খুব বেশি নেই, হাতেগোনা দুতিন জন মাত্র। বাকিদের নাচ-গানের তালিম দিয়ে পাক্কা নাচওয়ালি করার জন্য মাসিদের চেষ্টার অন্ত নেই। সাবেরি বাঈ নিজে না পেরে মাইনে দিয়ে ওস্তাদ রেখেছে, তবু পারেনি। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য লক্ষ্ণৌ থেকে এনেছিলেন সাবেরি বাঈকে। তার দেখাদেখি এল বিরজা মাসি। সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় দুজন বাইজি আছে, যারা বাইরে মুজরো নিতে পারে, ডাক পড়ে নানা পালা-পার্বণে। বাকিরা দিনভর পড়ে পড়ে ঘুমানো আর সন্ধ্যায় কপালে লাল টিপ পরে, লালপাড় শাড়ি পরে, গায়ে সুগন্ধি মেখে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সারা দিন কোঠাগুলো নীরব, সন্ধ্যা হতে না হতেই বেশ্যার দালাল আর খদ্দেরের আনাগোনায় সরগম হতে শুরু করে। আসব পানের মাতলামি, গুণ্ডামি আর গালাগাল লেগেই থাকে। ভাঙ-গাঁজার গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। সেই তুলনায় গুলনাহারের কোঠাটি বেশ শান্ত। প্রধান সড়কও বেশ খানিকটা দূরে। কোঠায় ঢোকার সরু রাস্তাটা দিয়ে লোকজন তেমন চলাচল করে না।

BanglaBook.org

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হতে না হতেই শুরু হলো জলসা। ধূপের ঘ্রাণে পুরো ঘর মৌ মৌ। হামজা এসে নয় জনের জন্য চিনামাটির নয়টি পানপাত্র আর পাঁচটি হুঁকো দিয়ে গেছে। কামরার চার কোণায় চারটি কাচের বাতিদানে বাতি জ্বলছে। আসরের মাঝখানে কারুকাজ করা একটা বড় বাতি। যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুর বাতিটার ডানপাশে বসেছেন। তার দু-পাশে বসেছেন চারজন করে মোট আটজন। সবার হাতে পানপাত্র। যুবরাজের প্রিয় সুরা মহুয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি যখনই জলসায় আসেন, এই বিশেষ পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উদয়াচলে সহজলভ্য নয়, লোক পাঠিয়ে আমবাসা থেকে আনাতে হয়।

ডানদিকে তম্বুরা নিয়ে বসেছেন ধনঞ্জয় ঠাকুর। শুরু থেকেই তিনি যন্ত্রটি বাজিয়ে যাচ্ছেন। ভালো সুর তুলতে পারছেন না। একেবারে বাঁ পাশের জন বাজাচ্ছেন তবলা। তবলার বোলের সঙ্গে কিছুক্ষণ নাচও হলো। রাত কিছুটা গভীর হলে যুবরাজ বললেন, নাচটা খুব হালকা হয়ে যাচ্ছে গুল, এবার খেমটা ধরো দেখি।

খেমটার কথা শুনে খানিকটা দমে গেল গুলনাহার। অসুস্থ শরীরে উচ্চকলার এই নাচ এখন তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা সে প্রকাশ করল না। বলল, ঢোল-করতাল আর বাঁশি ছাড়া কী করে হবে? খেমটার জন্য তো এসব চাই। তারচেয়ে বরং হিন্দি গজল বা উচ্চাঙ্গের খেয়াল ঠুংরি হোক? যুবরাজ চাইলে বেহাগ-কাওয়ালিও হতে পারে।

ধনঞ্জয় ঠাকুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে যুবরাজ বললেন, গাও তোমার যা ইচ্ছে হয়।

গান শুরু করার আগে যুবরাজ ও তার প্রমোদসঙ্গীদের পানপাত্রে মহুয়া ঢেলে দিল গুলনাহার। যুবরাজের দিকে ভরা পাত্রটি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, যদি অনুমতি দেন তো আমি হামজাকে ভেতরে আসতে বলি। তম্বুরায় তার ভালো হাত আছে। আপনার বন্ধুটি বরং আরাম করে বসুক।

আসলে ধনঞ্জয় ঠাকুরের তম্বুরা বাজানোর কিছুই যে হচ্ছে না সে কথা সরাসরি বলতে পারছিল না গুলনাহার। যুবরাজের বন্ধু, পাছে কী মনে করেন!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ডাকো না হামজাকে। সে তো ভালোই বাজাতে পারে, বললেন যুবরাজ। বন্ধুর উদ্দেশে হাসতে হাসতে বললেন, ওহে ধনঞ্জয়, এবার ছাড়ো দেখি তম্বুরা। তোমার বাদন শুনে আমার পুরো কান তো ঝালাপালা, এখন দেখছি উদয়াচলের রাতের পাখিরাও কাঁদছে।

BanglaBook.org

যুবরাজের রসিকতায় পুরো মজলিসে হাসির রোল উঠল। অপমানটা গায়ে না মেখে সবার সঙ্গে ধনঞ্জয় ঠাকুরও হেসে উঠলেন। তম্বুরার সুর আর তবলার বোলে গুলনাহার গান ধরল :

হারাতে যে চায় এ মন, হারাতে যে চায়
ও চোখে মরণ-নেশা, বাড়াল প্রেমেরই তৃষ্ণা
জাদুর ইশারায়।
প্রণয় গভীর হলে, রাত্রি দরজা খোলে
বাতাসও শরম ভোলে, খশবু ছড়ায়।
আকাশে তারার মেলা, জমেছে সুরেরই খেলা
এসেছে প্রীতির বেলা, আজ এই জলসায়।

শেষ কলিটা শেষ হওয়ার আগেই আসক্ত কণ্ঠে যুবরাজ বললেন, হে নহরে গুল, তোমার নামের অর্থ কী জানো? মানে হচ্ছে ফুলের ঝর্ণা। বুঝলে হে, ফুলের ঝর্ণা। যে ঝর্ণা কেবলই ফুলময়। কিন্তু ফুলের ঝর্ণায় তো কিছুতেই মশগুল হতে পারছি না, গুল। ঘটনাটা কী বল তো? আচ্ছা, এবার না হয় একটা গজল ধরো। তোমার কণ্ঠে গজল খুব ভালো লাগে। মিলনের সাধ জাগে বুঝলে? হা হা হা। গাও গাও, শুরু করো তাড়াতাড়ি।

গুলনাহার বুঝতে পারে যুবরাজ এখন সুরার নেশায় বুঁদ। যতবারই তিনি জলসায় বসেছেন, নেশার চূড়ান্তে পৌঁছলে গুলনাহারকে তখন 'নহরে গুল' বলে সম্বোধন করেছেন। সুরাপাত্রটি যুবরাজের হাত থেকে আলতো করে নিজের হাতে নিয়ে কোমল স্বরে গুলনাহার বলল, আর নয়, বেশি হয়ে গেলে ঘরে ফিরবেন কী করে? সুমিত্রাদি রাগ করবেন না?

ডান হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন যুবরাজ। কয়েক পা সামনে এগিয়ে খানিকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ঘর? ঘর কোথায় আমার? ঘর তো নিয়ে যাচ্ছে কুমার রামগঙ্গা। কিছু শোননি তুমি?

যুবরাজের কথার আগামাথা কিছু বুঝতে না পেরে সুরাপাত্র হাতে মুখে হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গুলনাহার। যুবরাজ আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রমোদসঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরাও কি কিছু শোননি? শোনো, মহারাজ পুত্র রামগঙ্গাকেই নাকি সিংহাসন আর জমিদারি দিচ্ছেন। একবার ঢেকুর তুলে ফের বললেন, হ্যাঁ, সেই ষড়যন্ত্রই চলছে। আমি শালা ভেসে এসেছি। বুঝলে, খোয়াল গাঙে ভেসে এসেছি। আমার বাবা লক্ষ্মণমাণিক্যও ভেসে এসেছিল। তোমরা শোননি কিছু?

বাকিরা ততক্ষণে নেশায় বুঁদ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসনে হেলান দিয়ে

BanglaBook.org

চোখ বুজে আছেন। টলতে টলতে এগিয়ে এলেন ধনঞ্জয় ঠাকুর। যুবরাজকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আসনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আরে ছাড়ুন তো ওসব! সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তো আপনি। আপনাকে বাদ দিয়ে কিছুই হবে না এই বলে রাখলাম। তারপর অট্টহাসি দিয়ে বললেন, আমি আছি না এয়ার, ঘাবড়াও মাত।

ধনঞ্জয় ঠাকুরের খানিকটা জবরদস্তিতে যুবরাজকে বসানো গেল, কিন্তু তার জবানটা বন্ধ করা গেল না, অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যেতে লাগলেন। হামজাকে বাইরে যেতে বলে গুলনাহার নিজেই তম্বুরা নিয়ে বসল। দুর্গামণি ঠাকুরের উদ্দেশে বলল, যুবরাজের কি গজলই শুনতে ইচ্ছে করছে, না অন্য কিছু?

গুলনাহার দেখল মাথাটা খানিকটা কাৎ করে রেখে যুবরাজ কামাতুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে। একটিবার পলক ফেলছেন না। এই দৃষ্টিতে ভিন্ন কিছু টের পায় গুলনাহার। এর আগেও তার এরকম চাহনি দেখেছে, তবে প্রতিবারই কৌশলে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটি আলাদা। এটা তো তার নিজের কোঠা নয়, এখন সে রাজকীয় রঙমহলে। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই এখানে। তা ছাড়া দুর্গামণি ঠাকুরের সঙ্গে জলসার নাচ-গান ছাড়া অন্য কিছু ঘটুক, তা সে চায় না। লোকটাকে কেন যেন পছন্দ হয় না তার। আরো ব্যাপার আছে, মণি ও বব্বু বাইজির খবরটি শোনার পর থেকে রাজসভার অন্য কারো সঙ্গে সে ওসবে যাবে না বলে একরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মহারাজকে নিয়ে এখনো সে স্বপ্ন দেখছে।

যুবরাজ আবার আসন থেকে উঠে টলতে টলতে গুলনাহারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তার চোখে-মুখে প্রদীপ্ত কামনার বহ্নি। সিনার মৃদু ধাক্কা দিয়ে গুলনাহার বলল, নটীর প্রেমে এত মজতে নেই হে। বসুন গিয়ে, রাত তো এখনো অনেক বাকি।

যুবরাজ দু-হাতের তালুতে গুলনাহারের মুখটা ধরে চোখের ইশারায় সুরাপাত্রটা দেখিয়ে বললেন, জলসায় আমি যতটা কামনা করি এই সুস্বাদু মহুয়া, তার চাইতে বেশি করি তোমাকে। মহুয়া আর নাহার, দুটিই আমাকে পাগল করে তোলে।

ঠোঁট বাড়িয়ে চুমু খেতে গেলে গুলনাহার হেসে উঠে দ্রুত মুখ সরিয়ে কয়েক পা পেছনে সরে দাঁড়াল। ঘুঙুরের রিনঝিন শব্দ উঠল তার পায়ে। ব্যর্থ হয়ে গুলনাহারের চোখাচোখি তাকিয়ে রইলেন যুবরাজ। হাস্যে-লাস্যে ভরা চপলা-চঞ্চলা এই নটীর ছল-চাতুরির কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। কী

BanglaBook.org

চায় এই নাচওয়ালি? কাকেই-বা চায়? বেশ কয়বার চেষ্টা করেছেন এর আগে, প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। তবে কি আরো বেশি টাকা চায়? মুহূর্তে পকেট থেকে কড়কড়া কয়েকটা নোট বের করে গুলনাহারের হাতে ধরিয়ে দিলেন। গুলনাহার আড়চোখে একবার ধনঞ্জয় ঠাকুরের দিকে তাকাল। ততক্ষণে তার চোখ দুটিও বুজে এসেছে, বাকিরা এখনো আগের মতোই।

হঠাৎ গুলনাহারের ডান হাতটা ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন যুবরাজ। গুলনাহার নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, সবার সামনে এসব কী হচ্ছে? আপনার বন্ধুরা কী ভাববে বলুন তো?

আসক্ত কণ্ঠে যুবরাজ বললেন, কী ভাববে? আজ রাতে তুমি যে শুধুই আমার, এ কথা কি তারা জানে না? ভেবেছ মহারাজ এখনো তোমার কথা ভাবেন, তাই না? ভুল ধারণা তোমার। চন্দ্ররেখা এখন তাকে শক্ত করে আঁচলে জড়িয়ে রেখেছেন।

তা তো রাখবেনই। কোন স্ত্রী তার স্বামীকে আঁচলে বেঁধে রাখতে চায় না? তবু তো নটীর দরকার হয়, তাই না? বলতে বলতে কৌশলে যুবরাজের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় গুলনাহার। জ্বলন্ত প্রদীপের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকেন যুবরাজ। অস্থির শিখাটা কেবলই উপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে চাইছে। তারপর আচমকা গুলনাহারের হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরের কক্ষের দিকে নিয়ে চললেন যুবরাজ। টাল সামলাতে না পেরে গুলনাহার যুবরাজের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল, ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি। সত্যি বলছি আমার শরীর ভালো নয়।

শরীর খারাপ? রক্তচোখে প্রশ্ন করলেন যুবরাজ। জবাবের আগেই গুলনাহারের গালে একটা চড় কষিয়ে বলেন, শরীর খারাপ তো এখানে এলি কেন মাগী?

ধস্তাধস্তিতে গুলনাহারের খোঁপা খুলে দীর্ঘ চুল পিঠের ওপর পড়ল। রক্তিম গালে হাত দিয়ে সজল চোখে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভাবতেই পারেনি দুর্গামণি ঠাকুর কখনো তার গায়ে হাত তুলতে পারেন। এতটা বছর সে জাজিনগরের রাজনটী, মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের প্রেয়সী বলো কি রক্ষিতা, নটী বলো কি বেশ্যা—তাই ছিল সে। এখন রাজনটী না হোক, তিন বছর ধরে রাজার করুণার পাশেই তো আবদ্ধ হয়ে আছে। রাজনটী হওয়ার পর তার সামনে কখনো রাজ্যের সাধারণ কোনো প্রজা তো দূরে থাক, রাজসভারও কেউ চোখ তুলে কথা বলার সাহস করেনি। স্বয়ং মহারাজও কখনো এরকম আচরণ করেননি। অথচ এ কী হলো এখন! এ কী করলেন যুবরাজ!

BanglaBook.org

পরদিন সকালে সোজা মহলে গিয়ে হাজির হলো গুলনাহার। যুবরাজের বিরুদ্ধে নালিশ করবে মহারাজের কাছে। উদ্ধত যুবরাজের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি মিলবে না।

প্রাসাদের সামনে দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহারাজ। কোথাও বের হবেন হয়ত। প্রধান তোরণে সজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি দেখে এসেছে গুলনাহার। সঙ্গে প্রধান সেনাপতি আছুমণিদেব ও ফৌজের বক্সী রামহরি ঘোষও আছেন। গুলনাহারকে আসতে দেখে মহারাজ কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলেন। অসময়ে তাকে মহলে আসতে দেখে হয়ত তিনি কিছুটা বিস্মিত। রাগে-ক্ষোভে গুলনাহার এতটাই বেসামাল যে মহারাজকে কুর্নিশ করার কথা ভুলে গেল। মহারাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাবে তখনই মহারাজ ধমকে উঠলেন, গুলনাহার, তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হচ্ছি। জাজিনগরের মহারাজের সামনে দাঁড়ালে তাকে কুর্নিশ করতে হয় ভুলে গেছ তুমি? রাজবিধান লঙ্ঘন করার দুঃসাহস কে দিয়েছে তোমাকে?

মহারাজের উচ্চকণ্ঠ শুনে তোরণের সামনে থেকে দুজন প্রহরী এগিয়ে এল। দুজনের হাত কটিদেশে রক্ষিত কোষবদ্ধ তরবারির ওপর। মহারাজ তাদের উদ্দেশে বললেন, এই অসভ্য বেয়াদব মহিলাকে আমার সামনে থেকে দূর করো। তাকে যেন আর কখনো মহলের ত্রিসীমানায় না দেখি।

হ্যাঁ, দেখা আর যাবে না। কেবল মহলেই নয়, সমগ্র উদয়াচলের কোথাও আর দেখা যাবে না তাকে। সারা রাত মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই সিদ্ধান্ত নেয় গুলনাহার। রাত পুইয়ে ভোর হলো। হামজা ও দাসীটি ঘুম থেকে জাগার আগেই সে কোঠা ছাড়ল। আমতলী পর্যন্ত হেঁটেই এল। গন্তব্য আপাতত জয়গুনপুরে সোবানালির বাড়ি, যেখানে সে পাঁচটি বছর কাটিয়েছিল। এই পৃথিবীর আর কোথায় আছে তার আশ্রয়! যে মানুষটি তাকে এতটা বছর লালন-পালন করেছে, যাওয়ার জায়গা তো ওই একটাই। সোবানালির প্রতি ক্ষোভ আছে তার। সোবানালি তাকে সাবেরি বাঈয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তুলে দেওয়া ছাড়া তো কিছুই করার ছিল না তার। যে আশা নিয়ে এক নিরন্নের ঘর থেকে নিয়ে এসেছিল গুলনাহারকে, একই অবস্থা তো তারও হয়েছিল। হাঁপিকাশিতে পড়ে সে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। চাইলেও গুলনাহারকে রাখতে পারত না।

আমতলী এসে একটা টাঙ্গা পেয়ে গেল গুলনাহার। জয়গুনপুরের দিকেই যাচ্ছিল। বিশালগড়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে ফের যাত্রা শুরু করবে। টাঙ্গায় আরো তিন মহিলা যাত্রী ছিল। রংজ্বলা কালো বোরখায় ঢাকা তাদের শরীর। তিনজন

BanglaBook.org

মিলে বোরখার আড়ালে ঠারে ঠারে কথাবার্তা বলে হাসি-ঠাট্টা করছিল। শুনেও না শোনার ভান করে থেকেছে গুলনাহার। হয়ত তারা বুঝতে পেরেছিল সে যে এক নটী, নাচে-গানে পুরুষের মনোরঞ্জনই যার পেশা। নটী বলো বা বেশ্যা, এদেরকে এমনিতেই চেনা যায়। যতই বেশভূষা পাল্টাক, খুব সহজেই চেনা যায়। অন্তত উদয়াচলের মানুষরা নটী চিনতে ভুল করে না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। ধুলো উড়িয়ে, ক্যাঁচ-কুঁচ শব্দ তুলে টাঙ্গা চলছে তো চলছেই। ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে গুলনাহার। সাবেরি বাঈয়ের কথা মনে পড়ে। খুব কান্না পায়। দুই গাল বেয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সাবেরি বাঈকে বলে আসা উচিত ছিল। সে কী করেনি তার জন্য? ওস্তাদ রেখে নাচ-গান শিখিয়েছে, দিনের পর দিন পরিশ্রম করে নিজে বাজনা-বাদন শিখিয়েছে। পুরুষদের সঙ্গে কীভাবে আলাপ করতে হবে, কীভাবে কটাক্ষ করতে হবে, কীভাবে প্রেমের ভান করতে হবে, কীভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে হবে, কীভাবে করতে হবে ন্যাকামি, ছলনা—বই শিখেছে তার কাছ থেকে। পুরুষদের কুহকচক্রে টেনে আনার জন্য নটীবিদ্যার যত বিদ্যা আছে, সবই শিখিয়েছে সাবেরি বাঈ। গুলনাহারের নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে যে কয়জন মানুষের চোখের জল ঝরবে তাদের মধ্যে সাবেরি বাঈ একজন। কিন্তু অপমানের যে আগুন জ্বলছে তার বুকে, সাবেরি বাঈয়ের জন্য কষ্ট সেই আগুনের শতভাগের এক ভাগও নয়। সাবেরি বাঈকে বললে কিছুতেই সে আসতে দিত না। বলত, এরকম অল্প-স্বল্প অপমান গায়ে মাখতে নেই বাইজিদের। আমাদের জীবনে দুঃখ বলে কিছু থাকতে নেই। শত দুঃখকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে হয়।

হয়ত তার কথাই ঠিক, কিন্তু গুলনাহারের মন যে বড়ই স্পর্শকাতর। সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় থাকতে এরকম বহু অপমান-অপদস্তের শিকার হয়েছে। কখনো গায়ে মাখেনি, পরদিনই সব ভুলে গেছে। সবার কাছ থেকে তো আর ভালো ব্যবহার আশা করা যায় না। একেকজনের চরিত্র একেক রকম। কোনো কারণে হয়ত কাল মহারাজের মন খারাপ ছিল, পরে হয়ত তিনি বিষয়টি ভুলেই যেতেন। তবু কেন যেন পুরো ঘটনাটি দারুণভাবে মর্মাহত করেছে গুলনাহারকে।

জয়গুনপুরের হইলদাটিলায় এসে সোবানালির বাড়িটি খুঁজে পায় না গুলনাহার। কোথায় সেই তর্জাবেড়ার খড়ে ছাওয়া চৌচালা ঘর? কোথায় নারকেলি আমের সেই গাছটি? দাওয়ার সামনে নিজ হাতে লাগানো মেহেদি গাছটাই-বা কোথায়? এসবের বদলে এখন সেখানে বিস্তৃত আখক্ষেত।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জয়গুনপুর হাটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। হাটের শুরুতেই মাছের আড়ত। আরেকটু সামনে এগুলে দুধের হাট। সেই দুধের হাট এখনো আগের মতোই আছে। একদিন সে এই হাটে পালকপিতা সোবানালির হাত ধরে দুধ বেচতে আসত। সকাল-বিকাল ঠিলা ভরা দুধ নিয়ে গোয়ালারা বসে থাকে এখানে। গুলনাহারের চোখ খুঁজে বেড়ায় পরিচিত কোনো গোয়ালার মুখ। একবার এই মাথা আরেকবার ওই মাথায় চক্কর দেয়। হাটের লোকজন ভিনবেশি অপরিচিতাকে দেখে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে ঠারে ঠারে কী যেন বলে, কানাঘুষায় মেতে ওঠে।

কাউকে না পেয়ে পশ্চিমের রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই হরিচরণ গোয়ালার দেখা পেল গুলনাহার। সোবানালির সঙ্গে হাটে দুধ বিক্রি করত হরিচরণ। বয়সের ভারে কানের লতি, থুতনির চামড়া ঝুলে গেলেও লোকটাকে চিনতে ভুল করল না সে। কিন্তু হরিচরণ সোবানালিকে চিনতে পারলেও ঠিক মনে করতে পারল না গুলনাহারের কথা। কত কথা বলল গুলনাহার, কত স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিছুই মনে করতে পারল না লোকটি। তবে আফসোসের সুরে লোকটি জানাল, সাত-আট বছর আগে সুধাবতীর ভাঙনের কবলে পড়ে সোবানালির বাড়িটি। বাস্তুভিটা হারিয়ে বেচারা এখন কোথায় আছে কেমন আছে তার কিছুই জানে না সে।

ভাঙনের কবলে পড়া বাস্তুভিটার মতোই গুলনাহারের পায়ের তলার শক্ত মাটি যেন ভাঙনের কবলে পড়ল। হরিচরণ গোয়ালার পাদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজের তলিয়ে যাওয়া অনুভব করে। গ্রৈষ্মিক সূর্যের প্রখর আলোও তার চোখের অন্ধকার দূর করতে পারছে না। ঘোরলাগা চোখে গনগনে সূর্যের দিকে তাকায়। ভাবে, সূর্যে বুঝি গ্রহণ লাগল! কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। কাউকে আর কোনোকিছুই জিজ্ঞেস করল না, বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসও উঠে এল না, চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও গড়াল না। ধীর পায়ে মেলাগামী নারী-পুরুষদের সঙ্গে শিবমন্দিরের মাঠের দিকে হাঁটা ধরল।

আলোর একটা রেখা এসে মন্দির-কক্ষের শ্যাওলাধরা দেওয়ালের ওপর পড়েছে। রেখাটি এই দেখা যায় তো ফের মিলিয়ে যায়। হালকা ঘুম নেমে এসেছিল গুলনাহারের চোখে। অন্ধকারে একটা হিশ্ হিশ্ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে

BanglaBook.org

গেল। সজাগ হয়ে উঠল মস্তিষ্কের কোষগুলো। মন্দিরের পেছনে বাঁশঝাড়ে কড়মড় শব্দ উঠছে। গুলনাহার ভাবে, বাঁশের চিকন কঞ্চিতে বাতাস লেগে বুঝি হিশ্ হিশ্ শব্দটা হচ্ছে। কিন্তু শব্দটা ঠিক বাতাসের বলে মনে হয় না তার। কেমন ভয় জাগানিয়া। তবে কি গোক্ষুর? পার্বত্য জাজিনগরের গোক্ষুরের কথা জানা আছে তার। লম্বায় একেকটা সাত-আট হাত পর্যন্ত হয়। সোবানালির বাড়ি থাকতে এরকম গোক্ষুর সে বিস্তর দেখেছে।

গায়ে ফোস্কা-ফোটা গরমে আলো-বাতাসহীন ছোট্ট কক্ষের ভেতরে অজানা ভয়ে গুলনাহারের শীত শীত লাগে। ঘুম কামনা করে দুই চোখ, কিন্তু ঘুম আসে না। আলোর রেখাটির উৎস খুঁজে বের করতে চারপাশে একবার চোখ বুলাল সে। দেখল, ডানপাশের দেওয়ালে চার-পাঁচটি খোপ। খোপগুলো দিয়ে পাশের কুটির থেকে আলোর ক্ষীণ রেখাটি ঢুকছে এই কক্ষে।

দেওয়ালে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সামনে এগিয়ে যেতেই আরেকটি ছাগলের সঙ্গে পা লাগা মাত্রই ভ্যাঁ ভ্যাঁ ডাক শুরু করল সব কটি ছাগল। কক্ষে তবে আরো ছাগল আছে! মনে মনে বলল গুলনাহার। খোপের ফাঁকে তাকিয়ে কুটিরের জানালা দিয়ে দেখতে পেল বুড়োকে। আগের মতোই গভীর পাঠে মগ্ন। পেছনের দেওয়ালের তাকে আরো কিছু পুরনো বই দেখা গেল। বুড়ো একবার বইয়ের ওপর ঝুঁকে আবার সোজা হয়ে বসেন। তারপর সময় নিয়ে কাগজে কী যেন লেখেন। বইয়ের দিকে ঝোঁকা মাত্রই বাতিটা আড়াল হলে এই কক্ষের আলোর রেখাটি মুছে যায়। সত্তর-পঁচাত্তরের কম নয় বুড়োর বয়স। বেশিও হতে পারে। মাথার সব চুল সাদা। পুরনো একটা তেপায়ার ওপর বইটি রেখে হাতলঅলা একটা কেদারায় বসে পড়ছেন। বইয়ের পাশে খাগের কলম আর কালির পাত্র। কেদারার হাতল দুটি বন্য-লতা কি পাট দিয়ে বাঁধা। খানিক পরপর হেলান দিতে গেলে হাতল দুটি দুদিকে হেলে পড়ার উপক্রম হলো। ক্যাঁচ করে মৃদু শব্দ উঠল। নিস্তব্ধ রাতে শব্দটা বেশ কানে লাগার মতো।

একবার এই খোপ আরেকবার ওই খোপের ফাঁকে বুড়োর চেহারাটা ভালো করে দেখে নেয় গুলনাহার। মানুষটির কাছ থেকে বিপদের কোনো আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না তার। সারা মুখে কেমন একটা পবিত্রতার ছাপ। তবু বিশ্বাস করা কঠিন। উদয়াচলের দেবেন্দ্র সাহার কথা মনে পড়ে তার। ষাটের বেশি হবে বয়স। এই বয়সেও সপ্তায় তিনদিন বিরজা মাসির কোঠায় যায়। কাপড়ের ব্যবসা আছে উদয়াচলে। অনেক টাকা-পয়সার মালিক। ইচ্ছেমতো উড়ায়। কোনো বেশ্যার কক্ষে এক মাসের বেশি যায় না।

BanglaBook.org

টাকা যাক, মাসে মাসে তার নতুন মাগী চাই। এ নিয়ে বিরজা মাসির সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিত।

ছাগলটা সেই যে ডাক শুরু করেছে আর থামছে না। একটা অসভ্য পশু, মনে মনে বলল গুলনাহার। খানিক পর পরই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডেকে উঠছে। তার ডাক শুনে বাকিরাও মাঝেমধ্যে ডেকে উঠছিল এতক্ষণ, যদিও এখন চুপচাপ। গুলনাহারের ভয় হয়, এই বুঝি বাতি হাতে বুড়ো ঢুকল এই কক্ষে! তাকে দেখে প্রথমে হয়ত ভয় পাবে। তারপর মুখে ভেসে উঠবে লালসার হাসি। এক ফুঁয়ে বাতিটা নিভিয়ে জাপটে ধরবে তাকে। হয়ত পৌরুষত্বে ভাটা পড়ে গেছে, তবু ব্যাকুল হয়ে উঠবে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। মুখের কাছে খাবার এলে কেউ কি ফিরিয়ে দেয়?

মুহূর্তে গুলনাহারের ভাবান্তর ঘটল। নিজমনে বলল, ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়? এই নির্জন রাতে মন্দিরবাসী বুড়ো মানুষটি তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করবে এই ভয়? হা হা শব্দে অট্টহাসি দিতে ইচ্ছে হলো তার। মুহূর্তে মনের ভেতর থেকে সমস্ত ভয় উড়িয়ে দিল। এতক্ষণ তার মনেই ছিল না সে এক নটী। রাজনটী গুলনাহার। রাজসভার বয়সী সভাসদরা সম্মান দেখিয়ে তাকে বাইজি বলে ডাকত, অল্প বয়সীরা সম্মান দেখিয়ে বলতো গুলনাহার বেগম। যে যা-ই বলুক, সে তো আসলে একটা বেশ্যা। রাঁড়ের বাড়ির বেশ্যাদের সঙ্গে তার তফাৎ শুধু এখানে—সে নাচতে জানে, তার ঘুঙুরের রুমঝুম শব্দে পুরুষের দিল-দরিয়ায় উথাল-পাতাল জোয়ার আসে, তার জরিওয়ালা লেহেঙ্গার চক্রাকার ঘূর্ণনে পুরুষের মস্তিষ্কের কোষে ঘূর্ণি ওঠে। তার লপেটা, হিন্দি গজল, কাওয়ালি, খেয়াল, ঠুংরি আর খেমটার সুরে তাদের প্রাণ আকুল হয়। ব্যস, এটুকুই। সে কি মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত কাটায়নি? উদয়াচলের অগুনতি পুরুষকে তার কামনার বহ্নিতে নিক্ষেপ করেনি? সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় আশ্লেষে-আলিঙ্গনে, চুম্বনে-শীৎকারে নিস্তব্ধ রাত কি মধুর করে তোলেনি? তবে এত ভয় কিসের?

হিশ্ হিশ্ শব্দটা আবার শোনা গেল। রোমকূপের গোড়ায় হিম-শিহরণটা আরো বাড়ল ভয়াতুরা গুলনাহারের। বুকের ভেতর সে টগবগ টগবগ ধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শুনতে পায়। একে তো ক্ষুধা, তার ওপর ভয়। আর বসে থাকতে পারে না সে। অবসন্ন শরীরটাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। মনের সমস্ত ভয় দূর করে সরাসরি কুটিরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভগ্নপ্রায় কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখল বই ছাড়া অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই বুড়োর। ছাগলগুলো যে এতক্ষণ থেমে থেমে তারস্বরে ডেকেছে তাও বুঝি শুনতে



BanglaBook.org

পায়নি। হাঁক দিল গুলনাহার—শুনতে পাচ্ছেন? আমি এক পথিক, পথ হারিয়ে ফেলেছি।

এত রাতে এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণে নারীকণ্ঠ শুনে চমকে ওঠার কথা বুড়োর, অথচ তার চেহারায় তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না গুলনাহার। যেন আগে থেকেই জানতেন আজ রাতে এক পথিক মন্দিরে আশ্রয় নেবে। ধীরে-সুস্থে বইয়ের ফাঁকে একটা ময়ূর কি কবুতরের পালক গুঁজে বইটি বন্ধ করে দরজার দিকে ফিরে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি, বহু দূরের পথিক।

বুড়ো কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, দরজা তো খোলাই আছে, আপত্তি না থাকলে ভেতরে আসতে পারেন। পথিকের জন্য এই মন্দির একদম নিরাপদ।

তবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল গুলনাহার। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবল। তারপর মৃদু ধাক্কায় কপাট দুটি ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল। বৃত্তাকার বড় একটা গাছের গুঁড়িতে মোম জ্বলছে। গলে গলে মোমের স্তূপ জমেছে গুঁড়িতে। বুড়ো হাতের ইশারায় মোমের কাছাকাছি আসতে বলেন গুলনাহারকে। একটা কাপড় দিয়ে চোখের দুই কোণ মুছলেন। তারপর যতটা সম্ভব গলা টান টান করে গুলনাহারের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন। কাঁধের আঁচলটা টেনে মাথার ওপর দিল গুলনাহার।

কী নাম তোমার, মা? জানতে চাইলেন বুড়ো।

মা সম্বোধন শুনে কেঁপে উঠল গুলনাহারের বুক, ভিজে উঠল দুই চোখের কোণ। কতদিন কেউ তাকে এভাবে ডাকেনি! দুই ফোঁটা অশ্রু চিবুক স্পর্শ করল। আলো-অন্ধকার কক্ষে দাঁড়ানো গুলনাহারের বিগলিত অশ্রু হয়ত দেখছেন না বুড়ো, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে ঠিকই বুঝে ফেলেছেন এই নারীর মনের কথা। গুদামের সঙ্গে লাগানো তক্তপোষের দিকে ইশারা করে বসতে বললেন তাকে। দেরি করল না গুলনাহার, গুদামে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। বলল, আমার খুব খিদা লেগেছে চাচা। যদি কিছু খেতে দেন তো জানে বাঁচি।

বুড়ো আরেকবার গুলনাহারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা মোম ধরিয়ে ভেতরের কক্ষে ঢুকলেন। খানিক পর দুটি কলা ও ছোট্ট একটা বাসনে কিছু চিড়া নিয়ে ফিরলেন। গুলনাহারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, রাতে কলা খাওয়া ঠিক না, কিন্তু এই ছাড়া আর কিছু নেই। আপাতত এগুলো খাও, দেখি সকালে অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

BanglaBook.org

মাটির লোটায় এক লোটা জল এনে গুলনাহারের সামনে রাখলেন বুড়ো। গোগ্রাসে গুলনাহার চিড়া আর কলা দুটি খেয়ে লোটার অর্ধেক জল গিলে মেঝেতে বিছানো বাঁশের চাটাইতে বসল। বুড়ো বললেন, কিছু মনে করো না মা, জাত-কুল না জেনে এই মন্দিরে কোনো পথিককে আশ্রয় দেওয়ার হুকুম নেই। তুমি কি ব্রাহ্মণকুলের?

বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেল গুলনাহার। শৈশবে হরিদশ্বের গওহর মুন্সির কাছে কায়দা-সিপারা পড়েছিল। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সবই ভুলে গেছে। শুধু এইটুকু জানে, তার জন্ম মুসলমানের ঘরে।

তবে কি তুমি কায়স্থ বা বৈশ্য? গুলনাহারের নীরবতা দেখে বললেন বুড়ো। গুলনাহার তবু নিশ্চুপ।

তাহলে শূদ্র?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে ভড়কে গেল গুলনাহার। সেই সঙ্গে খানিকটা বিরক্তও। ভারি তো বিপদ! এরকম জানলে কে আসত এই পোড়া মন্দিরে! মন্দির না ছাগলের খোঁয়াড়! বুড়ো মানুষ, জাত পরিচয় জানতে চাইছে। নিজেকে কোন জাতের বলে পরিচয় দেবে সে? না দিতে পারছে ব্রাহ্মণ পরিচয়, না পারছে শূদ্র বা মুসলমানের পরিচয়।

তবে কি যবন?

এবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল গুলনাহার। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর কপালের বয়সী চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। এই অকপট স্বীকারোক্তির জন্য গুলনাহারও প্রস্তুত ছিল না, নিজের অজান্তেই যেন সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেছে। খানিকক্ষণ নীরব থেকে বুড়ো জানালেন, মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। অতিসম্প্রতি গ্রামের সন্তোষ চৌধুরী এই মন্দিরের কর্তার দায়িত্ব নিয়েছে। নিজের টাকায় বিগ্রহ বসাবে এখানে। তার আদেশ মেনেই বুড়োকে এখানে থাকতে হয়। মন্দিরের টোলের মাইনেধারী পণ্ডিত তিনি। এই তল্লাটের সবাই অজয় কুমার পণ্ডিত হিসেবে এক নামে তাকে চেনে। মন্দির দেখাশোনার ভার তার ওপর। বৌদ্ধ বা যবনদের মন্দিরে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে বারণ রয়েছে কর্তার। তালুক দেখাশোনার কাজে বর্তমানে খণ্ডলে আছে কর্তা। ফিরে যদি কোনোভাবে জানতে পারে এই মন্দিরে যবনের পা পড়েছিল, তবে গ্রামের লোক ডেকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন।

গুলনাহার নিশ্চুপ। একদৃষ্টে জ্বলন্ত মোমের দিকে তাকিয়ে আছে। মন্দির-পুরোহিতদের এসব বিধি-নিষেধের কথা জানা আছে তার। বুড়ো-দেবতার

BanglaBook.org

মন্দিরের আশপাশে যে যবন ঘেঁষতে দেওয়া হয় না, তা তো নিজ চোখেই দেখেছে।

গুলনাহারের আরো বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলেন অজয় পণ্ডিত। এবার সত্যি সত্যি যেন কলিজার জল শুকিয়ে গেল গুলনাহারের। কী পরিচয় দেবে সে এ বুড়ো মানুষটির কাছে! উদয়াচলের রাজনটী? কোঠাবাসী নাচওয়ালি বা বেশ্যা? না, বাবার বয়সী এই মানুষটির কাছে নিজের আসল পরিচয় দিতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না তার। একে তো সে যবন, তার উপর যদি তার নটীবৃত্তির কথা জানতে পারেন তিনি, এখুনি হয়ত মন্দির ছেড়ে চলে যেতে বলবেন। অগত্যা একটা মিছামিছি গল্প ফাঁদল গুলনাহার। বলল, দিন পনেরো আগে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে সে বাবার সঙ্গে উদয়াচল গিয়েছিল। ফেরার পথে জ্বরে পড়ে বুড়ো বাবা মারা গেছেন। সেখানকার এক গোরস্থানে তাকে দাফন করে সে একা হরিদশ্বে ফিরে যাচ্ছে।

হরিদশ্ব? আগে কখনো যেন এই নাম শোনেননি পণ্ডিত।

আজ্ঞে, কমলাক্ষের হরিদশ্ব।

ও আচ্ছা আচ্ছা, বললেন পণ্ডিত। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু এই পথে তো কমলাক্ষ যাওয়া যায় না!

পণ্ডিতের কথায় বিচলিত হলো না গুলনাহার। এই দুর্গম পাহাড়ি পথে যে কমলাক্ষ যাওয়া যায় না তা যেন আগে থেকেই জানত সে। অথবা জানত না। না জেনেই এ পথে পাড়ি দিয়েছে। আসলে তার কিছুতেই কিছু যায় আসে না। যেন অনুভূতিহীন মাটির পুতুল।

জয়গুনপুরের এ-দিকটার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে শুরু করলেন অজয় পণ্ডিত। বড় বড় পাহাড়ের কথা বলেন, বন্য জীবজন্তুর কথা বলেন। কয়েকদিন আগেও পশ্চিমের পাহাড়ে বাঘে খেয়েছে একটা ছেলেকে। কাঠ কাটতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার শুমার নেই। কেউ কোনোদিন এই পথে কমলাক্ষ গেছে এ কথা তিনি শোনেননি। ভুল পথে এসেছে গুলনাহার। কমলাক্ষ যেতে হবে উদয়াচলের খোয়াল গাঙ পার হয়ে, নয়তো বিলোনিয়া হয়ে ক্যাপ্টেন লীক সড়ক ধরে। এ ছাড়া কমলাক্ষ যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ তার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, পণ্ডিত বললেন, আষাঢ়ের শুরুতে সুধাবতীর জল বাড়তে শুরু করলে জয়গুনপুর থেকে চাকলা রৌশনাবাদের দিকে নৌকা চলাচল শুরু হয়। এই একটা মাত্র উপায় আছে। কিন্তু আষাঢ় আসতে তো এখনো দু-মাস বাকি। নদীতে এখন চর পড়েছে, নৌকা চলাচলের মতো পর্যাপ্ত জল নেই।

BanglaBook.org

কিছুই বলে না গুলনাহার। কী করবে, কী করা উচিত, কিছুই স্থির করতে পারে না। পণ্ডিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, রাতটা আপাতত মন্দিরের কক্ষটাতে কাটাতে পারো। তবে সাবধান, ভোর হওয়ার আগেই কিন্তু চলে যেতে হবে।

আচ্ছা।

কেউ যেন দেখতে না পায়।

আজ্ঞে, পাবে না।

পণ্ডিতের পিছু পিছু মন্দির-কক্ষে ঢুকল গুলনাহার। কক্ষের এক পাশে একটি তোলা-উনান, কয়েকটি মাটির সানকি, একটি লোটা, একটি ঠিলা এবং কয়েকটি হাঁড়ি। হয়ত এখানেই রান্নাবাড়া হয় পণ্ডিতের। একটা উঁচু তক্তপোষে খেজুরপাতার মাদুর বিছানো। তেলচিটচিটে দুটি বালিশ আর কয়েকটি ভাঁজ করা কাঁথা পড়ে আছে। গুলনাহারকে শুয়ে পড়তে বলে মোমটা নিভিয়ে নিজের কুটিরে চলে গেলেন পণ্ডিত।

পরদিন ভোরে খবরটা শুনল শীতাংশুদেব। পুবের লালিমা ছাড়তে না ছাড়তেই তার বাড়িতে হামজা হাজির। ঘুমমারা চোখ দুটো লাল, চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ। শীতাংশুদেবের নাকডাকার শব্দ শুনে দাওয়ার বাঁশে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। প্রথমে ভেবেছিল এখনো হয়ত কালীতারার ঘুম ভাঙেনি। পরে হেঁসেলে বাসন-কোসনের টুংটাং শব্দ শুনতে পেল। খানিক পর সামনের ঘর ঝাড়ু দিতে এসে হামজাকে দেখে খানিকটা অবাকই হলো কালীতারা। সারা রাত মন্দির পাহারায় থেকে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়েছে শীতাংশুদেব। হামজার গলার আওয়াজ শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল তার।

সব শুনে শীতাংশুদেব বলল, কোথাও মুজরোয় যায়নি তো?

গুলনাহার যে তিন দিন মুজরো নিতে বারণ করেছিল সে-কথা জানাল হামজা। তার অজান্তে কোথাও মুজরোয় যাওয়ার তো কথা নয়। উদয়াচলের বাইরে কোথাও গেলে তো তাকে সঙ্গে নিয়েই যায়। তবুও কোথাও মুজরো ছিল কিনা মনে করার চেষ্টা করল হামজা।

মহলে খোঁজ নাওনি? জানতে চাইল শীতাংশুদেব।

মাথা নাড়ায় হামজা, আমি কি একা মহলে ঢুকতে পারব? কোঠায় আসার পর যতবারই গেছি গুলনাহারের সঙ্গেই গেছি। একা আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না প্রহরীরা।

BanglaBook.org

সব ভাবনা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে হামজার। হাত-পা ভাঙা মানুষের মতো সে দাওয়ায় বসে রইল নির্বাক। ততক্ষণে শীতাংশুদেবের ঘুমের রেশ পুরোপুরি কেটে গেছে। ব্যাপারটা তাকেও ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ভুলুয়ার কালেক্টর মেকগুইয়ারের অনুগত কিছু দুশ্চরিত্র লোক কদিন আগে উদয়াচল থেকে দুটো মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে, কেনই-বা নিয়ে গেছে কেউ কিছু জানে না। স্বাধীন জাজিনগরে এরকম একটা ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত মহারাজের কানেও উঠেছে ঘটনাটি। শীতাংশুদেবের মনে সেই শঙ্কাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। শুধু কালেক্টরের লোকজনই নয়, রিয়াংদের উৎপাতও এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিদ্রোহীদের কেউ কেউ এখনো রামচন্দ্র ঠাকুরের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। গুলনাহারকে তারা অপহরণ করাটাও বিচিত্র কিছু নয়।

খবরটা শোনার পর কালীতারার মনও খুব খারাপ হলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে কান্নাকাটি শুরু করল। তিন বছর হতে চলল গুলনাহারের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। গুলনাহারের কোঠা থেকে তাদের বাড়ির দূরত্ব দেড় ক্রোশের মতো। কোঠায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল তার। নগরের পুব দিকের এই বাড়িটাতে মেয়েকে নিয়ে থাকে শীতাংশুদেব। ভূমিকম্পের পর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য জয়গুনপুর থেকে রাজ্যপাট নিয়ে আসার সময় পোয়াতি বৌকে নিয়ে উদয়াচলে বসতি পত্তন করেছিল শীতাংশুদেব। মহলের উচ্চপদস্থ এক প্রহরীর মাধ্যমে বুড়ো-দেবতার মন্দিরের পাহারাদারের কাজটা জুটিয়ে নিয়েছিল। এখনো সে-কাজেই বহাল। বেশ কয় বছর আগে বৌ মারা গেছে। কালীতারাকে বিয়ে দিয়েছিল বিশালগড়ের এক গাড়োয়ানের কাছে। বছরখানেক পর কালীতারা বাবাবাড়ি বেড়াতে এলে ওলা রোগে তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পায়। আর যায়নি স্বামীর বাড়ি। তারপর থেকেই বিগ্রহ মন্দিরের সেবাদাসী হয়ে আছে। তিন বছর আগে খোয়াল গাঙে দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের দিন গুলনাহারের সঙ্গে প্রথম কথা হয়। তার বাচনভঙ্গি আর কথার টান লক্ষ্য করে কালীতারার কেন যেন মনে হয়েছিল গুলনাহারের বাড়ি উদয়াচলে নয়। সে জানতে চাইল, উদয়াচল কি আপনার স্থায়ী নিবাস?

হঠাৎ এমন একটি প্রশ্নে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল গুলনাহার। সামলে নিয়ে বলল, কেন বলুন তো?

কালীতারা বলল, এমনি জানতে চাইলাম।

প্রকৃত পরিচয় গোপন করে গুলনাহার জানাল, জন্ম এখানে না হলেও এখন সে উদয়াচলেরই স্থায়ী বাসিন্দা। বহু বছর ধরে এখানে আছে।

BanglaBook.org

আর কিছু জানতে চাইল না কালীতারা, ফুলের শূন্য ঝুড়িটা হাতে চলে গেল। তারপর আরো কয়েকদিন রাস্তায় গুলনাহারের সঙ্গে দেখা হয়। ততদিনে গুলনাহারের আসল পরিচয় সে জেনে যায়। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। কোঠায় যাতায়াত শুরু করল কালীতারা। গুলনাহারের ভালোই লাগে। আত্মীয়-স্বজনহীন এই উদয়াচলে কালীতারাকে পেয়ে ভালোই হয়েছে তার। এটা-সেটা নিয়ে গল্পগুজবে হাসি-ঠাট্টায় কোঠা মাতিয়ে তোলে দুজন। বয়সের তেমন ব্যবধান নেই দুজনের মধ্যে, বড়জোর তিন বছরের ছোট হবে কালীতারা।

কালীতারা অনেকবার চেয়েছে গুলনাহারকে তাদের বাড়ি আনতে। আজ যাবে কাল যাবে করেও গুলনাহারের যাওয়া হয় না। একবার খার্চীপূজার কয়েকদিন পর কালীতারাদের গ্রামে এক স্বর্ণবণিকের বাড়িতে মুজরো ছিল তার। কালীতারারও নিমন্ত্রণ ছিল। শেষরাতে আর কোঠায় ফিরল না গুলনাহার, সইয়ের পীড়াপীড়িতে তাদের বাড়িতেই রাত কাটাল।

দুপুরে বাবার ডাকাডাকিতে কালীতারার ঘুম ভাঙল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে শীতাংশুদেবের গলার আওয়াজ পরিচিত বলে মনে হলো গুলনাহারের। ঘুম উবে গেল তার। শৈশবে হরিদশ্বে যে মানুষটির গলার আওয়াজ রোজ শুনত, ঠিক যেন তারই গলা!

ততক্ষণে কালীতারা বিছানা ছেড়েছে। গুলনাহার শুয়ে শুয়ে ভাবে, একজনের সঙ্গে আরেকজনের গলার আওয়াজের এত মিল কি হতে পারে? ভেবেছিল আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে, কিন্তু ঘুম আর এল না চোখে। দাওয়ায় এসে শীতাংশুদেবকে দেখে চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। এ যে হরিদশ্বের শীতুকাকা! কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। শীতাংশুদেবের আরো সামনে এসে দাঁড়াল সে। চেহারাটা ভালো করে পরখ করে দেখল। না, বিন্দুমাত্র অমিল নেই। সেই লম্বা নাক, সরু কপাল, মুখে বসন্তের দাগ, হাড়-ঝিরঝিরে শরীর। বয়সের ভারে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে, কালো চুল সাদা হয়ে গেছে—অমিল শুধু এটুকু।

শীতাংশুদেব প্রথমে গুলনাহারকে চিনতে পারল না। তার চোখ গুলনাহারের মুখের ওপর থেকে সরে না। চেহারাটা বড় বেশি চেনা চেনা মনে হয় তারও। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল গুলনাহারের দুই চোখ। শীতাংশুদেব কিছু একটা বলতে যাবে তখনই অকস্মাৎ লুটিয়ে পড়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল গুলনাহার। কয়েক ফোঁটা অশ্রু শীতাংশুদেবের পায়ের পাতায় পড়ল। গুলনাহার বলল, কাকা, আমি নাহার। তারু সরকারের মেয়ে গুলনাহার।

BanglaBook.org

তারু সরকার! গুরুজির মেয়ে তুমি?

ডুকরে কেঁদে উঠল শীতাংশুদেব। গুলনাহারকে বুকে নিয়ে অবুঝ শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। শীতুকাকার বুকে পড়ে রাও ধরে কাঁদে গুলনাহার। শৈশবে তার নিরাপদ আশ্রয় ছিল মানুষটির বুক। বাবার গান শুনতে শুনতে কতদিন এই পিতৃবন্ধুর বুকে ঘুমিয়েছে তার কি হিসাব আছে? তারু সরকারের কবিগানের দলের দোহার ছিল শীতাংশুদেব। খুব ভালো ঢোল বাজাতে পারত। কমলাঙ্ক বা ডোঙাতলার চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় সারা বিকেল ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় যখন বিছানায় শুয়ে পড়ত গুলনাহার, তখন বাতাসে ভেসে আসত ডুম্ ডুমা ডুম্ ঢোলের বোল। কাৎ থেকে চিৎ হয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকত মেলার মাঠের দিকে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করত সেখানে। কিন্তু রাতের বেলায় কিছুতেই যেতে দিত না মনজুরি। বলত, আসরে ব্যস্ত থাকবে তোর বাপ, একা ভয় পাবি না? কে দেখবে তোকে?

আগের বছর মায়ের সঙ্গে বাবার আসর দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু মনজুরির কোলে এখন যমজ শিশু। তাদের নিয়ে তার পক্ষেও এখন আসর দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। গুলনাহার বলে, হিরুমণির সাথে যাব মা, বেশিক্ষণ থাকব না, এই যাব আর আসব।

কষে ধমক লাগায় মনজুরি, চুপ কর ফাজিল মেয়ে। ঘুমা তাড়াতাড়ি।

আসরে যাওয়ার কোনো মওকা খুঁজে না পেয়ে অগত্যা ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভাবে গুলনাহার। যেই না চোখ দুটি বুজে এল অমনি ঢোলের শব্দটা ভেসে এল আবার। বড় রাস্তার দিকে পাড়ার ছেলেমেয়েদের হৈচৈ শোনা গেল। সবাই মেলার দিকে ছুটেছে। আর শুয়ে থাকতে পারল না। খোলা জানালার মাটির দেওয়াল টপকে রুদ্ধশ্বাসে ছুট লাগাল। খড়ের মশাল জ্বালিয়ে রাস্তায় দলবেঁধে উল্লসিত ছেলেমেয়েরা নদীর হাঁটুজল ডিঙিয়ে মেলার দিকে ছুটছে। তাদের পিছে পিছে হৈচৈ করতে করতে সেও ছুটতে লাগল।

আসর তখন শুরু হয় হয়। মঞ্চে দেখা গেল তারু সরকারকে। মশালের আলোয় কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার মুখটা। বাবাকে দেখে হাততালি দেওয়া শুরু করল গুলনাহার। মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে শীতাংশুদেব অবিরাম ঢোল বাজাচ্ছে—ক্যান্ ক্যান্ ক্যান্ ক্রুতাক্ ক্রুতাক্ তাক তেরে তা তা তেরে তা। আহা, প্রাণ উথাল-পাতাল করা ঢোলের সে কি মিষ্টি বোল! ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক পা-দু-পা করে একেবারে চাঁদোয়ার নিচে চলে গেল গুলনাহার। আসরে বসা এক শ্রোতার পেছনে চুপচাপ হোগলার ওপর বসে পড়ল। ততক্ষণে সভাবন্দনা শুরু করেছে তারু সরকার—

BanglaBook.org

বন্দে মাতা সুরধ্বনি পুরাণে মহিমা শুনি
তুমি মাগো অগতির গতি।
তুমি মা বাজাও বীণা হয়ে তুমি পদ্মাসীনা
চোরেরে সাধু করি দেও তারে শুভমতি।
কালিদাস ভবভূতি আর যত মহামতি
অবনী উপরে আছে নাম।
তোমার প্রসাদ পেয়ে আনন্দে কবি গেয়ে
তারু যেন যায় দিব্যধাম।

বাবার সঙ্গে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে গাইতে থাকে গুলনাহার। বাবার মুখে কতবার শুনেছে এই বন্দনাগীত! শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। গাইতে গাইতে এ-পাশ ও-পাশ দুলতে থাকে। জুড়ির ছুন্ ছুনাৎ ছুন্ শব্দে আনন্দে নেচে ওঠে তার মন। বাদকের কাছ থেকে জুড়িটা কেড়ে নিয়ে নিজে বাজাতে ইচ্ছে করে তার। শীতাংশুদেব আসরের দিকে তাকিয়ে হেলে-দুলে ঢোল বাজাচ্ছে। গুলনাহারের মনে হয়, শীতুকাকা বুঝি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাই সে মাথাটা নিচু করে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। শীতাংশুদেবের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গুলনাহার ভাবে, এই যা! শীতুকাকা বুঝি তাকে দেখেই হাসছে। আবার সে সোজা হয়ে বসল। দেখেই যখন ফেলেছে, তো কী আর করা! উতোরটা শুরু হোক, তারপর ভিড় ঠেলে শীতুকাকার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। কানে কানে বলবে, বাপজানকে বলবে না আমি যে এখানে, ঠিক আছে কাকা? শীতুকাকা হেসে বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, চুপচাপ বসো গিয়ে। বেশিক্ষণ থাকবে না কিন্তু, কিছুক্ষণ পরই বাড়ি ফিরে যাবে, কেমন?

তারু সরকারের চাপান শেষ হলে সম্বিত ফিরে পায় গুলনাহার। এবার শুরু হবে উতোর। সরাইল থেকে যে দলটি এসেছে তাদের দলপতি এখন উতোর ধরবে। উতোরটা শেষ হোক, তারপর বাবার চাপানটা শেষ হলেই সে বাড়ি ফিরে যাবে।

চাপানের পর উতোর আসে, উতোরের পর চাপান। আসর জমে ওঠে দুই দলের কাব্যিক লড়াইয়ে। রাত ক্রমে গভীরতার দিকে গড়ায়। মাঠের চারদিকে মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ দেখে ভয় করে গুলনাহারের, বাড়ি যাবার কথা ভেবে কান্না পায়। কার সঙ্গে সে বাড়ি ফিরবে? পাড়ার ছেলেমেয়েরা কি আছে এতক্ষণ? একা ফিরতে গেলে যদি রাক্ষসে ধরে! বর্গীরা যদি ধরে নিয়ে যায়!

BanglaBook.org

এসব ভয়ের ঘেরাটোপে পড়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। শ্রোতারা হৈহৈ করে উঠল। একজন ধমক লাগাল, চুপ কর বেটি! ধমক খেয়ে আরো বেড়ে গেল তার কান্না। মঞ্চ থেকে কান্নার স্বরটা বুঝি চিনতে পারল শীতাংশুদেব। দ্রুত এসে তাকে কোলে তুলে মঞ্চের এক পাশে বসিয়ে দিল।

সেসব কথা, সেসব স্মৃতি আজ তরতাজা হয়ে ধরা দিচ্ছে গুলনাহারের কাছে। স্বজন-পরিজনহীন এই উদয়াচলে এতটা দিন একা পড়ে আছে, অথচ কত কাছেই না ছিল শীতুকাকা! এতদিন কেন দেখা হলো না তার সঙ্গে!

সেদিন থেকে শীতাংশুদেবের ঘরেরই একজন হয়ে গেল সে। সময় পেলেই চলে আসত তার বাড়ি। বাজার থেকে এটা-ওটা কিনে হামজাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত শীতুকাকার জন্য।

আর দেরি করল না শীতাংশুদেব। কোথায় গেল মেয়েটা খুঁজে তো দেখতে হবে। মহলের কয়েকজন প্রহরীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে তার। ফৌজের বক্সী রামহরি ঘোষের সঙ্গে তাদের একজনের ভালো খাতির। তার কাছে যাবে বলে মনস্থির করল সে। কোনোভাবে রামহরি ঘোষের সঙ্গে দেখা করে গুলনাহারের খোঁজখবর নেওয়া যায় কিনা চেষ্টা করবে। চটজলদি নতুন একটা ধুতি পরে হামজাকে কোঠায় ফিরে যেতে বলে মহলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভোর হওয়ার আগে মন্দির ত্যাগ করা হলো না গুলনাহারের। বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ি ভোর। শেষরাতে আরেক দফা বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ। তখনো ঘুম ভাঙেনি অজয় পণ্ডিতের। বৃষ্টিধোয়া শীতল বাতাসে হয়ত ঘুম ঝেঁকে বসেছে তার চোখে। সূর্য ওঠার আগেই কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গুলনাহার। তাকে না জানিয়ে মন্দির ত্যাগের ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঘুম ভাঙেনি দেখে মন্দির-কক্ষে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সূর্য তেঁতে উঠলে কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত। রাতে মন্দিরে কাউকে যে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে কথা যেন বেমালুম ভুলে গেছেন। হয়ত ভোলেননি। ভেবেছেন, ভোর হওয়ার আগেই বুঝি চলে গেছে মেয়েটা।

পণ্ডিতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গুলনাহার বলল, আপনার উপকারের কথা ভুলব না কোনোদিন।

হাত থেকে লোটাটি নামিয়ে গুলনাহারের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন পণ্ডিত। রাতের দেখার সঙ্গে এখনকার দেখার কোনো মিল খুঁজে

BanglaBook.org

পাচ্ছেন না। এক রাতের টানা ঘুমে চোখের নিচের কালো দাগটা মুছে গেছে। ঘন ভ্রুর নিচে ফোলা ফোলা চোখ দুটির সৌন্দর্য দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। দেখে মনে হয় না এই নারীর বয়স তিরিশেরও বেশি।

কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? জানতে চাইলেন পণ্ডিত।

গুলনাহারের দৃষ্টি মাটির দিকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁচায়। কোথায় যাবে, এই প্রশ্নের উত্তর তো জানা নেই তার। সে কেবল একটা কথাই জানে—উদয়াচল আর ফিরে যাবে না।

অজয় পণ্ডিত বললেন, এত দূরের পথ একা যাওয়া নিরাপদ হবে না। যে পথেই যাও দস্যুর ভয় আছেই। কয়েকটা দিন আগে হলে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যেতে পারতে। অশোকাষ্টমীতে স্নান উপলক্ষে অনেক মানুষ কমলাঙ্ক হয়ে লাঙ্গলবন্দ যায়। তাদের সঙ্গে যাওয়াটা নিরাপদ হতো।

দস্যুর কথা শুনে হাসির রেখা ফুটে উঠল গুলনাহারের গোলাপি কোমল ঠোঁটে। দস্যু কী নেবে তার কাছ থেকে? সামান্য সোনার গহনা বা মহারাজের দেওয়া গলার হাঁসুলিটা, এই তো? দস্যু-ডাকাতকে ভয় পেয়ে লাভ কী তার? কোথায় যাবে সে? এখানে তো আর থেকে যেতে পারছে না। যেভাবেই হোক হরিদশ্বে পৌঁছতে হবে তাকে। পথে মৃত্যু হলেও আপত্তি নেই তার। রক্তের ভেতর জন্মভূমির টান অনুভব করছে খুব।

গুলনাহারের চোখ দেখে তার মনের কথা কিছু বুঝতে পারলেন অজয় পণ্ডিত। জীবনে তো আর কম মানুষ দেখেননি তিনি। কত মানুষের সঙ্গেই না মিশেছেন! জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ভেতর উন্নত বোধের সৃষ্টি করেছে। মানুষের চোখ আর কথা বলার ধরন দেখেই বুঝতে পারেন কী বলতে চায় মানুষটা। সে চোর না দস্যু-ডাকাত, রাজপাদোপজীবী না নগণ্য প্রজা, পীর-আউলিয়া না বদমাশ, ভদ্র না লম্পট—সবই বুঝতে পারেন তিনি।

যৌবনের শুরুতে তিনি কাঁসারু ছিলেন। কাঁসার তৈজসপত্র তৈরি করে নানা হাট-বাজারে বিক্রি করতেন। ধীরে ধীরে কাঁসারু হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল পরগণা থেকে পরগণায়। তার তৈরি তৈজসপত্র যেতে শুরু করল উদয়াচল, দাঁদরা, কমলাঙ্ক, জুগিদিয়া, কৈলাসহর, মণিপুর এবং কখনো কখনো শ্রীহট্টেও। ব্যবসার কাজে মাঝে মধ্যে তিনি চলে যেতেন দূর-দূরান্তের নগর বন্দরে।

মণিপুর রাজার কাছ থেকে একবার বেশ কিছু তৈজসপত্র গড়ে দেওয়ার ফরমাশ পেলেন। সঞ্চয়পাতি ভেঙে অধিক উপার্জনের আশায় সময়মতো জিনিসগুলো পৌঁছে দিলেন রাজমহলে। মহারাজ খুশি হয়ে নগদ পাওনার সঙ্গে

BanglaBook.org

বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রাও বখ্শিশ দিলেন তাকে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ তার, ফেরার পথে কুকি দস্যুরা সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিল তার। অনেক আকুতি-মিনতি করে প্রাণে রক্ষা পেলেন। ভেবেছিলেন মণিপুর থেকে ফিরে বিয়ে করে সংসারী হবেন। সেই আশা পূরণ হলো না আর।

বাবা ছিলেন টোলের পণ্ডিত। বিদ্বান হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সর্বস্ব হারিয়ে অগত্যা বাবার পথেই হাঁটা ধরলেন। নানা বই সংগ্রহে ছিল বাবার। একদিন কালীদাসের *মেঘদূত* পড়ে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। ক্রমে পাঠের নেশায় পেয়ে বসল তাকে। দূর-দূরান্ত থেকে নানা পুঁথি, কাব্য আর শাস্ত্রীয় বইপুস্তক জোগাড় করে আনতে শুরু করলেন। ঠিক তখনই পরিচয় হলো পণ্ডিত রামগঙ্গা বিশারদের সঙ্গে। ক্রমে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তার কাছ থেকে *পঞ্চবেদ*, *উপনিষদ*, *রামায়ণ* ও *মহাভারত* সংগ্রহ করে সেগুলোর পাঠ শেষ করলেন। তবু ফুরায় না তার পাঠ। চলতে থাকে অবিরাম। এখনো সেই পাঠেই নিবিষ্ট আছেন।

দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের সভাকবি হিসেবে উদয়াচলেই থাকেন রামগঙ্গা বিশারদ। লোক-মারফত বন্ধুর খোঁজখবর নেন নিয়মিত। মাঝে মধ্যে টাকা-পয়সা আর কাপড়-চোপড়ও পাঠিয়ে দেন। কদিন আগেও এসে ঘুরে গেছেন। *কৃষ্ণমালা* কাব্যের পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে গেছেন অজয় পণ্ডিতকে। মহারাজের নির্দেশে বহু বছর ধরে পরিশ্রম করে কাব্যটি লিখেছেন। বন্ধুকে দিয়ে একবার পড়িয়ে নেওয়া ছাড়া রাজার কাছে হস্তান্তর করতে চাচ্ছেন না। এখন সেই কাজেই ব্যস্ত অজয় পণ্ডিত। রাত নেই দিন নেই, *কৃষ্ণমালা* নিয়ে পড়ে আছেন। যে বিষয়গুলো খটকা লাগছে, টুকে রাখছেন কাগজে।

গুলনাহারকে ভেতরে বসতে বলে লোটা হাতে কুয়াতলার দিকে এগিয়ে গেলেন পণ্ডিত। কিছুক্ষণ পরই শিষ্যরা আসতে শুরু করবে। দুপুর পর্যন্ত চলবে পাঠদান। আগে বেশ কজন শিষ্য নিয়মিত মন্দিরে থাকত। মন্দির মেরামতের কাজ শুরু হবে বলে আপাতত তারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে যাতায়াত করছে।

কুয়াতলা থেকে ফিরে এক অদ্ভুত কথা জানালেন পণ্ডিত। বহুদিন আগে নাকি এক কিশোরী এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেও ছিল যবন সম্প্রদায়ের। সেদিন গঙ্গাপূজা ছিল। গাঙে পূজাকর্ম শেষ করে পূজার্থীরা যার যার বাড়ি চলে গেল। সন্ধ্যায় মেয়েটাকে একা গাঙকূলে বসে থাকতে দেখে পণ্ডিত ভাবলেন এই গ্রামের মেয়েই হবে বুঝি। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে অথচ মেয়েটা কোথাও যাচ্ছে না দেখে তার মনে সন্দেহ জাগল। তাকে ডেকে

BanglaBook.org

মন্দিরে নিয়ে এলেন। নাম-সাকিন বলেছিল মেয়েটা, এতদিনে ভুলে গেছেন। তবে কমলাঙ্কের দিকেই যে তার বাড়ি এটা তার মনে আছে।

মেয়েটির আসল নাম বদল করে হেমাপ্রিয়া রেখেছিলেন অজয় পণ্ডিত। সবাই তাকে হেমাদাসী বলে ডাকত। প্রায় এক যুগ আগে সে এই মন্দিরে দেবদাসী হিসেবে ছিল। মেয়েটা যে যবন, সেকথা কখনো কাউকে জানতে দেননি পণ্ডিত। রান্নাবাড়া, মন্দির ঝাড়মোছ করাসহ খুঁটিনাটি নানা কাজে তাকে সাহায্য করত হেমাদাসী। যুবতী হওয়ার পর তার চেহারাটা ঠিক গুলনাহারের মতো হয়েছিল। এই যেমন খানিকটা লম্বাটে মুখ, গোলাপি ঠোঁট, বাঁকানো ভ্রু, কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, আর দশজন মেয়ের চেয়ে লম্বা-চওড়া। তবে গুলনাহারের মতো সে এত ফর্সা ছিল না, শ্যামলা ছিল তার গায়ের রং। উপরের পাটিতে একটা গেজদাঁত ছিল। হাসার সময় কী যে মায়া লাগত!

বেশ কয় বছর আগে একদল গোরা সৈন্য সুধাবতীর পাড়ে তাঁবু ফেলেছিল। খার্চিপূজা উপলক্ষে তখন টোল বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন। সৈন্যরা দেড় মাসের মতো ছিল সেখানে। যেদিন তারা চলে গেল সেদিন থেকে হেমাদাসীকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সৈন্যরা এখানে তাবু ফেলার কয়েকদিন পরই হেমাদাসীর মধ্যে এক ধরনের চঞ্চলতা টের পেয়েছিলেন পণ্ডিত। গভীর রাতে সুধাবতীর পাড়ে মাঝে মধ্যেই নারীকণ্ঠের কথাবার্তা শুনতে পেতেন তিনি। এক বিকেলে মন্দিরের সামনে এক সেপাইকে দেখতে পেয়েছিলেন। এ নিয়ে হেমাদাসীকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। কেন করবেন? মনে মনে তিনি যে আশঙ্কা করেছেন তা সত্য হলেও হতে পারে। দেবদাসীর ওসব কিছুতে তেমন মাথা ঘামান না তিনি।

পণ্ডিতের মুখখানা কেমন নরম হয়ে উঠল। বললেন, মেয়েটা চলে যাওয়ার পর অনেক কেঁদেছিলাম। সেবা-যত্ন করে মায়া ধরিয়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতের চোখের কোণ সত্যি সত্যি ভিজে উঠল। ধুতির খুঁটে চোখে মুছে বললেন, বর্ষা শুরু হতে এখনো দুই মাস বাকি। এই কদিন ইচ্ছে করলে তুমি সেবাদাসী হয়ে মন্দিরে থাকতে পারো। খবর পেয়েছি, এখনি গ্রামে ফিরছে না সন্তোষ চৌধুরী। ফিরলেও অসুবিধা নেই, আমি বুঝিয়ে বললে তিনি কিছু বলবেন না।

গুলনাহারের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালেন পণ্ডিত। বললেন, আচ্ছা, তোমার কি বিয়ে-থা হয়েছিল?

BanglaBook.org

চকিতে বুড়োর চোখের দিকে তাকাল গুলনাহার। আগে যেসব কথা জেনেছেন তো জেনেছেন, এবার যা জানতে চাইলেন তাতে আগের চেয়ে আরো বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো গুলনাহার। সন্দেহ জাগল, অজয় পণ্ডিত বুঝি তার নটীবৃত্তির বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছেন! জয়গুনপুরের মানুষরাও তবে নটী চিনতে ভুল করে না! পায়ে ঘুঙুর নেই, চুলে সুগন্ধি ফুলের মালা নেই, চোখে সুরমা নেই, গায়ে লেহেঙ্গা নেই—তবু তাকে চিনে ফেললেন পণ্ডিত!

নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে পারল না গুলনাহার। মন্দিরবাসী সহজ-সরল এই বুড়োর সঙ্গে মিথ্যা বলাটা পাপ বলে মনে হলো তার। মন বলল, সত্য বললে অসুবিধা কী? সত্য-মিথ্যা যা-ই বলুক, এখানে তো আর থাকতে পারছে না সে। আসল পরিচয় জানাতে বাধা কোথায়?

দীর্ঘ সময় নিয়ে আদ্যান্ত সব শুনলেন অজয় পণ্ডিত। ততক্ষণে টোলের শিষ্যরা আসতে শুরু করেছে। মন্দিরের পেছনে বটগাছের নিচে চাটাই পেতে তাদের বসতে বললেন তিনি। চাটাই নিতে এসে দুই শিষ্য পণ্ডিতের সঙ্গে গুলনাহারকেও নমস্কার জানাল। দু-হাত করজোড় করে প্রতিনমস্কার জানাল গুলনাহার।

জীবনযুদ্ধে নিরন্তর লড়াকু এই নারীর জন্য অজয় পণ্ডিতের মনে করুণা জাগল। যদিও তার গম্ভীর মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। কাঁসার বাটা থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে দিলেন তিনি। খিড়কির ফাঁকে পিক ফেলে বললেন, তবে সাবধান, তোমার আসল পরিচয় জানাবে না কাউকে। না যবন, না নটী। বলবে, এর আগে তুমি উদয়াচলের চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের দেবদাসী ছিলে। আমার শিষ্যরা কখনো মন্দিরে আশ্রিতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে না, বরং শ্রদ্ধা করে সবাই। হেমাদাসীকেও শ্রদ্ধা করত। নিজেদের বড়দিদি বলে মনে করত সবাই।

ঘাড় নেড়ে পণ্ডিতের কথার সমর্থন জানাল গুলনাহার। না, কাউকে তার আসল পরিচয় জানাবে না কোনোদিন। দেবদাসী হোক কি দেববেশ্যা, যে কোনো উপায়ে সে বেঁচে থাকতে চায়। হোক সে মুসলমান, নটীর আবার ধর্মাধর্ম কী? ধর্মীয় পরিচয় ছিল যদিও, এখন কি আর বাকি আছে কিছু? পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ জীবনে ধর্মীয় পরিচয় এখন গৌণ।

বটমূলের বেদীর ওপর বসে শিষ্যদের পাঠদান শুরু করলেন পণ্ডিত। খিড়কির ফাঁকে অপলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গুলনাহার। সেই কৈশোরে হইলদাটিলার সুবল পণ্ডিতের টোলে তাকে ভর্তি করেছিল

BanglaBook.org

সোবানালি। দত্তক হলেও মেয়েকে ভালো লেখাপড়া শেখানোর খুব ইচ্ছে ছিল তার। গুলনাহারও বেশ মনোযোগী ছিল লেখাপড়ায়। দু-একবার শুনলেই যে কোনো পড়া মুখস্থ করে ফেলতে পারত। বাংলা বর্ণপরিচয় শেষ করে কাশীরাম দাসের *মহাভারত* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* খানিকটা শিখেছিল সুবল পণ্ডিতের টোলে। *মহাভারতের* একটি শোলক এখনো তার মনে আছে :

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী লিখন
এতদূরে শল্য পর্ব্ব করি সমাপণ।

সহপাঠীদের মুখে মুখে ফিরত শ্লোকটি। *মহাভারতের* প্রসঙ্গ উঠলেই শ্লোকটি আওড়াত সবাই। গুলনাহারের বড় গুণ ছিল, দশ-এগারো বছর বয়সেই সে মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারত। পাড়ার কারো বিয়ে-শাদি, মুখে ভাত বা হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে মুখে মুখে অনবরত কবিতা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিত পারত। এটুকু মেয়েকে টোলের পণ্ডিতের মতো অনর্গল ছড়া কাটতে দেখে মহিলাদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। সোবানালি হাসতে হাসতে বলত, বাবার রক্ত মেয়ের শরীরে। নইলে এত কিছু পারে কেমন করে!

*মহাভারতের* আদিপর্ব শেষ করে যেই না সভাপর্ব শুরু করল, তখনই টোল ছাড়তে হলো গুলনাহারকে। তারপর সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় রোজ গানের রেয়াজ আর নাচের তালিম নিতে গিয়ে এসবের কথা আর মনেই থাকল না।

অজয় পণ্ডিতের পাঠদানের সময় রোজ খিড়কির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে গুলনাহার। কত কিস্‌সা, কত শ্লোক বলেন পণ্ডিত। যবন বীর শমসের গাজীর কিস্‌সা বলেন, কুকী দস্যুদের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনি বলেন, রিয়াং বিদ্রোহীদের কথা, অসহায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার নির্ম্মম পরিণতি এবং কোম্পানির লোকেরা কিভাবে মুর্শিদাবাদ দখল করেছিল সেই কথাও বলেন। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খাঁর কথা বলেন, কুষ্ঠরোগে তার করুণ মৃত্যুর কথাও বাদ দেন না। কথা একবার শুরু করলে শেষ করার কথা ভুলে যান। শিষ্যরা চুপচাপ শুনে যায়, কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করে না।

পণ্ডিতের কথা শুনতে শুনতে কৈশোরের সুবল পণ্ডিতের চেহারা ভেসে ওঠে গুলনাহারের স্মৃতির আয়নায়। একজনের ছিল লম্বা গোঁফ, আরেকজনের দাড়ি-গোঁফহীন মুখ। বয়সেরও তেমন ফারাক নেই। গুলনাহার মুসলমান বলে সহজে কাছে ঘেঁষতে দিত না সুবল পণ্ডিত। সেই পণ্ডিত আর এই পণ্ডিতের মধ্যে কত না ফারাক!

BanglaBook.org

ক্রমে দখিনা বাতাসের গতিবেগ কমে এল। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ়ের শুরু এখন। আকাশে ভাসতে শুরু করল ঘোলা মেঘ। গাছে গাছে আর শোনা যায় না কোকিলের ডাক। ঘোলা হতে শুরু করেছে সুধাবতীর জল। গুলনাহারের চোখ স্থির হয়ে থাকে নদীর উজানে। এই বুঝি এল কমলাঙ্কগামী কোনো নৌকা! নদীর স্রোতে বড় বড় আঁটিবাঁধা সারি সারি মুলিবাঁশ ভাসিয়ে নেয় বেপারিরা। দূরের পাহাড় থেকে কেটে আনা হয় এসব। ভগবানের দান। কারো কাছ থেকে কিনে আনতে হয় না, কাউকে দিতে হয় না কর। কাটো আর আঁটি বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দাও। সমতলের নানা পরগণায় খুব কদর এসব বাঁশের। এই সময় কিনে খালে-বিলে ডুবিয়ে রাখবে, শুকনো মৌসুমে শুরু হবে ঘর ছাওয়ার কাজ। জীর্ণ চাল ভেঙে নতুন বাঁশের নতুন চাল ওঠে ঘরে ঘরে।

শুধু কি বাঁশ? জাজিনগরের আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল ও আনারসের স্বাদের কথা সমতটের কে না জানে? জাজিনগরের ফল-ফলাদি মানেই দামে কম, স্বাদে অনন্য। প্রতি বছর মৌসুমি ফলভর্তি অনেক নৌকা কমলাঙ্কের দিকে যায়। অবশ্য তার বেশিরভাগই কাঁঠাল বা আনারসের। দস্যু-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য বেপারিরা ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে মন্দিরে এসে পূজা দেয়। একদা এই মন্দিরে বিগ্রহ ছিল। শমসের গাজী যখন জয়গুনপুর জয় করলেন, তার কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য বিগ্রহগুলো ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বিগ্রহ নেই, তবু সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভক্তি রাখে এই মন্দিরে।

নদীর উজানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, পশ্চিম আকাশের হলুদ আবির মুছে যায়। সন্ধ্যায় বাঁশের কঞ্চি পুঁতে নদীর পারে নিশানা দেয় গুলনাহার। সকালে এসে পরখ করে দেখবে পানি বাড়ল না কমল।

কদিন পর পরিচিত এক বেপারির নৌকায় গুলনাহারকে তুলে দিলেন অজয় পণ্ডিত। হাতে দুখানা চিঠি দিয়ে বললেন, কোথাও যদি থাকার কোনো ব্যবস্থা না হয় তুমি কমলাঙ্কের সতেরো রত্নমন্দিরে উঠতে পারো। শিবরঞ্জন ঠাকুর নামের এক পুরোহিত থাকেন সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবে। কিছু না হোক, অন্তত মন্দিরে হলেও থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। চিঠিতে যা লেখার আমি লিখে দিয়েছি।

দ্বিতীয় চিঠিটা জালাল মির্জা নামের এক দোকানির কাছে লেখা। গঞ্জে তার মুদিখানা আছে। রত্নমন্দির যেতে না চাইলে গুলনাহার জালাল মির্জার কাছে যেতে পারে। গুলনাহারকে পণ্ডিত নিজের ভাতিজি বলে উল্লেখ করলেন

BanglaBook.org

বেপারিদের কাছে। বিনিময় হিসেবে দিলেন আট আনা পয়সা। কমলাঙ্কে পৌঁছতে তো সময় লাগবে, এই কয় বেলা গুলনাহারের খাবারের ব্যবস্থা করবে বেপারি।

নৌকা চলতে শুরু করল। চরাটে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল গুঁজে অবিরাম চোখের জল ফেলতে লাগল গুলনাহার। এই উদার মনের মানুষের দেখা কি আর পাবে কোনো দিন!

রামহরি ঘোষের সঙ্গে শীতাংশুদেব দেখা করার সপ্তাহখানেক পর মহলে হামজার ডাক পড়ল। গুলনাহারের বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান মহারাজ। হামজা গেল। দুর্গামণি ঠাকুর কর্তৃক গুলনাহার লাঞ্ছিত হওয়ার কথা হামজার কাছ থেকে শুনে বিচলিত হলেন মহারাজ। বুঝতে পারলেন অকারণেই যে গুলনাহারের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন অবশ্য তার মেজাজও ঠিক ছিল না। গুলনাহার আসার কিছুক্ষণ আগে লস্কররা এক রিয়াং বিদ্রোহীকে আটক করে তার সামনে হাজির করে। লোকটা ছিল রামচন্দ্র ঠাকুরের অনুগত। মহারাজের সামনে এসে নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল সে। পেছন থেকে এক লস্কর মৃদুস্বরে বারবার মহারাজকে কুর্নিশ করার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু লোকটা আমলেই নিচ্ছিল না।

মহারাজের নির্দেশে সেনাপতি আছুমণিদেব কুর্নিশ না করার কারণ জানতে চাইলে বিদ্রোহী বলল যে, সে মনে-প্রাণে বিজয়মাণিক্যপুত্র রামচন্দ্র ঠাকুরকেই জাজিনগরের ভবিষ্যৎ মহারাজ মনে করে। বর্তমানে যে সিংহাসন দখল করে আছে তাকে কোনোরূপ সম্মান দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না সে।

একে তো লোকটা বিদ্রোহী, তার উপর বন্দী। তবু তার এমন গোঁয়ার্তুমি দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন মহারাজ। বিদ্রোহীর হাত-পা কেটে তারপর হত্যা করে খোয়াল গাঙে ভাসিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মহারাজের এমন নির্দেশে আছুমণিদেবসহ অন্যরা প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। জাজিনগরের নারী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সবার কাছে দয়াবান হিসেবে স্বীকৃত মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য। প্রজারা বলে, তিনি তো দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য নন, দ্বিতীয় কৃষ্ণমাণিক্য। কৃষ্ণমাণিক্যের মতোই দয়ালু। স্বর্গত মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বদান্যতার কথা রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যের প্রজাদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়েছিল। নবদ্বীপ থেকে যেসব ব্রাহ্মণ-

BanglaBook.org

পণ্ডিতকে উদয়াচলে এনে তিনি ভূমি ও অর্থ দান করেছিলেন, তারা এখনো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শত্রু শমসের গাজী প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি যে তিনি নিষ্কর হিসেবে বহাল রেখেছিলেন, সেই মহত্ত্বের কথা কোনোদিন ভুলবে না প্রজারা। দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের মধ্যে তারা কৃষ্ণমাণিক্যের ছায়া দেখতে পায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে নগেন্দ্র জ্যোতিষ বলে বেড়ায়, মৃত্যুর পর কৃষ্ণমাণিক্যের আত্মাই নাকি দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের ওপর ভর করেছে।

দিন যতই যাচ্ছে মহারাজের দয়া-দাক্ষিণ্য বাড়ছে। সভাসদরা লক্ষ করেছে আগের চাইতে অনেকটা শান্ত ও গম্ভীর হয়ে পড়েছেন মহারাজ। উত্তেজিত হওয়া তার স্বভাবে ছিল না কখনো। সিংহাসনে আরোহণের পর তার ওপর দিয়ে কম ঝড়-ঝাপটা যায়নি। একদিকে দুর্গামণি ঠাকুরের রাজপদে অভিলাষী হয়ে ওঠা, অন্যদিকে চট্টলায় বসে রামচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক রিয়াং প্রজাদের তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা এবং চাকলা রৌশনাবাদের শাসনভার তার হাতে পুনর্প্রদানের ব্যাপারে রেসিডেন্ট জন বুলারের বিরোধিতা—এসব বিষয় তাকে খুব অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি সবকিছুর মোকাবিলা করেছেন। তিন বছর লাগলেও শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র ঠাকুরকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শত শত বন্দী বিদ্রোহীকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, কত নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছেন, কত অভাবতাড়িত মানুষের অভাব দূর করেছেন, রাতের অন্ধকারে মাত্র দুজন প্রহরী নিয়ে কত শীতার্ত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বস্ত্র পৌঁছে দিয়েছেন, তার মহানুভবতায় কত দুঃখীর মুখে হাসি ফুটেছে, অথচ সামান্য এই রিয়াং বিদ্রোহীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কিনা তাকে উত্তেজিত করে তুলল!

উত্তেজনার রেশ তখনো মহারাজার মন থেকে কাটেনি, ঠিক তখনই গুলনাহারের কুর্নিশ না করার বিষয়টি তাকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল। সাধারণ কোনো প্রজা হলে নির্ঘাত ধড়-মুণ্ডু ছিন্ন করার আদেশ দিয়ে বসতেন তিনি।

পরে অবশ্য গুলনাহারের কথা ভেবে মন খারাপ করেছেন মহারাজ। এভাবে তাকে অপমান-অপদস্থ করাটা মোটেই উচিত হয়নি। মহলে বা কোঠায় কতদিনই তো গুলনাহার তাকে কুর্নিশ করেনি। তখন তো কিছু মনে করেননি। রিয়াং বিদ্রোহীটাই তার আত্মমর্যাদাবোধ অতিমাত্রায় জাগিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

রামহরি ঘোষ আরো অনেক আগেই গুলনাহারের ব্যাপারটা মহারাজকে জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহারাজের মেজাজ-মর্জি ভাল ঠেকেনি বলে জানাননি। পরে শোনা মাত্রই পেয়াদা পাঠিয়ে হামজা ও শীতাংশুদেবকে ডেকে বিস্তারিত শুনলেন মহারাজ।

কিন্তু কোথায় যেতে পারে গুলনাহার? হামজার দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন মহারাজ।

হাত দুটো জোড় করল হামজা। কোন জায়গার কথা বলবে সে? গুলনাহার একজন নটী, সাবেরি বাঈয়ের কোঠার মুজরোখাটা নটী থেকে পরে সে রাজনটী হয়েছে—গুলনাহার সম্পর্কে সে কেবল এটুকুই জানে। যদিও বহু দিন ধরে সে তাকে চেনে। জাহ্নবীদেবী জাজিনগরের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেওয়ার কিছু দিন পরই গুলনাহার সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় এসেছিল, সে-কথা মনে আছে তার। তখন সে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় তবলচি হিসেবে যোগ দিয়েছে। তবলা বাজানোটা তার কাছেই শিখেছিল গুলনাহার। বয়সে গুলনাহারের চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে। দক্ষিণে হিঙ্গুলির দিকে তার বাড়ি। একটা কাজের আশায় কৈশোরে উদয়াচলে এসেছিল। কবিরাজ নোয়াজ মল্লিকের সাগরেদ হয়ে বেশ কিছুদিন নানা হাট-বাজারে বনাজি ওষুধ বিক্রি করছে, কিন্তু কবিরাজি বিদ্যার কিছুই শিখতে পারল না। অবশ্য পেশাটার প্রতি আস্থা ছিল না তার। চলন-বলন আর ভাব-ভঙ্গিমায় খানিকটা মেয়েলিপনা ছিল তার মধ্যে। হয়ত এ কারণেই কোনো কাজ না পেয়ে নিতান্ত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য নোয়াজ মল্লিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মেয়েলিপনার ভাবটা কেটে গেছে।

নোয়াজ মল্লিকের মৃত্যুর পর জৈন্তয়ায় গিয়ে কিছুদিন এক যাত্রাদলে কাজ করেছে। প্রায় এক বছর পর উদয়াচলে ফিরে হাটে-বাজারে অষ্টধাতুর আংটি বেচার পেশা ধরল। একদিন অমরপুর থেকে রাজার সেপাইরা কুকি বিদ্রোহী ভেবে বন্দী করল তাকে। পরে তারা জানতে পারল, বিশালগড়ের আরেক আংটি বিক্রেতা গুপ্তচরদের কাছে তার বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করেছিল যে, কুকি বিদ্রোহী দলের নেতা শিবুতের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ আছে তার। সেপাইরা সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই আটক করে বসল হামজাকে।

প্রায় দেড় বছর পর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় কাজ নিল। হাটে-বাজারে ঢোল-তবলা বাজিয়ে গান গেয়ে দাওয়াই বেচত নোয়াজ মল্লিক। তার সঙ্গে থাকতে থাকতেই বাজনা-বাদনে সে পারদর্শী হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে। পাশপাশি জুড়ি-কাঁসি তো বটেই, খোয়াল গাঙের পারে বসে মাঝে মধ্যে আড়বাঁশিতেও সুর তুলতো। কোঠায় এসে তম্বুরাতেও হাত পাকিয়ে নিল। নামি-দামি ঢুলি ও তবলচিদেরও মাঝে মধ্যে তার কাছে হার মানতে হয়েছে। এক বিজয়ার রাতে নরসিংগড়ের মেলার মাঠে তার ঢোল বাজানোর কথা এখনো ভোলেনি উদয়াচলের মানুষ। সেদিন গুলনাহারের খেমটা নাচের সঙ্গে ঢোল বাজিয়েছিল সে। তার ঢোলের মনমাতানো মিষ্টি বোল মুগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছিল হাজারো মানুষের মন। তালে তালে শ্রোতা-দর্শকরা উদ্বাহু নৃত্যে মেতেছিল। সেদিন অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। কখনো চিৎ হয়ে, কখনো কাৎ হয়ে, কখনো-বা ঝুঁকে নেচে নেচে তালে তালে ঢোল বাজিয়ে হাজার হাজার দর্শকের অঙ্গে অঙ্গে উল্লসিত নাচন ধরিয়ে দিল। নাচ-গান বন্ধ করে চোখে বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে তার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল গুলনাহার। হামজার ঢোলের কাছে যেন তার নাচ তুচ্ছ। আসর শেষে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, হামজার ওপর খোদ দেবী সরস্বতী ভর করেছে।

গুলনাহারের সেই মুগ্ধতা আর কাটল না। সাবেরি বাঈয়ের কোঠার মুজরোখাটা নাচওয়ালি থেকে রাজনটী হওয়ার পর তাকে বলে হামজাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। সেই থেকে এতটা বছর গুলনাহারের সঙ্গে ছিল হামজা।

মেকগুইয়ারের অনুগত লোকজন বা রিয়াং বিদ্রোহীদের ব্যাপারে যে শঙ্কা জেগেছিল শীতাংশুদেবের মনে সে-কথা মহারাজকে জানাতে ইচ্ছে হলো তার। কী ভেবে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে হরিদশ্বের কথা তুলল। বলল, হরিদশ্বে যাওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয় মহারাজ। তারু সরকার যদি এখনো বেঁচে থাকেন তবে হয়ত তার কাছেই চলে গেছে গুলনাহার।

মহারাজ বললেন, তোমার কী মনে হয়, তারু সরকার কি বেঁচে আছে?

আজ্ঞে না মহারাজ, আমি ঠিক জানি না। বহুদিন নিখোঁজ ছিলেন, পরে ফিরে এসেছিলেন কিনা জানতে পারিনি। তবে জয়গুনপুরে একবার খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

জয়গুনপুর? ওখানে কে আছে তার?

সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় আসার আগে জয়গুনপুরের হইলদাটিলা গ্রামের এক লোকের কাছে কিছুদিন ছিল গুলনাহার। আমাকে বলেছিল একদিন।

কী নাম লোকটির?

লোকটার নাম আমি ভুলে গেছি মহারাজ।

কে জানে তার নাম?

BanglaBook.org

হামজা বলল, আজ্ঞে সাবেরি বাঈ জানে, মহারাজ। গুলনাহারের সবকিছুই সাবেরি বাঈয়ের জানা।

সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় পেয়াদা পাঠিয়ে সোবানালির বিস্তারিত ঠিকানা জোগাড় করে আনা হলো। সেদিনই দুই সেপাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জয়গুনপুর। মহারাজ নিজ হাতে একটি চিঠি লিখে দিলেন। সেপাইদের বলে দিলেন, গুলনাহার যদি আসতে রাজি না হয়, কোনো জোর-জবরদস্তি যাতে না করা হয়। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে সেপাইদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন তিনি।

গুলনাহার তো দূরের কথা, সোবানালির বাড়িরই সন্ধান পেল না সেপাইরা। দুদিন তারা জয়গুনপুরের গ্রামে গ্রামে সন্ধান করে শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। তারপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেল, গুলনাহারের ব্যাপারে মহারাজ আর কোনো কথা বললেন না। খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল হামজা। কোনো সঞ্চয়পাতি নেই তার। হাতে টাকাপয়সা যা ছিল তা দিয়ে এই ক'মাস চলেছে। গুলনাহার চলে যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরই দাসীটি অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গেছে। আরেকবার গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবে হামজা। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। মহারাজ ডেকে পাঠালে একটা কথা, নিজ থেকে দেখা করতে গিয়ে কী বলবে সে? তা ছাড়া শোনা যাচ্ছে আজকাল নাকি মহারাজ রাজকার্যে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছেন। দিনের পর দিন রাজসভায় আসেন না, বেশিরভাগ সময় কাটান বুড়ো-দেবতার মন্দিরে। কেউ কেউ বলছে তার মনে নাকি বৈরাগ্যভাব উদয় হয়েছে, ধর্মকর্মেই নাকি দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান। চন্তাই-দেওড়াইদের সঙ্গে প্রতিদিন হর-হরি-উমার পূজা করেন।

হলেও হতে পারে, ভাবে হামজা। নইলে অষ্টধাতু দিয়ে বৃন্দাবন চন্দ্রের মূর্তি বানানোর আয়োজন করেবেন কেন মহারাজ? সেরকম কিছু হলে তার মনে তো এখন নটী-বাইজিদের স্থান নেই। ধর্মকর্মে নিবিষ্ট মানুষের কাছে এসবের কি মূল্য থাকে? এখন হয়ত মহারাজের কাছে ঈশ্বর-সাধনাই মুখ্য। জীবনের আরাম-আয়েশ, নহবৎখানার আলোকোজ্জ্বল রাত, রঙিন সুরা বা নাচওয়ালির মোহময়ী চোখ, ক্ষীণ কটি, প্রমত্ত বুক—কোনো কিছুর প্রতিই বুঝি আর আগ্রহ নেই। কৃষ্ণমাণিক্যের চিতারোহণের পর যেসব ব্রাহ্মণ ঠাকুর নবদ্বীপে ফিরে গিয়েছিল, তাদের নাকি আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

অনেক দিন আগে গুলনাহারকে উদ্দেশ করে বলা মহারাজের একটি কথা মনে পড়ে হামজার। রাজ্যে সবে রেসিডেন্ট প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, সেদিন

BanglaBook.org

উজির-নাজিররাও এসেছিলেন জলসায়। নাচ-গান আর সুরায় এত বেশি ডুবে গেলেন, জাহ্নবী দেবীর ডাককেও অগ্রাহ্য করলেন মহারাজ। গুলনাহারের নাচে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, আহা গুলনাহার, আমার জলসাঘরে সত্যি তুমি বেমানান। ইন্দ্রের জলসাঘরে উর্বশী হিসেবেই তোমাকে মানাতো।

অথচ আজ কোথায় সেই উর্বশী আর কোথায় মহারাজ! সত্যি বড় অদ্ভুত মানুষের মন। যা কিছু আজ ভাল কাল তা-ই মন্দে পরিণত হয়। আজ যা কিছু মধুর, কাল তা তিক্ত মনে হয়। মন কারো শাসন মানে না। সুরা ও জলসা থেকে মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে জাহ্নবীদেবী কত চেষ্টাই না করেছেন। ব্যর্থ হয়ে একাকী কেঁদেছেন। অথচ আজ কিনা নিজ থেকেই সব ত্যাগ করলেন মহারাজ!

মানুষের কথা যদি সত্যি হয়, তবে উদয়াচলে হয়ত আর কোনো বাইজি-কোঠা রাখা হবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল হামজা। ঢোল বাজানো ছাড়া আর তো কোনো কাজ জানে না সে। কী উপায় হবে তার? সাবেরি বাঈ হয়ত ফিরে যাবে লক্ষ্ণৌ, বিরজা বাঈ বেনারসে। সে কোথায় যাবে? তাকে কি সঙ্গে নেবে কেউ? নিলেই বা কী, এতদূর সে যাবে কেন? কোথায় জাজিনগর আর কোথায় লক্ষ্ণৌ!

প্রায় দুই যুগ পর হরিদশে ফিরছে গুলনাহার। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেল বাবার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি। সেই দুর্ভিক্ষের বছরের কথা। তারু সরকার একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বলল, কাল ভোরে সে কোশানন্দীর উদ্দেশে যাত্রা করবে। সে খবর পেয়েছে তার গুরু লতিফ সরকারের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি রোগে পড়ে শয্যাশায়ী। এখন মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুর আগে একবার গিয়ে তার পদধূলি নিয়ে আসতে চায় তারু।

স্বামীর কথা ঠিক বিশ্বাস হলো না মনজুরির। আমনের মৌসুম চলে এসেছে প্রায়, কদিন পরই ধান পাকতে শুরু করবে, এই সময় গ্রামের বাইরে গেলে ফসলের কী গতি হবে? সুধাবতীর তীরে কানি দুই জমি বর্গাচাষ করে তারু সরকার। প্রতি খন্দে ওই জমি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মণ ধান পাওয়া যায়। তাতে ছয় মাসের খোরাকির চিন্তা থাকে না। কবিগানের আসর করে কয় পয়সা পাওয়া যায়? ওসব করে কি আর পাঁচজনের সংসার চলে? মাসে দু-একবার হয়ত ডাক পড়ে কোথাও, আবার কখনো দেড়-দুই মাসে একবার।

BanglaBook.org

পেশার চেয়ে কবিগানের নেশাটাই বড় তার কাছে। বাড়িভিটাটি ছাড়া আবাদি বলতে কিছু নেই। বাবার কালের কানি দেড়েক জমি ছিল, বছরে একবার ধান আর একবার পাট চাষ করা যেত। কয় বছর আগে বেচে দিয়েছে জমিটা। কী হবে জমি দিয়ে? দিন দিন যে হারে খাজনা বাড়ছে, তাতে জমি থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। ইচ্ছেমতো খাজনা বাড়াচ্ছে ইজারাদাররা। ফসল হোক বা না হোক, খাজনা পরিশোধ না করে উপায় নেই প্রজাদের।

খাজনা বেড়েছে ঠিকই, তবে খাজনা বাড়ার বিষয়টা তারু সরকারের একটা বাহানা মাত্র। মনজুরির বকাঝকা থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল। বউকে খুব সমীহ করে চলে সে, কখনো মন্দ-শক্ত কিছু বলে না। কেন বলবে? এতটা বছর তার ঘর করছে বেচারি, কী দিতে পেরেছে সে? না এক জোড়া সোনার কানফুল, না একটা রুপোর হাঁসুলি। সংসারের প্রতি তার যে উদাসীনতা, মনজুরি না থাকলে এতদিনে সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হতো তাকে। বাড়ি থেকে একবার বেরুলে দশ-পনেরো দিন আর খোঁজখবর থাকে না। তখন শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে কে? মনজুরি না থাকলে উচ্ছন্নে যেত তার সংসার।

কিন্তু ধান তোলার কী হবে? জানতে চাইল মনজুরি।

সেই চিন্তা মনজুরিকে করতে হবে না। যত উদাসীনই হোক, অন্তত এই দায়িত্ববোধ তারুর আছে। সব ব্যবস্থা করেই সে কোশানন্দী যাচ্ছে। সব দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে শীতাংশুকে। ধান কাটা থেকে শুরু করে মাড়াই দিয়ে গোলায় তোলা পর্যন্ত সব ভার তার ওপর। মজুরি হিসেবে তাকে দেওয়া হবে কয়েক মণ ধান।

মনজুরি আর কথা বাড়াল না। স্বামীর মতিগতি সে বোঝে। একবার যখন কোশানন্দী যাবে বলে স্থির করেছে, সহজে আর ঠেকানো যাবে না। বছরখানেক পর পরই সে গুরুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তবে ফসল না তুলে নয়। ধান মাড়িয়ে, বিছিয়ে, শুকিয়ে, গোলায় ভরে, খড় শুকিয়ে ঘাটায় গাদা উঠিয়ে শীতটা পুরোপুরি ঝেঁকে বসলে একদিন গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে নৌকায় চড়ে বসে।

বহু দূরের পথ কোশানন্দী। হাঁটাপথে সপ্তাহ-দশ দিন তো লাগেই, ঝড়-বাদল হলে বেশিও লেগে যায়। নৌকায় গেলেও তিন-চার দিনের কমে পৌঁছানো যায় না। সুধাবতী পার হয়ে মেঘনা। দুই-আড়াই দিন নদীর বুকে ভেসে থাকার পর পুবাষাড়া ঘাট, সেখান থেকে গরুর গাড়িতে আরো দুই প্রহরের পথ।

BanglaBook.org

বহু বছর রঙসোনাপুর ছিল লতিফ সরকার। জাঁদরেল কবিয়াল হিসেবে এই তল্লাটের সবাই এখনো এক নামে চেনে তাকে। বাপ-দাদার ভিটা কোশানন্দী হলেও যৌবনের শুরুতে রঙসোনাপুর এসে বিয়ে করে বসতি পত্তন করেছিল। বউটা ছিল বাঁজা। একটা সন্তানের জন্য কত চেষ্টা-তদবির করেছে, গলায়-কোমরে কত তাবিজ বেঁধেছে, জাহান কলন্দরের ফুঁ দেওয়া কত পানি যে গিলেছে তার শুমার নেই, তবু যে বাঁজা সেই বাঁজাই রয়ে গেল। বয়স ত্রিশ হতে না হতেই রক্তভাঙা রোগে পড়ে মরে গেল বেচারি।

আসরে কখনো লতিফ সরকার হেরেছে—রঙসোনাপুর বা আশপাশের পরগণায় এমন কোনো নজির নেই। চাপান হোক বা উতোর, তার মধুর ছন্দের গানের কাছে কোনো কবিয়ালই পাত্তা পেত না। অথচ বউয়ের মৃত্যুতে কিনা মনোবল হারিয়ে ফেললেন! কিছুতেই আর আগের সুনাম ধরে রাখতে পারলেন না, আসরে আসরে কেবলই হারতে শুরু করলেন। একদিকে তিনি হারছেন, অন্যদিকে গুরুর দোয়া নিয়ে আসরে আসরে জিতছে তারু সরকার। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীহীন এই রঙসোনাপুরে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে কয়েক বছর পর বাপ-দাদার ভিটায় পাড়ি জমালেন লতিফ সরকার।

গুরুর অন্ধভক্ত তারু সরকার। গুরু না থাকলে কি কখনো সে কবিয়াল হতে পারত? যে দোহার সে দোহারই থেকে যেতে হতো। কে পুছত তাকে! গুরুর সামনে দাঁড়ালে তার মাথার ভেতর শ্লোক ঘুরপাক খায়, নিজের কবিত্ব-শক্তির প্রতি আস্থা জন্মে। কী কারণে এমন হয়েছে গুরুর, তা কেউ না বুঝলেও সে তো বোঝে। ঈশ্বরের পরে যার প্রতি তার অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা, তিনি লতিফ সরকার। এত বছর ধরে কোশানন্দী আছেন, রঙসোনাপুরের মতো অত সুনাম সেখানে অর্জন করতে পারেননি সত্য, তাই বলে কবিগান কিন্তু ছেড়ে দেননি।

কথা ছিল মাসখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে তারু সরকার। যতবারই গেছে এর বেশি থাকেনি। কিন্তু সেবার কী যে হলো, পাঁচ মাস শেষ হয়ে ছয় মাসে ঠেকল, অথচ তার ফেরার নাম নেই। গোলার ধান ফুরিয়ে এসেছে, জমা টাকা নেই যে সংসার চালাবে মনজুরি। বসতভিটার খাজনার জন্য বারবার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে তহশিলদার। রায়ত বলছে, চাষাবাদ না করলে অন্যের কাছে বর্গা দিয়ে দেবে জমি। ছোট মেয়ে সুটির মুখে দেওয়ার জন্য কিছু সাবু আর একটু বার্লিও কিনতে পারছে না। ঘরে নুন আছে তো মরিচ নেই, পেঁয়াজ আছে তো রসুন নেই অবস্থা।

BanglaBook.org

কদিন পর উপায় না দেখে শীতাংশুদেবকে বলে কোশানন্দী পাঠিয়ে দিল মনজুরি। একবার খবর নিয়ে আসুক শীতাংশু। আজকাল নাকি মেঘনায় ঘন ঘন নৌকাডুবির ঘটনা ঘটছে। তেমন কিছু ঘটল কিনা সেই আশঙ্কাও কাজ করছে মনজুরির মনে।

প্রায় পনেরো দিন পর ফিরে এল শীতাংশুদেব। একা। তারু সরকারের কোনো হদিস পায়নি। মাসতিনেক আগে লতিফ সরকার মারা গেছেন। অনেক খোঁজ করেছে, কিন্তু গ্রামের কেউ তারু সরকারের খোঁজ দিতে পারেনি।

এই ঘটনার পরই ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে উদয়াচল চলে গেল শীতাংশুদেব। গুরুর সংসারকে বেগতিক অবস্থায় রেখে যেতে খারাপ লেগেছিল, কিন্তু কিছু করার ছিল না তার। এখানে পড়ে থেকে কী করবে? দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মাস অন্তর চাল-ডাল-নুন-মরিচের দাম পাই পাই করে বাড়ছে তো বাড়ছেই। চালের সের দেড় পয়সা থেকে বেড়ে এখন আড়াই পয়সায় উঠেছে। পুরো আষাঢ় গত হলো অথচ বৃষ্টি-বাদলের দেখা নেই। ঘরে ঘরে অর্ধাহারী-অনাহারীর সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। দুর্ভিক্ষের আভাস টের পাওয়া যাচ্ছে সব দিকে। ওদিকে ভয়াবহ ভূমিকম্পে জয়গুনপুরের রাজপ্রাসাদ এবং বড় বড় দালান-কোঠা ধসে পড়ার পর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য রাজ্যপাট জয়গুনপুর থেকে উদয়াচলে স্থানান্তর করছেন। নতুন নগরের পত্তন হচ্ছে উদয়াচলে। সেখানে গেলে হয়ত ছোটখাটো কোনো কাজে লেগে যেতে পারবে—এই আশায় বউকে নিয়ে শীতাংশুদেবের উদয়াচল যাত্রা।

সে চলে যাওয়ার পর দারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল মনজুরি। খরা কেবলই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। রোদের তাপে বাইরে তাকানো দায়। ঘাসের অভাবে মরছে গোয়ালের গরু, খোঁয়াড়ের ছাগল-ভেড়া। খুদ-কুঁড়োর অভাবে মরছে হাঁস-মুরগি। ভাগাড়ে ভাগাড়ে মৃত জানোয়ারের স্তূপ, গাছে গাছে শকুন আর শকুন। মরা পশুটার চামড়াটা ছুলে নেওয়ার মতো লোক নেই। অনাহারে মেদ-ভুঁড়ি কমতে কমতে হাড্ডিসার হচ্ছে মানুষ। এক ঠিলা পানির জন্য কয়েক ক্রোশ হাঁটতে হয়। সুধাবতীর ডান কিনার ধরে চিরচিরে নালাটি ছাড়া গ্রামের একটা কুয়া বা পুকুরে এক ফোঁটা জল নেই। বড় বড় দিঘির তলার মাটি ফেটে মরা অজগরের হাঁ হয়ে আছে। দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে। কোথায় যাবে, কোথায় যাচ্ছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সবারই এক কথা—গ্রামে আর থাকা যাবে না। যে দুর্যোগ শুরু হয়েছে, কাটবে না সহজে।

BanglaBook.org

মনজুরি কোথায় যাবে? তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে কোথায় যাওয়ার আছে তার? যাওয়ার একমাত্র জায়গা ছিল বাপের বাড়ি। বাপ তো মরেছে সেই কবে। খবর পেয়েছে কদিন আগে অনাহারে মা-টাও গেছে। ভাইবোনদের কে কোথায় আছে পাত্তা নেই।

অভাবের তাড়নায় চোখে অন্ধকার দেখল মনজুরি। বিয়ের সময় বাবা-মায়ের দেওয়া অল্প কিছু রুপার গয়না ছিল, গঞ্জের এক স্বর্ণবণিকের কাছে জলের দামে বেচে দিয়েছে। এই নিরন্নের কালে সোনা-রুপার কী মূল্য? পেটে ভাত নেই, সোনা-রুপা দিয়ে কী করবে মানুষ।

খরা হোক, আকাল হোক—স্বামী পাশে থাকলে না খেয়ে মরলেও তার আফসোস থাকত না। কিন্তু এ কোন বিপদে পড়ল সে! এক রাতে স্বপ্নে দেখল নদীতে ডুবে মারা যাচ্ছে গুলনাহার। সুধাবতীর ঘূর্ণিস্রোত ভাসিয়ে নিচ্ছে তাকে। মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে ডান হাতটা উঁচু করে মা মা বলে চিৎকার করছে মেয়েটা। ভোরো ঘুম থেকে উঠে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বিলাপ করেছে। ছোট দুই মেয়ের জন্মের পর বড় মেয়েটার প্রতি তার অযত্ন-অবহেলা বেড়েছে, কিন্তু তাদের চেয়ে সে গুলনাহারকেই বেশি ভালোবাসে। তার ভালো-মন্দ কিছু হলে সে বাঁচবে না। দুঃস্বপ্ন দেখে অজানা বিপদের আশঙ্কায় দু-চারদিন বাড়ির বাইরে যেতে দিল না গুলনাহারকে।

মেয়ের যখন কোনো বিপদ ঘটল না, তখন নতুন আশঙ্কা দেখা দিল মনজুরির মনে। নিশ্চয়ই মেয়ের বাবার কিছু একটা ঘটেছে। স্বপ্নে একজনের বিপদ ঘটতে দেখলে আরেকজনের ক্ষেত্রে ফলে। কে জানে কী বিপদে পড়েছে গুলনাহারের বাবা। চালের খুদ রেঁধে খায়, সেখান থেকে ফকিরকে এক বাটি দিয়ে দেয় মনজুরি। নামাজের চাটাই থেকে মাথা তোলে না, কেঁদে কেঁদে চাটাই ভেজায়—হে মাবুদ, তাকে তুমি হেফাজত করো। যেখানেই থাকুক, তাকে তুমি সহিসালামতে রাখো। আমার তিন মেয়েকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম, তুমি তাদের জীবন-মরণের মালিক।

কদিন পরের ঘটনা।

গভীর ঘুমে সারা গ্রাম অচেতন। মাঝরাতে হঠাৎ দমকা বাতাস বইতে শুরু করল। দখিনা বাতাসের ফোঁসফোঁসানিতে ঘরের চালে মড়মড় শব্দ উঠল। হাটে-মাঠে-গাছপালায় একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। হৈচৈ পড়ে গেল চারদিকে। খোদা বুঝি এতদিন পর ফিরে তাকালেন তার পাপী-তাপী বান্দাহদের দিকে! বাতাস বইছে যেহেতু, বৃষ্টি আসবেই। জলে-কাদায় ভরে উঠবে রাস্তা-ঘাট, ক্ষেতে আবার ফসলের চারা বুনতে পারবে আধিয়াররা।

BanglaBook.org

তিন দিন পরও আকাশের চেহারা বদলাল না। টানা তিন দিন ইলশেগুঁড়ি আর ঝড় লেগেই থাকল। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষেরা ছুটে গেল জাহান কলন্দরের খানকায়। এই মুসিবত থেকে তিনিই একমাত্র বাঁচাতে পারেন।

দীর্ঘ মোরাকাবায় বসলেন জাহান কলন্দর। খানকা থেকে বেরিয়ে সবাইকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন—বড় খারাপ আলামত। খোদা রাহমানুর রাহিম সন্দেহ নেই। কিন্তু সিদরাতুল মুনতাহার কাছে আরশে আজিমের নিচে একটা বাটখারা ঝুলছে। বাটখারার এক দিকে নেকি আরেক দিকে বদি জমা হয়। বদির পাল্লা ভারী হয়ে গেলে কাহ্হার রূপ ধারণ করেন মওলা। দুনিয়ায় গজব নাজিল করার জন্য গজবের ফেরেশতাদের হুকুম করেন।

তারপর? শত শত মানুষের উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।

তারপর আর কী? পাপে-তাপে ভরে গেছে গোটা দেশ। নাসারাদের আনাগোনায় দেশটা নাপাক হয়ে গেছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন গজবের হাজার হাজার ফেরেশতা ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে।

তাহলে উপায়?

জবাব দিলেন না জাহান কলন্দর। নাদান মানুষদের বেশি কিছু বলতে নারাজ তিনি। চুপচাপ খানকায় ঢুকে পড়লেন। ভেতর থেকে তার জিকিরের শব্দ ভেসে এল।

এক রাতে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। ভোর হতে না হতেই ভয়ঙ্কর রূপ নিল সুধাবতী। খরস্রোতা নদীর তর্জন-গর্জন ঘরে বসেও শোনা যেতে লাগল। সারা গ্রাম একেবারে নিশ্চুপ। আগে নদীতে এরকম বান ডাকলে কেউ ঘরে বসে থাকত না। নারী-পুরুষ ছেলে-বুড়োরা লাকড়ি ধরতে ভিড় জমাত নদীর তীরে। বড় বড় গাছ আর লাকড়ি ভেসে আসত উত্তাল স্রোতে। লম্বা বাঁশ দিয়ে, দড়ির মাথায় চারশিকা বড়শি বেঁধে লাকড়ি ধরত সবাই। অথচ এখন কারো কোনো তৎপরতা নেই, সারা গ্রাম একেবারে মড়ার মতো পড়ে আছে।

সারাদিন তুমুল বৃষ্টি হলো। বিকেল নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য থামল। তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। তীব্র বাতাসে ঘরের চালা উড়ে গেল, বড় বড় গাছ মাটিসহ উপড়ে পড়ল। সন্ধ্যার পরে গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল, সুধাবতীতে স্রোত নেই। স্রোত নেই! খুবই খারাপ আলামত! অনেকে নাকি নদীতে উল্টো স্রোতও বইতে দেখেছে। এটা তো আরো ভয়ংকর কথা! বাদলার দিনে নদীর উল্টো স্রোত মানে বড় বিপদের আলামত। বহু বছর

BanglaBook.org

আগে একবার উল্টো স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। মানুষ তো অবাক। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাজার হাজার মানুষ নদীর পাড়ে ভিড় করতে লাগল। মাজারে মাজারে শিরনি পড়ল, মন্দিরে মন্দিরে পূজা-অর্চনার ধুম পড়ে গেল।

কদিন পর সংবাদ এল, সুধারাম-বাখরগঞ্জের উপকূলে ভয়াল গর্কি হয়েছে। সাগরের জল অনেক উঁচু হয়ে ডাঙায় ঢুকে পড়ায় নদীর এই দশা হয়েছিল। বাপ-দাদারা এখনো বলে সেই কাহিনি।

রাতে শোনা গেল রঙসোনাপুরের দিকে নদীর পাড় ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বেনোজলে ভেসে যাচ্ছে ঘর-গৃহস্থালি। হরিদশ্বের পুবদিকে নদীর বাঁধে ফাটল ধরেছে। এভাবে চলতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁধ ভেঙে গ্রামটা তলিয়ে যাবে। হায় হায় রব উঠল দিকে দিকে। একে তো আকাল, তার ওপর এই গজব! কাহ্হার রূপ ধারণ করেছেন খোদা। রূপের ঝলকানিতে চোখে পথ দেখছে না তার নাদান বান্দারা।

রাতে ঝড়ের গতিবেগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হেঁশেলের চালাটি বিকেলেই উড়ে গেছে। বড়ঘরের বেড়ার বেশ কটি বান ছুটে গেছে। একেকবার চালটা মড়মড় শব্দ করে উঠছে। এই বুঝি উড়ে গেল! চিৎকার করে কাঁদে গুলনাহার। মনজুরি তিন শিশুকে বুকে চেপে রেখে দোয়া-দরুদ পড়ে—লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা...। গুনাহগারের গুনাহ মাফ করো মাবুদ। গজব তুলে নাও। গজবের নয়, রহমতের দরিয়ায় তুফান তোলো।

মাঝরাতের দিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশের বেড়া দুটিও উড়ে গেল। বাতাসের তীব্রতায় ঘরে টেকা দায় হয়ে পড়ল। তারপর চোখের সামনে মড়মড় শব্দে উড়ে গেল চালটাও। কোথায় গিয়ে পড়ল তার কোনো হদিস নেই। ঘরে দুটো জোঙরা ছিল। জোঙরা দুটি মাথায় দিয়ে জড়সড় হয়ে চকির ওপর বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল মনজুরি। এই ভয়াল ঝড় কি জোঙরা ঠেকাতে পারে! থালা-বাসন, সরা-পাতিল, কাঁথা-বালিশ সব ভিজে একাকার। একেকবার জোঙরা দুটিকেও উড়িয়ে নিতে চায় তীব্র বাতাস। টানটান হয়ে আসে মনজুরির দুই হাতের শিরা। জোঙরায়ও কাজ হচ্ছে না, মাথাটি বাঁচল শুধু, সারা শরীর ভিজে একাকার। অগত্যা তিন মেয়েকে নিয়ে চকির নিচে আশ্রয় নিল। ভাগ্যিস পুবের বেড়াটি তখনো পড়ি পড়ি করেও দাঁড়িয়ে ছিল, নইলে চকির নিচে বসেও বাঁচতে পারত না তুফানের কবল থেকে।

ভোরে ঝড় থেমে এল। নদীর বাঁধ ভাঙেনি, সারা গ্রাম তবু অথৈ সাগর। ড্যাব পড়েছে সুধাবতীতে। সাগরের নোনা জোয়ার এখন তার গর্ভে, খাল-

BanglaBook.org

বিলের পানি ধারণের শক্তি নেই তার। পাঁক-কাদার মধ্যে বসে বিলাপ করে মনজুরি। কিন্তু কে শোনে কার বিলাপ? সারা গ্রাম যেন গোরস্তান। কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। ঘরের নিচে চাপা পড়ে বহু মানুষ মারা পড়েছে। অনেকে চালার নিচে আঁটকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। বাঁচার আশায় গলাফাটিয়ে চিৎকার করছে, কিন্তু শোনার মতো লোক নেই। মরুক, তারাও মরে যাক। যারা মরেছে তারা তো মুক্তি পেয়েই গেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরার চেয়ে ঝড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে এই ভালো। মৃত্যুকষ্ট তাতে বরং লাঘব হয়েছে। না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক সহজ।

হেঁশেলের চালাটা কলার জোনা দিয়ে কোনোরকম মেরামত করে থাকার ব্যবস্থা করল মনজুরি, কিন্তু খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না। কাঁসা-পেতলের ঘটিবাটি যা ছিল সব আগেই বেচে দিয়েছে, কিছু বাকি নেই বেচার মতো। একেকবার ভেবেছে বসতভিটাটি বেচে দিয়ে বাবার দেশে চলে যাবে, কিন্তু কেনার মতো লোক পায়নি। গ্রামের কার এত সাধ্য এই অকালে জমি কিনবে? গঞ্জের মহাজনদের কাছে গেলে হয়ত একটা ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু কাউকে তো সে চেনে না। কার কাছে গিয়ে বাড়ি বেচার কথা বলবে? তার উপর স্বামীর ভিটা। বেচতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না।

কদিন পর শোনা গেল দক্ষিণে নাকি শত শত গ্রাম এখনো পানির নিচে। ওদিকে গিয়ে যেসব গাড়োয়ান ঝড়ে আটকা পড়েছিল তারা এখন ফিরতে শুরু করেছে। এক গাড়োয়ান খবর এনেছে ওদিকে নাকি অনেক বড় গর্কি হয়েছে। সুধারাম-গোপালপুর-বাবুপুর-শায়েস্তানগরে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। মেঘনায় শত শত নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। কোম্পানির কুঠি, বাংলো আর গুদামঘরগুলো ঝড়ের কবলে পড়ে একেবারে ছারখার। নদীর কূলে যে কটি জাহাজ ছিল সেগুলোও ডুবে গেছে। বিস্তর মানুষ এখনো নিখোঁজ। জুগিদিয়ার অর্ধেক এলাকা নাকি সাগরগর্ভে তলিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে ভুলুয়ার শত শত লবণখামার।

পুব গ্রামের ধীপতি দাস কদিন পর খবরটা নিয়ে এল। গঞ্জে মুদিখানা আছে তার। মোড়া এনে বসতে দিল মনজুরি। আকাল, ঝড়-তুফান, মরা লাশ—এসব বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপে পর কোঁচা থেকে পানের ডিবাটি বের করে এক খিলি পান মুখে দিয়ে আসল কথাটি পাড়ল ধীপতি। সকালে জয়গুনপুর থেকে একটা লোক এসেছে গঞ্জে। লোকটাকে দোকানে বসিয়ে সে মনজুরির কাছে এসেছে। গরিব মানুষ। বলছে, জমি-জিরাত নাকি আছে চলমতো, যদিও দেখে মনে হয় না।

BanglaBook.org

উৎকণ্ঠা নিয়ে ধিপতীর কথা শোনে মনজুরি। ভাবে, লোকটা বুঝি গুলনাহারের বাবার কোনো খোঁজ নিয়ে এল। জয়গুনপুর থেকে আসা লোকটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলে তারপর ধীপতি বলল যে, বিয়ের পর লোকটার ছেলে একটা হয়েছিল। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য তার, দুই বছরের ছেলেটা সুধাবতীতে ডুবে মরে গেল। সেই থেকে সে নিঃসন্তান।

মনজুরির আগ্রহ মিইয়ে এল। কার ছেলে নদীতে ডুবে মরেছে সেই কাহিনি শুনে তার কী লাভ? খানিকটা উন্মনা হয়ে উঠল সে। শেষের কটি কথা খুব দ্রুততার সঙ্গে বলল ধীপতি দাস। উন্মনা হয়ে উঠায়, না দ্রুততার কারণে কে জানে, কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারল না মনজুরি। তাই আবারও বলতে হলো ধীপতি দাসকে। বলল যে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, একটা কিছু হলেই চলবে লোকটার। সেজন্য অল্প কিছু দিতেও সে রাজি। মনজুরির চাইলে গুলনাহারকে নিশ্চিন্তে তার কাছে দত্তক দিতে পারে।

মনজুরির বুকের ভেতর শেল বিঁধল। গুলনাহারকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। ঝাঁটা দিয়ে পেটাতে ইচ্ছে করল ধীপতি দাসকে। বলে কী হারামজাদা! দাওয়ায় বসা ধীপতি দাসকে তার শত্রু বলে মনে হলেও মুখে কিছু বলতে পারল না। গ্রামের মান্যগণ্য লোক, মুখে যা আসে তা তো বলা যায় না। তা ছাড়া তারই-বা দোষ কী? সে তো আর নতুন কোনো খবর আনেনি। তার মনে হয়ত কোনো কুমতলব নেই, তারু সরকারকে ভালোবাসে বলেই হয়ত এই উপকারটা করতে চাচ্ছে। স্বজন-পরিজনের ধার ধারে না দুর্ভিক্ষ। দেশে দেশে ছেলেমেয়ে বেচাকেনা হচ্ছে। বাবা বিকোচ্ছে করছে তার ছেলেমেয়ে, মা বিকোচ্ছে তার সম্ভ্রম। শরীরবেচা মেয়েলোকের ঠাসাঠাসি শহর-বন্দরের বেশ্যাপাড়ায়। পানাম নগরের দিকে ছুটছে যুবতীরা।

বাড়ি কাঁপিয়ে বিলাপ শুরু করল মনজুরি। ধীপতি দাস যতই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে ততই তার কান্নার রোল বাড়ে। চাটাইয়ের ওপর উপুড় হয়ে কান্নারত ছোট মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল ধীপতি। তারু সরকারের কথা বলে আফসোস করতে লাগল—আহ বেচারা! গেল তো গেল একেবারে সবাইকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর কান্না থামল মনজুরির। হেঁচকির জন্য মুখে কথা সরে না তার। ধীপতি দাস ধীরে-সুস্থে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল—কী হবে এখানে পড়ে থেকে? না খেয়ে মরা ছাড়া তো আর কোনো গতি নেই। মেয়েটাকে বেচে দিয়ে বরং রঙসোনাপুর চলে যাক মনজুরি। বাড়িটা তার কাছে বন্ধক রাখলেও রাখতে পারে। রঙসোনাপুর গেলে যেভাবে হোক দু-মুঠো ভাত

BanglaBook.org

অন্তত পাবে। লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে সেখানে। দুই বেলা করে ডাল-খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতি আধা সের করে চালও পাচ্ছে কেউ কেউ।

মনজুরির চোখেমুখে ধপ করে আশার আলো জ্বলে উঠল। তাই যদি হয় তবে সে রঙসোনাপুরেই যাবে। লঙ্গরখানায় না হোক, জনপ্রতি আধা সের করে চাল পেলে চার জনের জন্য দুই সের তো অন্তত পাওয়া যাবে অন্তত। তাতেই চলে যাবে তার। কিন্তু ধীপতি দাস বলল, শিশুদের গোনায় ধরা হয় না। দশ বছরের নিচে হলে রিলিপ পায় না কেউ।

আর পারল না মনজুরি। বুঝতে পারল, কোনো পথই যে খোলা নেই তার সামনে। ঠিকই বলেছে ধীপতি দাস, কী হবে মেয়েকে আঁকড়ে রেখে? বিয়ে দিলে তো মেয়েকে পরের ঘরে যেতেই হবে। তারচেয়ে বরং এখনই যাক। বিয়ে তো আর দিচ্ছে না, দত্তক দিচ্ছে। ভালো-মন্দ খেতে পারবে মেয়েটা। বড় হয়ে মা-বাবাকে অন্তত দেখতে হলেও তো আসবে। তবু আজকের রাতটা ভাবতে চায় মনজুরি, লোকটাকে নিয়ে বরং কাল সকালেই আসুক ধীপতি দাস। হ্যাঁ-না একটা তখন বলবে সে।

পরদিন সূর্য ওঠার পরপরই লোকটাকে নিয়ে হাজির হলো ধীপতি দাস। নিজের বিস্তারিত পরিচয় দেয় লোকটা। জয়গুনপুরে এক নামে চেনে তাকে। যখনই ইচ্ছে মনজুরি গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতে পারবে। হইলদাটিলায় সোবান গোয়ালার বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। ঠিকানা সম্বলিত একটা কাগজের সঙ্গে পাঁচটা টাকাও দিল মনজুরির হাতে। আপাতত এই কয় টাকা রাখতে বলল। সুযোগ বুঝে আবার এসে আরো কিছু টাকা দিয়ে যাবে। মেনে নিল মনজুরি। সময় তো এখন ভালো নয়, পাঁচ টাকাই বা কম কী?

তারপর প্রায় দুই যুগ কেটে গেল নিমেষে। হাঁটতে হাঁটতে আঙুলের কড়া গুনে হিসাব করে গুলনাহার। হ্যাঁ, দুই যুগেরও বেশি হবে। এক কুড়ি পাঁচ। এত বছর পর গ্রামের পথঘাট কিছুই চিনতে পারে না সে। সুধাবতী যেন আগের জায়গা থেকে খানিকটা উত্তরে সরে এসেছে। বেশ বড়সড় একটা চর পড়েছে ওপারে। ধুধু বালির চর। এই ভরদুপুরেও ওই ঘাটে জনমানুষের কমতি নেই। সারি সারি ডিঙি আর কোশা। কোনোটা যাচ্ছে ভাটির দিকে, কোনোটা উজানে। কোনোটা কাঁঠালভর্তি, কোনোটা আনারস। বড় বড় চটের বস্তাভর্তি ডিঙিও দেখা যায়। বস্তাগুলোতে হয়ত ধান-চাল-গম বা আটা হবে।

BanglaBook.org

নদীর বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরল গুলনাহার। ক্রোশখানেকের মতো ধানক্ষেত, তারপরেই ঘরবাড়ি শুরু। রাস্তাটা আগে এত চওড়া আর উঁচু ছিল না। ঠিক রাস্তা নয়, জমিনের একটা চ্যাপ্টা আল ধরে চলাচল করত গ্রামবাসী। বর্ষায় কোশা ছাড়া উপায় থাকত না। আশ্বিন-কার্তিক মাসেও ভাঙা আলের স্থানে স্থানে পানি জমে থাকত। পাঁক-কাদা মাড়িয়ে নদীর বাঁধ, তারপর মনাধন মাঝির নৌকায় চড়ে গঞ্জের ঘাটে যেতে হতো।

মনাধন মাঝি কি এখনো বেঁচে? মনে পড়তেই পেছনে ফিরে তাকাল গুলনাহার। কোনো নৌকা তো বাঁধা নেই ঘাটে। কে জানে, ওপারে গেছে হয়ত। সারি সারি নৌকার মধ্যে তার নৌকাটিও আছে নিশ্চয়ই। ফিরতি খেপ নিয়ে খানিক পরই এ ঘাটে আসবে হয়ত।

কাঠফাটা রোদে মাথার মগজ বলকিয়ে ওঠার জোগাড়। আঁচলটা টেনে মাথার ওপর দিল গুলনাহার। এই কয় মাসেই কেমন পুরনো হয়ে গেছে শাড়িটা। মন্দিরে উঠার পরদিনই এক শিষ্যকে জয়গুনপুর পাঠিয়ে কিনে আনিয়েছিলেন অজয় পণ্ডিত। মানুষটার ঋণ শোধ করতে পারবে না গুলনাহার। দুটি মাস থাকতে দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, আসার সময় জোর করে আড়াই টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছে। গুলনাহার আপত্তি করেছিল প্রথমে, কিন্তু পণ্ডিতের চোখের দিকে তাকিয়ে না নিয়ে পারেনি। শাদা ভ্রুর নিচে চোখ দুটিতে কেমন মায়া। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল গুলনাহার।

ঠিক কোথাও স্থির হতে চায় না গুলনাহারের চোখ। দুই যুগের ব্যবধানে গ্রামের কী কী আছে, কী কী নেই, তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চোখ। ওইদিকে একটা জলাশয় ছিল। লোকে বলত ভাঙনা। কোন কালে একবার সুধাবতীর ভাঙনে ভাঙনাটির সৃষ্টি হয়েছিল। সারা বছর জলে ভরপুর থাকত। নদীর ভাঙনও কত সুন্দর! ধানি জমির তলার মাটি সরিয়ে ভাঙনা দিল নদী, ভাঙনাতে রতনি-শাপলার মুড়া দিল, শালুক দিল, আর দিল পানিফল, পানাফুল। ভাঙনাটি ভরাট হয়ে গেছে এখন, আছে শুধু ছোট্ট একটা খাঁড়ি। জাঁক দেওয়া। প্রচণ্ড গরমে জমিনের জল তেঁতে উঠলে পুঁটি-বাইম-শিং-কৈ-টেংরা আর মাগুর মাছেরা খাঁড়ির শীতল জলে আশ্রয় নেবে। তারপর একদিন টুপ করে জানের মুখে জাল ফেলে কাদার বাঁধ দিয়ে সেঁচা।

কিন্তু পশ্চিমের বাজপড়া তালগাছটি কই? সেই জন্মের পর থেকে দেখেছে মাথাভাঙা গাছটাকে। লোকে বলত, জোনপহরের রাতে ওই গাছটার নিচে সাপেদের মিলন হয়। দু-চার দিন গাছটার ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষত না। গাছের বদলে এখন সেখানে একটা ঢিবি। আশেপাশে অনেক বাড়িঘর

BanglaBook.org

উঠেছে। গুলনাহার ভাবে, এখনো কি আষাঢ়ে জোনপহরের রাতে সাপেরা আসে সেখানে?

জন্মভিটার দিকে জোর কদমে হাঁটতে থাকে গুলনাহার। গ্রামের একেকটা দৃশ্য শৈশবের একেকটা স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। দূর থেকে তাদের বাড়ির পেছনের বিশাল শিলকড়ই গাছটা দেখে হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। এত বছর কি কোনো গাছ বেঁচে থাকে! ঠিক আগের মতোই সারা বাড়ি ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়ে। গাছের ফাঁকে ভাঙা ঝুপড়িটাও বুঝি দেখা যায়? কপালে তালু ঠেকিয়ে ঠাওর করার চেষ্টা করে সে। না, ঘরদোর কিছুই চোখে পড়ছে না, বড় বড় দুটি খড়ের গাদা দেখা যাচ্ছে শুধু। সে ভাবে, বাবা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছিল। বিদেশ থেকে টাকা-পয়সা রোজগার করে এনে জমিজমা কিনেছে নিশ্চয়ই। নইলে এত বড় বড় গাদা আসবে কোত্থেকে? বাবা এখন নিশ্চয়ই বাড়ি আছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কোথাও আসর থাকে না। কে জানে এই বয়সে আসরে যেতে পারে কিনা। এতদিনে বুঝি মায়ের চুলেও পাক ধরেছে। মনে হয় না। শীতুকাকাই তো একদিন বলেছিল, অল্প বয়সেই নাকি বিয়ে হয়েছিল মায়ের, বয়স তখন বার কি তেরো। গুলনাহারের জন্মের অন্তত পাঁচ বছর পর যখন তার দুই যমজ বোন জন্ম নিল, তখনও তার মা বিশ পার করেনি। সেই হিসাবে মায়ের বয়স এখন বড়জোর পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সে কি আর মেয়েলোকের চুল পাকে?

মায়ের কথা মনে পড়ায় মনটা বিষিয়ে উঠল। যে মা নাড়িছেঁড়া ধন বেচে দিতে পারে, সে কেমন মা? মুখ থেকে শব্দ করে থুথু ফেলল গুলনাহার। মায়ের কথা মন থেকে মুছে ফেলে ছোট বোন দুটির কথা ভাবে। এতদিনে তাদের চেহারাও ভুলে গেছে। শুধু মনে আছে, তারা ঠিক মায়ের মতো হয়েছিল। একজনের গায়ের রং বাবার মতো শ্যামলা, আরেকজনের মায়ের মতো ফর্সা। তার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাবা দুই বোনের নাম রেখেছিল। নাম দুটি এখন আর মনে করতে পারে না। নামের ব্যাপারে খুব আপত্তি করেছিল মা। তিন মেয়ের নামের শেষে নাহার, এটা কেমন কথা! মায়ের বেজার মুখ দেখে বাবা হাসত। দুই মেয়েকে দুই কোলে আর গুলনাহারকে পিঠে নিয়ে ছড়া কাটত

চড়ুই পাখি বারোটা<br>ডিম পেড়েছে তেরোটা<br>একটা ডিম নষ্ট<br>চড়ুই পাখির মনে বড় কষ্ট।

BanglaBook.org

কী আশ্চর্য! কত কিছু ভুলে গেছে গুলনাহার, অথচ ছড়াটি কিনা ভুলল না! চোখের পাতা ভিজে এল তার। পাপড়িতে বিন্দু বিন্দু মুক্তোদানা জমা হলো। হাঁটতে হাঁটতে মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল—চড়ুই পাখি বারোটা...একটা ডিম নষ্ট...।

দুই বোনকে একসঙ্গে কোলে নেওয়ার কত চেষ্টা করত সে, পারত না। মা যখন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকত, দুই বোনকে দু-হাতের ওপর রেখে বাবার মতো ছড়া কেটে কেটে সে ঘুম পাড়াত।

কেমন আছে তারা এখন? খররৌদ্রতাপে দগ্ধ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকেই প্রশ্ন করে গুলনাহার। দুই বোনের চেহারা কল্পনার আয়নায় দেখার চেষ্টা করে। কোথায় বিয়ে হয়েছে তাদের? ছেলেমেয়ে কজন? তারা দেখতে কেমন হয়েছে? যদি দেখা হয় এতদিন পর তারা তাকে চিনতে পারবে তো? নাহ্, উদয়াচলের কথা কিছুতেই বলা যাবে না। কাউকেই না। বলবে, মেলাগড়ে বিয়ে হয়েছিল তার। দেখতে কালো ছিল স্বামীটা, তবে তার মনটা ছিল অনেক বড়।

ছিল মানে কী? চোখেমুখে বিস্ময় জাগিয়ে প্রশ্ন করবে দুই বোন।

সে বলবে, বেঁচে আছে না মরে গেছে সেই খবর তো পাইনি। পান-তামুকের কারবার ছিল হাটে। মাস না ফিরতেই নতুন নতুন শাড়ি কিনে আনতো। গয়নাগাটিও কম দিত না। এই যে গলায় রুপার হাঁসুলিটা, এটাও তার দেওয়া। বাসর রাতে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। দু-দুটো সোনার হার দিয়েছে, নথ দিয়েছে, দুই জোড়া মল বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি তো জনম-দুঃখিনী, আমার কপালে কি আর সুখ সয়? দুই বছরের মাথায় বাপজানের মতো নিরুদ্দেশে চলে গেল মানুষটা। দিন যায় মাস যায়, বছর যায়, অথচ ফেরার নাম নেই। সোবান খালু কত খুঁজল, কোনো হদিস পেল না। মানুষটার পথ চেয়ে এতটা বছর কাটিয়ে দিলাম। কয় মাস আগে সোবান খালুও মরে গেল। এই দুঃখিনীকে দেখার মতো পৃথিবীতে কেউ আর থাকল না। দিশা না পেয়ে চলে এলাম তোদের কাছে।

গল্পটা বেশ ভালোই বানানো গেল। ভেবে স্বস্তি পায় গুলনাহার। কয় বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, গায়েহলুদের রাতে হাতে কারা মেহেদি লাগিয়েছিল, সোবানালি বিয়ের দিন কয়টা লোক দাওয়াত করে খাইয়েছিল, কজন ছিল বরযাত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন ছিল—এমন নানা প্রশ্নের উত্তরগুলো মনে সাজাতে সাজাতে হাঁটে গুলনাহার। খানিকটা পথ বাকি, কিন্তু তর সইছে না তার। ওই যে হীরুমণিদের মেটে-গুদামটা দেখা যাচ্ছে। সলেমানদের চালে

BanglaBook.org

কাঁসা কি পেতলের থালা খাড়ারোদে ঝিলক মারছে। ডানা থাকলে সে উড়াল দিত।

সহসা বিপরীত ভাবনা এসে জড়ো হলো তার মনে। পরিবারের সবাই যদি বেঁচেই আছে, তবে কেউ একবারও কেন খোঁজ নিল না তার? পাঁচটি বছর তো সে সোবানালির বাড়িতেই ছিল। এই কয় বছরের মধ্যে যদি বাবা ফিরে আসত, নিশ্চয়ই জয়গুনপুর চলে যেত। তার প্রাণের ধন গুলনাহারকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতো। সোবানালি দিতে না চাইলে জোর করত। দরকার হলে সালিশ-দরবার বসাতো।

না, হয়ত ঠিক পাঁচ বছর পরই বাবা বাড়ি ফিরেছিল। ফিরে হয়ত জয়গুনপুরও গিয়েছিল। ততদিনে তো তাকে সাবেরি বাঈয়ের কাছে বেচে দিয়েছে বুড়ো সোবানালি। তার কাছে বাইজি-কোঠার কথা শুনে বাবা হয়ত রাগে-দুঃখে বাড়ি চলে এসেছে। বেপথে যাওয়া মেয়েকে আর গ্রামে ফিরিয়ে আনতে চায়নি।

রাগে-অভিমানে গুলনাহারের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠতে লাগল। পথের মাঝখানে ঠাঠা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। না, ওই বাড়িতে ফিরে আর যাবে না সে। এমন নিষ্ঠুর বাবা-মায়ের মুখ কিছুতেই দেখবে না।

তাহলে কোথায় যাবে গুলনাহার?

নিজের ভেতর থেকে প্রশ্নটা উঠে এল। যাওয়ার জায়গা কি এই পৃথিবীতে আছে কোথাও? ছোটকালে মা বিক্রি করে দিল, কিশোরকালে বিক্রি করে দিল দত্তক-পিতা, যৌবনকালে বিক্রি করে সাবেরি বাঈ। হাত বদল হতে হতে তোমার জীবনটা তো মলিন হয়ে পড়েছে। শরীরে যৌবন আছে বটে, কিন্তু তা তো অতি ব্যবহারে জীর্ণ। আবার কার কাছে বিক্রি করবে এই শরীর?

মনের সঙ্গে খানিকক্ষণ সে বোঝাপড়া করল। হেরে গেল মনের কাছে। সোজা পথ ধরে হাঁটা ধরল আবার। তাড়িয়ে দিলে দিক, তবু একবার সে সবার মুখ দেখে আসবে। ঠাঁই না পেলে ভরা গাঙ তো কাছেই আছে। ঘোলা জল তাকে টেনে নেবে অকূল সাগরে। অথবা লাশটা চাপা পড়বে বালির নিচে।

বাড়ির ঘাটায় এসে সমস্ত ভাবনা ওলট-পালট হয়ে গেল তার। এ কী হাল হয়েছে বাড়িটার! কুয়াটার পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এই পাড় দিয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তা ছিল। ভাঙতে ভাঙতে সরু হয়ে গেছে রাস্তাটা। ভিটায় ঘরদোর কিছু নেই, উঁচু ভিটাটায় সিসিঙ্গা আর বেগুনের ক্ষেত। কুয়ার কোনায় বেতের মুড়াটি আরো ঘন হয়ে উঠেছে। একটা মোটা বেতে লাল একটা ধোড়া

BanglaBook.org

সাপ বসে আছে। দক্ষিণ ভিটায় গলাউঁচু শনবিল। বহু বছরের অযত্ন-অবহেলা ফুটে আছে সেখানে। প্রতি বছর ঘরের চাল মেরামত করতে বাইরে থেকে শন কেনার দরকার হতো না, ভিটার শনে কাবার হয়ে বরং আরো বাঁচত। জামগাছের জাম পেকে তলায় ঝরে কালোকিষ্টি হয়ে আছে মাটি। কাকের ঠোকরে ঝরে ঝরে পড়ছে পাকা কাঁঠালের কোয়া। উঁচু ভিটার পাশ দিয়ে একটা সরু পথ খড়ের গাদা দুটির দিকে চলে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় এই পথে মানুষের চলাচল নেই। দুই ধারের আগাছাগুলো হাঁটু-সমান উঁচু হয়ে আছে।

কোথাও কেউ নেই, খড়ের গাদাগুলো তবে কার? পরিত্যক্ত বাড়িটা কি কেউ দখল করল? আশপাশের বাড়িগুলোতে সুনসান নীরবতা। ওহাব মৌলবির বাড়ির চারদিকে বেড়ার ঘের। এত উঁচু ঘের, বাইরে থেকে ভেতরের ঘরদোর দেখা যাচ্ছে না। গ্রামবাসী খেয়েদেয়ে ভাতঘুম দিয়েছে বুঝি। পুবের পুকুরঘাটে এক বুড়োকে ধুতি কাঁচতে দেখতে পায়। এত দূর থেকে লোকটাকে ঠিক চিনতে পারছে না। দাসবাড়ির কেউ হবে হয়ত। শৈশবের খেলার সঙ্গী-সাথীদের নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হয় তার। ও হীরুমণি, ও সলেমান, ও মরিয়ম, ও সখিনা! তোরা কি কেউ ঘরে নেই? আকাল বুঝি খেল সবাইকে। তাকে বিক্রি করে দিয়ে কোন দেশে চলে গেল মা? নাকি আকাল তাকেও খেল? বাবা বুঝি আর ফেরেনি?

খুব কান্না পায় গুলনাহারের। মরা আমগাছটার গুঁড়িতে বসে নীরবে কাঁদতে লাগল সে। সুধাবতীর বান নামল চোখে। কারো নাম ধরে ডাকতে গেলে কান্নাটা আরো বাড়বে। কে কাকে চিনবে এতকাল পর? বসে বসে বরং কাঁদুক। বুকটা খুব ভারী হয়ে আছে বহু দিন ধরে। কেঁদে কিছুটা হালকা করে নিক।

হরিদশ্বে যেভাবে গেল ঠিক সেভাবেই ফিরে এল গুলনাহার। একা। কেউ জানল না, কেউ দেখল না। ভালোই হয়েছে তাতে। না চিনুক, ভিটায় অচেনা মানুষ দেখলে নানা কথা জিজ্ঞেস করত লোকে। কাকে কী জবাব দিত তখন? একে তো সে নারী, তার উপর আবার যুবতী। মৌমাছির মতো ঘিরে ধরত লোকজন।

গঞ্জের ঘাটে এসে চটের থলেটা থেকে চিঠি দুটি বের করে জালাল মির্জার দোকানের ঠিকানাটা ভালো করে পড়ে নিল। রত্নমন্দিরে যেতে কেন যেন মন

BanglaBook.org

সায় দিচ্ছে না। শিবরঞ্জন ঠাকুর যদি তাকে আশ্রয় না দেয়? এই মুসলমানি নাম শুনলে হয়ত কাছেই ঘেঁষতে দেবে না। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর বলে কথা! বুড়ো-দেবতার মন্দিরের চন্তাই-দেউড়াইরা তো মুসলমানদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাও বলতে চায় না। দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। টুপি মাথায় দাড়িওয়ালা অচ্ছুত যবনদের মুখ দেখাই যেন মহাপাপ। শিবরঞ্জন ঠাকুর তাদের মতো নয় তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়ত মুখের ওপরই বলে দেবে, না বাপু, অজয় পণ্ডিত নামের কাউকে আমি চিনি না, জীবনে কোনোদিন নামই শুনিনি।

অবশ্য আরেকটা নাম আছে তার—গঙ্গাদাসী। অজয় পণ্ডিত রেখেছিলেন নামটা। ছেলেমেয়েদের নাম বদলে নতুন নাম রাখতেন পণ্ডিত। শিষ্যদের কারো নাম যদি নুকলা হয়, তিনি বদলে রাখলেন নকুলচন্দ্র রায়। কারো নাম শাইন্তা, তিনি রাখলেন শান্তনু ঘোষ। অবশ্য তাদের বাবা-মায়ের দেওয়া ভালো নাম একটা আছে, কিন্তু সেই নামে তো কেউ তাদের ডাকে না। স্বয়ং নামধারীই আসল নামে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়, অন্যের দোষ কী।

সুন্দর সুন্দর নামের পাশাপাশি অদ্ভুত সব নামও ছিল শিষ্যদের। একজনের নাম ছিল পেঁচা। টোলের ছাত্ররা তাকে এই নামে ডাকতে শুনে গুলনাহার অবাক হয়েছিল। কারো নাম কি পেঁচা হতে পারে? পরে জানা গেল আসল কথা। ছেলেটা মুসলমান। ঠিকমতো আসে না টোলে। দুদিন এলে চার দিন লাপাত্তা। মাঝে মধ্যে সপ্তাহ-দশ দিনও ডুব মেরে থাকে। একবার মাসখানেক কামাই দিয়ে টোলে আসার পর অজয় পণ্ডিত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, খবর কী তোমার পেঁচা বাবাজি? আর ঠেকায় কে! সেই থেকে সবাই তাকে পেঁচা নামে ডাকা শুরু করল।

আরেকজনের নাম ছিল চিতা। সবার সঙ্গে মারামারি করত বলে একদিন তাকে চিতাবাঘের সঙ্গে তুলনা করে বকাঝকা করেছিলেন পণ্ডিত। সেই থেকে সবাই তাকে চিতা নামে ডাকতে শুরু করল।

অবশ্য পণ্ডিতের সামনে ভুলেও কেউ কাউকে এসব বিকৃত নামে ডাকত না, ঠাট্টা-তামাশা সব তার আড়ালেই চলত। তাই বলে তার কানে যে যেত না তা নয়। শুনতে পেলে তিনি বকাঝকা করতেন। কিন্তু ততদিনে তো তাদের আসল নাম ডুবে গিয়ে পণ্ডিতের দেওয়া নামটাই প্রচার হয়ে গেছে। অবশ্য গুলনাহারের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। যবানী নামটা গোপন না রাখলে তো কিছুতেই ঠাঁই পেত না মন্দিরে।

গঙ্গাদাসী বলে পরিচয় দিলে শিবরঞ্জন ঠাকুর হয়ত ব্যবস্থা একটা করবেন, কিন্তু এখান থেকে তো কম দূর নয় রত্নমন্দির। সাত-আট ক্রোশের

BanglaBook.org

পথ। এত দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার মতো শক্তি নেই শরীরে। তার চেয়ে বরং জালাল মির্জার সন্ধান করুক। শত হলেও তিনি মুসলমান। নাই-বা দিলেন ঠাঁই, চিঠিটা তো অন্তত পড়ে দেখবেন।

গঞ্জের একেবারে উত্তরে তরিতরকারি হাঁটের সরু গলিতে জালাল মির্জার মুদিখানাটা খুঁজে পাওয়া গেল। দোকানে জালাল মির্জার বয়সী কাউকে দেখতে পেল না। গদিতে বসা তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সী এক কিশোর। রাস্তার উল্টোদিকে একটা কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে গুলনাহার, এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু জালাল মির্জার বয়সী কাউকে দেখতে পায় না।

রাস্তা পেরিয়ে সে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টগবগ আওয়াজ তুলে একটা টমটম ছুটে গেল। দুই সেপাই বসা। কোম্পানির লোক হয়ত। কত ধরনের লোক দেখা যায় রাস্তায়! কেউ ধুতি পরা, কেউ প্যান্ট পরা, কেউ লুঙ্গি পরা। দুই যুগ আগের কমলাঙ্ক আর আজকের কমলাঙ্কের মধ্যে কত যে ফারাক! উদয়াচলের মতো এখানেও বুঝি নগরের পত্তন হচ্ছে। আশপাশে নতুন নতুন কত যে টিনের ঘর উঠেছে! লোকে বলে অফিস। এই যেমন কালেক্টরের অফিস, দেওয়ানি জজের বিচারখানা, কোম্পানি নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অফিস ছাড়াও আরো কত কি অফিস। এত অফিসের নাম জানে না গুলনাহার। নৌকায় বেপারিটা বলেছিল, সমগ্র জাজিনগরকে নাকি এখন জেলা ঘোষণা করেছে কোম্পানি সরকার। নতুন জেলার নাম দিয়েছে ভুলুয়া। কমলাঙ্কে সেই জেলার হেডঅফিস।

বেপারির কাছে গুলনাহার জানতে চেয়েছিল, জেলা অর্থ কী চাচা?

বেপারি বলেছিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। বাংলায় বলে জেলা। বৃটিশদের বুদ্ধি, সহজে বোঝা যায় না।

দোকানের সামনে বাঁশের মাচাটায় বসল গুলনাহার। বেলা পড়ে এসেছে তখন, তবু সূর্যের তেজ কমেনি। অস্তে যাওয়ার আগে আগুনের হলকা ছুঁড়ছে। একটা ঝিমমারা ভাব চারপাশে, আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠতে আরো কিছুক্ষণ সময় নেবে। গরমকালের দুপুর যেন শেষই হতে চায় না। গদির চকির ওপর তেলচিটে শীতল-পাটিটার এখানে-ওখানে টুটাফাটা। পিঠের নিচে ছোট একটা বালিশ রেখে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে ছেলেটা। গুলনাহারকে দেখে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে আবার ঝিমুতে লাগল।

গুলনাহার জানতে চাইল, আচ্ছা, জালাল মির্জার দোকান এটা?

হুঁ। চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিল ছেলেটা।

BanglaBook.org

তিনি দোকানে নাই?

থাকলে তো দেখতেন।

তিনি কোথায় গেছেন? আসবেন কখন?

বালিশটা মাথার দিকে টেনে আনতে আনতে ছেলেটা বলল, বাড়ি গেছে, সন্ধ্যার আগে আসবে না।

গায়ে হাতপাখার বাতাস করতে লাগল ছেলেটা। খানিক পর হেলান দেওয়া অবস্থায় ভুরুজোড়া কপালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী দরকার বলেন তো?

এমনি। আচ্ছা, তোমার নাম কী?

এয়াছিন। প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই চটজল্দি জবাব দিল ছেলেটা, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গুলনাহার, ছেলেটির মুখ ফেরানো দেখে চুপসে গেল। খানিকটা রাগও উঠল তার। এটুকু ছেলে, ভাব দেখে মনে হয় যেন নবাবের বেটা।

খানিক পর সেই আগের মতো ভাব নিয়ে এয়াছিন জানতে চাইল, মামু কী লাগে আপনার?

প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে গুলনাহার বলল, দোকানে কি জল আছে? খুব তৃষ্ণা লেগেছে।

খানিকটা বুঝি বিরক্ত হলো এয়াছিন। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে শরীরটা এলিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিতে, মড়ার খদ্দেরের জন্য পারছে না। সব খুচরা খদ্দের। এক পয়সার মুড়ি দাও, দেড় পয়সার চিড়া দাও, দুই পয়সার নুন দাও—এরকম প্যানপ্যানানি লেগেই ছিল দুপুর থেকে। কিছুক্ষণ আগে খালি হলো দোকানটা, এখন এসে জুটেছে আরেক আপদ! তাচ্ছিল্যভরা চোখে গুলনাহারের দিকে তাকাল এয়াছিন, তারপর চকির নিচে রাখা ঘটি থেকে নারকেলের খোরায় একটুখানি পানি বাড়িয়ে ধরল।

পানিটুকু খেয়ে খোরাটা চকির কোনায় রেখে গুলনাহার বলল, বাড়ি কি এইখানেই?

কার, জালাল মামার বাড়ি?

না, তোমার বাড়ির কথা জানতে চাইছি। ঠোঁটে মুচকি হাসি টেনে বলল গুলনাহার।

এবার সোজা হয়ে বসল এয়াছিন। ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেছে। গুলনাহারের প্রশ্নটা বুঝি পছন্দ হলো তার। নিজের গ্রাম ও গ্রামের বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে শুরু করল—এই ধরুন এখান থেকে গরুর গাড়িতে

BanglaBook.org

করে সোয়াদুনি বাজার। ভোরে রওনা দিলে দুপুর হয়ে যাবে। তারপর গাড়ি বদল করে ননারহাট। সেখান থেকে হাঁটাপথে পুবতরাইয়া। এখন ঝড়-বাদলের দিন, রাস্তাঘাট খুব খারাপ। কোনো কোনো জায়গা পানিতে ডুবে আছে বলে গরুর গাড়ি যেতে চায় না। আর কদিন পর জলার পানি বাড়লে নৌকা চলাচল শুরু হবে। নৌকায় করে পুবতরাইয়া এক প্রহরের পথ। সেখানে আমার নানার বাড়ি। মা নানাবাড়িতেই থাকে।

কেন, তোমাদের বাড়ি নেই?

হ্যাঁ, আছে। বাপ মরে গেছে তো, তাই।

খানিক দম নিয়ে ছেলেটি আবার বলল, আপনি কি পুবতরাইয়া গেছেন কখনো?

কথা বলার সময় এয়াছিন হাতের ঈশারায় সোয়াদুনি বাজার ও পুবতরাইয়ার দিক-নির্দেশ করছিল। কিন্তু তার হাতের সঞ্চালন এতই দ্রুত, পুবতরাইয়া ঠিক কোনদিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না গুলনাহার। বলল, না, যাইনি।

এয়াছিন আগের প্রশ্নটিই উত্থাপন করল আবার, জালাল মামা আপনার কী হয় তা তো বললেন না।

গুলনাহার বলল, না, কিছু হয় না।

কিছু না হলে খোঁজেন কেন?

তার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা ছিল।

এয়াছিন খানিকক্ষণ গুলনাহারের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করল। এর আগে গঞ্জে কখনো দেখেছে কিনা হয়ত তা-ই ভাবল।

গুলনাহার বলল, তোমার জালাল মামার বাড়ি এখান থেকে কত দূর?

খুব বেশি দূরে না। দক্ষিণে মোচ্ছার খাল, সাঁকো পার হলেই তাদের বাড়ি।

দক্ষিণে?

হ্যাঁ, এদিকে।

দক্ষিণ কোনদিকে ঠিক মেলাতে পারছে না গুলনাহার। এয়াছিন হাতের ঈশারায় দিক-নির্দেশ করলেও গুলনাহারের কাছে তা পশ্চিম দিক বলেই মনে হচ্ছে। ঘাট পেরিয়ে এই দিকভ্রান্তির কবলে পড়েছে। উত্তরকে পশ্চিম আর পশ্চিমকে উত্তর মনে হচ্ছে। কৈলাসহরে মুজরোয় গেলে এরকম দিকভ্রান্তিতে পড়ত।

BanglaBook.org

সন্ধ্যায় দোকানে এল জালাল মির্জা। তাকে চিনতে খুব একটা অসুবিধা হলো না গুলনাহারের। অজয় পণ্ডিত চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, পুরোপুরি না হলেও বেশ খানিকটা মিলে গেল। মুখে সাদা চাপদাড়ি, মাথায় লাল বাবরি চুল, চিতেপড়া লম্বা টুপি—অমিল শুধু এটুকু।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে কেউ একজন সালাম দিতেই কথার খই ফুটতে শুরু করল জালাল মির্জার মুখে। সালামদাতা কেমন আছে, বাড়ির সবাই কেমন আছে, তার ছোট বাচ্চাটা মক্তবে যায় কিনা, বুড়ো বাবার শরীরটা কেমন—এমন নানা প্রশ্ন একের পর এক করেই যেতে লাগল। বেচারা সালামদাতা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ফুরসত পাচ্ছে না, মাথা ও কোমর একসঙ্গে বাঁকিয়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে কেবল। কথাবার্তার ধরন দেখেই গুলনাহার আন্দাজ করল জালাল মির্জা মানুষটা কেমন। কথা একটু বেশি বললেও ভালো মনের মানুষ বলেই মনে হলো তার।

লোকটা চলে গেলে খড়মজোড়া খুলে গদিতে ওঠার আগে একবার গুলনাহারের দিকে ফিরে তাকাল জালাল। চোখ ফিরিয়ে নিতেই ফের তাকিয়ে মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে বলল, কারে চান গো মা?

বিনয়মাখা কণ্ঠে গুলনাহার বলল, আপনি কি জালাল মির্জা?

হ্যাঁ। কিছু বলবেন?

থলে থেকে চিঠিটা আগেই বের করে রেখেছিল গুলনাহার। জালাল মির্জার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, অজয় পণ্ডিত নমস্কার জানিয়েছেন আপনাকে। চিঠিটা যদি পড়ে দেখতেন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেওয়ার সময় খানিকটা আনমনা হয়ে পড়ল জালাল। ভাঁজ করা কাগজটাতে একবার চোখ বুলিয়ে ফের গুলনাহারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, আমি তো পড়তে জানি না, মা।

কপালের চামড়ায় ঢেউ তুলে গুলনাহারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, কী নাম যেন বললেন?

অজয় কুমার পণ্ডিত।

অজয় কুমার? তার বাড়ি কি জয়গুনপুর?

হ্যাঁ।

জালাল মির্জার চোখেমুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। গুলনাহার কে, কোত্থেকে এসেছে, কী সমাচার—কিছুই যেন জানার আগ্রহ নেই তার। গুলনাহারকে মাচায় বসতে বলে কুপিটা সামনের খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে স্মৃতিরোমন্থনে লেগে গেল। কালেক্টর অফিসের কাছে তার বাবা কামাল

BanglaBook.org

মির্জার কাঁসা-পেতলের দোকান ছিল, সেটি এখন তার ছোট ভাই চালায়। সেই মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আমল থেকেই কাঁসা-পেতল এবং বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিসপত্রের জন্য বিখ্যাত জয়গুনপুর। কমলাঙ্কের সওদাগররা কদিন পর পরই নৌকা-বোঝাই মালামাল আনতো জয়গুনপুর থেকে। বয়স বেড়ে যাওয়ায় কামাল মির্জার পক্ষে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব হতো না, তাই মালামাল আনার জন্য তাকেই পাঠাত। অজয় কুমারের তৈজসপত্র কিছুটা সস্তায় পেত বলে সে অন্য কোনো কাঁসারুর কাছে যেত না। আহা, কী যে প্রাণখোলা মানুষ অজয় কুমার। জয়গুনপুর গেলে বাড়ি না নিয়ে ছাড়তই না। কম দূরের পথ তো নয় জয়গুনপুর। কমলাঙ্ক থেকে যারাই যেত রাতে ঘরভাড়া করে থাকতে হতো তাদের। শুধু ঘরভাড়া করতে হতে না জালাল মির্জাকে, জোর করেই নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন অজয় কুমার। মুসলমান বলে ঘৃণা করতেন না। জালাল মির্জারও ওসব বাছ-বিচার ছিল না। যাতায়াতে দুদিন, মাঝের একদিন সে অজয় কুমারের বাড়িতে বেড়াত। বয়সে অবশ্য তার অনেক বড় অজয় কুমার, কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনের ফাঁকে কখন যে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কেউ টের পায়নি।

অজয় কুমার কাঁসা-পেতলের কারবার ছেড়ে দেওয়ায় কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল জালাল মির্জা। ততদিনে তার বাবাও মারা গেছে। একা ব্যবসা সামাল দিতে খুব হিমশিম খাচ্ছিল, তার ওপর সৎ ভাইবোনেরা শুরু করল জায়গা-জমির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা। কারবার ছেড়ে দেওয়ায় অজয় কুমার বেশ কিছু টাকা পাওনা থেকে গেলেন জালাল মির্জার কাছে। তারপর তো জালাল কাঁসা-পেতলের দোকানটা সৎ ভাইকে দিয়ে নিজে এই মুদিখানা দিল। যায় যায় করেও আর জয়গুনপুরে যাওয়া হলো না তার। লোক-মারফত অবশ্য বেশ কয়বার অজয় কুমারের খোঁজ-খবর নিয়েছে। একবার দেনা টাকার কিছু অংশ এক লোকের মারফত পাঠিয়েছিল। দিন দশেক পর লোকটা ফিরে এসে জানাল অজয় কুমার গ্রামে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না।

আচ্ছা, তিনি কি এখন বাড়িতেই থাকেন? জানতে চাইল জালাল।

অজয় পণ্ডিতের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত জানাল গুলনাহার। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জালাল বলল, এখন কোনো কারবারেই নেই?

না, লেখাপড়া করেই এখন সময় কাটান।

চলেন কীভাবে?

টোলে ছাত্রদের পড়িয়ে যা পান তা দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে নেন।

BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জালাল। অজয় পণ্ডিতের জন্য তার মনটা ঘামতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আহা, কী মানুষ কী হয়ে গেল!

তারপর চিঠিটা পড়ে শোনাল গুলনাহার। মনোযোগ দিয়ে শুনল জালাল। চিঠিটা পড়া শেষ হলে গুলনাহার সম্পর্কে আর কিছুই জানতে চাইল না। অজয় পণ্ডিত পাঠিয়েছেন এটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতের অনুরোধ উপেক্ষা করার সাধ্য নেই তার। যত টাকা তিনি পাওনা আছেন, গুলনাহারকে দুই বছর বসিয়ে খাওয়ালেও শোধ হবে না।

জালাল মির্জার বাড়িতে দু-তিন বছর কাটিয়ে দিতে পারত গুলনাহার। মানুষ খারাপ নয় জালাল। নামাজ-রোজা করে নিয়মিত। তবে তার ধর্মকর্ম নিজের ভেতরই সীমাবদ্ধ। বাড়ির কারো নামাজ-রোজা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়িতে আর আছেই বা কে? তিনজনের ছোট সংসার। ছেলেদের বিয়ে করিয়ে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। কয়েক বাড়ি পরই জমিনের মাঝখানে তিন ছেলের নতুন বাড়ি। এসব ব্যাপারে তার একটা নীতি আছে। সে জানে, বিয়ে করলে ছেলেরা আর বাবা-মায়ের থাকে না, বউই তখন সব। অবশ্য এতে ছেলেদেরও দোষ দেয় না সে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম, কার কী করার আছে। অহেতুক ঝগড়া-ফ্যাসাদের দরকার কী। দুদিনের দুনিয়া, সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারলে ভালো। সে তো আর ছেলেদের রোজগারের মুখাপেক্ষী নয়। বড় ছেলের কাপড়ের ব্যবসা আছে, মেজ ছেলে চাষাবাদ করে এবং ছোট ছেলের কালেক্টর অফিসে পিয়নের চাকরি। সংসারে এখন থাকার মধ্যে আছে বউ এবং ছোট মেয়েটা। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে কচুয়ায়। পাটের ব্যবসা আছে মেয়েজামাইর। মোটামুটি অর্থ-বিত্তের মালিক। বছরে একবার নাতি-নাতনি নিয়ে এসে দু-চারদিন বেড়িয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য খারাপ জালালের, ছোট মেয়েটা আজন্মের বোবা। সংসারে তার এই একটাই দুঃখ। মেয়েটার ভবিষ্যৎ চিন্তা মাঝে মধ্যে তাকে অস্থির করে তোলে।

অজানা-অচেনা একটা যুবতীকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টিকে ভালোভাবে নেবে না তহুরা, গুলনাহারের মনে এমন একটা আশঙ্কা ছিল। এ কদিনে সেই আশঙ্কা কেটে গেছে। যে যা-ই বলুক, তহুরার মতো নারী আজকাল পাওয়া কঠিন। দেখতে শ্যামলা, ঠোঁট দুটো মোটা। দেখতে যেমনই হোক, তার মনটা কিন্তু ভালো। গ্রামের সবার মুখে তার সুনাম শোনা যায়, অথচ ছেলে-বউরা গ্রামে হেঁটে হেঁটে তার বদনাম করে বেড়ায়। ছোট ছেলের

BanglaBook.org

বউটাকে মাঝে-মধ্যে দেখা গেলও বাকি দুজনের ছায়াও পড়ে না এই বাড়ির ত্রিসীমানায়। ছেলেদের সঙ্গে কঠিন একটা বিবাদ আছে জালাল মির্জার। বিবাদের কারণ অবশ্য একাধিক। প্রথমত, ধানি জমিগুলো কেন এখনো ছেলেদের ভাগ-ভাটোয়ারা করে দিচ্ছে না এ জন্য তাদের অভিমানের শেষ নেই। দ্বিতীয়ত, তারা শুনেছে, ধানি জমির অর্ধেক এবং পুরো বাড়িটা নাকি বউ আর ছোট মেয়ের নামে লিখে দিয়েছে তাদের নিষ্ঠুর বাপ।

প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে জালাল মির্জার বক্তব্য স্পষ্ট—বন-জঙ্গল সাফ করে, সাপ-খোপ আর শিয়াল তাড়িয়ে জমিদারের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত এনেছি আমি, এখন তোমাদের আবদার রক্ষা করি, আর তোমরা ঝাঁটাপেটা করে আমাকে বাড়িছাড়া করো। না বাবারা, সেটা আপাতত হবে না। আমি মরলে তোমরা সব ভাগ করে নিও।

দ্বিতীয় অভিযোগটা সত্য না মিথ্যা, তা নিয়ে সে একেবারে চুপচাপ। সেও কম ত্যাড়া নয়। দেখা যাক কী করতে পারে ছেলেরা। মুখ সে খুলবে না কিছুতেই।

তার এই কঠিন সিদ্ধান্তের খবর হয়ত ছেলে আর বউদের কানে গেছে, তাই আজকাল এসব বিষয়ে কথাবার্তা তেমন একটা শোনা যায় না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তারা আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে দম নিচ্ছে। কঠিন একটা ব্যারামে পড়ুক মির্জার বেটা, তারপর সুযোগ বুঝে মাটি খুঁড়ে পুরনো কথা তুলবে। কিন্তু মির্জার শরীর এমনই শক্ত, দশ বছরেও রোগে পড়ার সম্ভাবনা নেই। পঁয়ষট্টির কম নয় বয়স। এখনো সুস্থ-সবল।

ছেলেদের সঙ্গে বিবাদের এসব কারণ সবাইকে বলে বেড়ালেও মূল কারণটা কিন্তু খুব সাবধানে এড়িয়ে যায় জালাল। অবশ্য তার কাছে সেটা বিশেষ কোনো ঘটনা নয়। বউয়ের মৃত্যুর পর বিয়ে আরেকটা করেছে, কারো মাথায় তো আর বাড়ি দেয়নি। বুড়ো বয়সে বাবার দ্বিতীয় বিয়েকে ছেলেরা মেনে নেয়নি তো কী হয়েছে, ওসবের তোয়াক্কা করে না জালাল মির্জা। শেষ বয়সে একটু সেবা-যত্নের জন্য ছেলে-বউদের বাঁকা মুখ সহ্য করার চেয়ে নিজে একটা বিয়ে করা কি ভালো নয়?। বউ মরার দেড় বছরের মাথায় অকাল-বিধবা তহুরাকে ঘরে এনে সে বরং পুণ্যের কাজ করেছে।

ছেলে তিনটি আগের আর মেয়ে দুটি পরের সংসারের। ছেলেদের সঙ্গে বিবাদটা আসলে এখানেই। নইলে কি আর বাবার মুখ না দেখে থাকতে পারে কোনো ছেলে? না দেখুক, বিয়ে তো আর চারটি করেনি, করেছে মাত্র দুটি। তাও বউ মারা যাওয়ার পর। কামাল মির্জা তিন-তিনটা বিয়ে করেছিল বড়

BanglaBook.org

বউ বেঁচে থাকতেই। তবে বউ বলতে যা বোঝায় তা ছিল একটাই—জালালের মা। বাকি তিনটাকে তো বড় বউয়ের সেবা করার জন্যই ঘরে তুলেছিল। মৃত্যুর আগে তিন বউয়ের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করে দিলে কী হবে, শেষ দিন পর্যন্ত এই বাড়িতেই ছিল কামাল মির্জা। তল্লাটে ডাকনাম ছিল তার। গঞ্জের আড়তদার, মুদিঅলা থেকে শুরু করে মাছ বাজারের মাছুয়ারা পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধা করত। ঝগড়া-বিবাদে সবাই ছুটে আসত তার কাছে। অবশ্য তার পেছনে বড় কারণটা ছিল জমিদারের নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা ও চাপরাশির সঙ্গে কামাল মির্জার খাতির। তারা গঞ্জে এলে তার গদিতে বসে পান-তামাক না খেয়ে যেত না। তার নামেই এই বাড়ির নাম হয় মির্জাবাড়ি।

গুলনাহারকে পেয়ে ভারি খুশি তহুরা। স্বামী বাড়ি না থাকলে কথা বলার মতো একটা মানুষ খুঁজে পায় না সে। বোবা মেয়েটাকে সামলাতেই তার দিন যায়। এত বড় হলো মেয়ে, তবু বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হলো না। সারা পাড়া ঘুরে-ফিরে বেলা কাটে তার। এদিকে মাথা কুটে মরে তহুরা। সেয়ানা মেয়ে, দিনকাল খারাপ, কী থেকে কী হয়ে যায় সেই চিন্তায় ব্যাকুল থাকে তার মন। বোবা হলেও বিয়ে একটা দিতে পারত। কিন্তু তার এই শিশুসুলভ আচরণের জন্য সুবিধা কিছু করা যাচ্ছে না। কতবার কত জায়গা থেকে দেখতে এল তাকে, প্রতিবারই একটা না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। কয় মাস আগে তহুরার বাবার দেশ চন্দ্রপুরা থেকে একটা ভালো সম্বন্ধ এল। আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে মেয়েকে দেখতে ছেলের বাবা এল। সাজিয়ে-গুজিয়ে মেয়েকে সামনে হাজির করল তহুরা। যেই না খাটের উপর বসাল অমনি ভ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না শুরু করে দিল। আর যায় কোথায় ছেলেপক্ষ, পড়িমরি করে পালিয়ে বাঁচল।

গুলনাহারকে পেয়ে আরো একটা উপকার হয়েছে তহুরার। কতদিন সে বাপের বাড়ি যেতে পারে না। স্বামীর কোনো বাধা-নিষেধ নেই, তারই সময়-সুযোগ হয় না। সংসারটাকে গুছিয়ে রেখে কোথাও যেতে পারে না। যাওয়ার দিনক্ষণ মনে মনে ঠিকঠাক করে রাখল, অমনি বড় মেয়ের জামাই এসে হাজির। যত্ন-আত্তি করে খাইয়ে-দাইয়ে জামাইকে যেই না বিদায় করল অমনি হুট করে একদিন খবর এল সোহাগিকে দেখতে আসবে ছেলেপক্ষ। আচ্ছা যাক, এই পর্বও সারল, কিন্তু দেখতে না দেখতে চলে এল ধানের মৌসুম। ভেবে রাখল, গোলায় ধান তোলা শেষ হলে বেহারাদের খবর দেবে, অথচ দেখা গেল তাদের পাত্তা নেই, বিয়ে-শাদির ঠিকায় রঙসোনাপুর বা দেবিদ্বার চলে গেছে। কোন কালে আসবে তার কোনো খবর নেই।

BanglaBook.org

গুলনাহার আছে এখন, এখন তাকে আর ঠেকায় কে। সোহাগিকে তার কাছে রেখে এক মাসের জন্য সে ডুব দেবে। স্বামীর আপত্তি না থাকলে দুই মাসেও ফিরবে না। অসুবিধা কী, গুলনাহার তো আছে। ছোট বোনের মতো মেয়েটাকে দেখে-শুনে রাখবে। থাকুক, যতদিন ইচ্ছে এই বাড়িতে থাকুক গুলনাহার।

কিন্তু খবরটা শোনার পর অস্থির হয়ে উঠল গুলনাহারের মন।

দুদিন ধরে গঞ্জের অলিগলিতে ঢোলসহরত চলছে। উদয়াচল থেকে এসেছে লোকগুলো। ঘোড়সওয়ারি চার সেপাই এবং মাঝবয়সী এক যুবক। হরিদশ্ব গ্রামের কোনো এক গুলনাহারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। জালাল মির্জার কাছে খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল গুলনাহার। চোখের ভ্রু এক লাফে কপালে গিয়ে ঠেকল। পাছে জালাল টের পায়, এই ভয়ে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। সে তো জয়গুনপুরের গুলনাহারকে চেনে, যার পান-তামাকের বেপারি স্বামী নিরুদ্দেশ, হরিদশ্বের কোনো গুলনাহারকে তো সে চেনে না।

কে জানে কোন নবাবের বেটি! বলল জালাল মির্জা। নইলে কি আর ঢোলসহরত হয়?

তারপর নাম নিয়ে শুরু কাল বারো রকমের গল্প। শমসের গাজী যে-কালে সিংহাসনে বসল, মানুষে ছেলেমেয়েদের নাম রাখতে শুরু করল শমসের। কেউ কেউ না জেনে না বুঝে 'গাজী' উপাধিটাও রেখে দিল। আর ওই যে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলা, কোম্পানি তাকে ফাঁসি দিয়ে মারার পরপরই সবাই তার নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখতে শুরু করল। পাছার কাপড় নেই, অথচ ছেলের নাম রেখেছে সিরাজুদ্দৌলা! গঞ্জে ঘুরে কয়েক ডজন শমসের পাবে আর পাবে ডজন ডজন সিরাজুদ্দৌলা।

জালাল মির্জার কথার দিকে গুলনাহারের খেয়াল নেই। ঘটনার আগামাথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে, এক নিদারুণ অস্থিরতায় পড়ে ঘামছে কেবল। সেপাইরা যে তাকেই খুঁজছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার। যুবক যে হামজা ছাড়া আর কেউ নয়, সে নিশ্চিত। কিন্তু তার সঙ্গে সেপাইরা থাকবে কেন, এই হিসাবটা মিলাতে পারছে না। তবে কি মহারাজ তাকে বন্দী করে নিতে পাঠিয়েছেন? কুর্নিশ না করার অপরাধ তবে এতই গুরুতর?

না, কিছুতেই স্থির ধারণায় আসতে পারে না গুলনাহার। নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার মাথায়—আচ্ছা, তারা সেপাই, না সাধারণ প্রজা? দেখতে কেমন? পোশাক-আশাক কেমন? কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি বা পিঠে তীর-ধনুক জাতীয় কিছু আছে? ঘোড়াগুলো সাদা না সবুজ? তেজি না টাঙ্গাবাহী?

BanglaBook.org

এখনো কি তারা গঞ্জে আছে না চলে গেছে? থাকলে থাকুক, হামজার সঙ্গে কিছুতেই সে দেখা করবে না। হামজা একা হলে একটা কথা ছিল, সঙ্গে যে সেপাইরা আছে! তারা হয়ত চিনবে না তাকে, কিন্তু হামজা যদি বলে দেয়! এমনও তো হতে পারে সেপাইদের নজরবন্দী সে। মহারাজ তাকে বাধ্য করেছেন গুলনাহারকে খুঁজে বন্দী করে নিয়ে যেতে। নইলে তার মতো তুচ্ছ এক নটীর জন্য মহারাজ সেপাই পাঠাতে যাবেন কেন? তিনি চাইলেই তো ডজন ডজন নটী তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রয়োজনে দিল্লি বা রেঙ্গুন থেকে ওস্তাদ এনে সাবেরি বাঈয়ের কোঠার নাচওয়ালি অরুণাকে নাচে-গানে পারদর্শী করে রাজনটীর পদে অভিষিক্ত করবেন। কোথাকার কোন গুলনাহার, তার জন্য কী এমন ঠেকা জাজিনগরের মহারাজের? নিশ্চয় কুমন্ত্রণা দিয়ে মহারাজের কান ভারী করেছে যুবরাজ দুর্গামণি। ক্ষিপ্ত মহারাজ গুলনাহারকে শাস্তি দিতেই সেপাই পাঠিয়েছেন তাকে খুঁজে বের করে আটক করে নিয়ে যেতে। না, কিছুতেই ধরা দেবে না গুলনাহার।

পরক্ষণে তার ভাবনা গতি পরিবর্তন করল। ভাবল, কে জানে, মহারাজ হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। যুবরাজ যে বিনাদোষেই তার গায়ে হাত তুলেছিলেন, হামজা হয়ত বলেছে মহারাজকে। ভুল বুঝতে পেরে তাকে ফিরিয়ে নিতে সেপাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কে ফিরছে আর উদয়াচলে? মরে গেলেও যাবে না গুলনাহার। নটীবৃত্তি ছাড়বে না সে। নাচ না হোক, গান তো তার আত্মার সঙ্গে মিশে আছে। কতদিন মনের সাধ মিটিয়ে গলা ছেড়ে গাইতে পারে না। মাত্র আর কটা দিন, রঙসোনাপুরের জগন্মোহিনী যাত্রাদলের ঠিকানা সে জোগাড় করেছে। দরকার হলে যাত্রা দলে যোগ দিয়ে অভিনয় করে বেড়াবে, তবু উদয়াচলে ফিরবে না। উদায়চলের কথা সে ভুলে যেতে চায়। উদয়াচলের সব স্মৃতি মুছে ফেলতে চায় মন থেকে।

কিন্তু হামজাকে যে তার এখন খুব প্রয়োজন। এই দুঃসময়ে সে পাশে থাকলে এভাবে অকূল সাগরে ভাসতে হতো না তাকে। তাকে পেলে চলে যেত দূরের বন্দরে। কে যেন তাকে বলেছিল পানামনগরের কথা। পানামনগরে ভিনদেশের বড় বড় জাহাজ ভিড়ে। কাপ্তান-সারেংরা জাহাজের ভেতর জলসা বসায়। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে নটী-বাইজিদের পেছনে। হামজাকে পেলে সেখানেই চলে যেত সে।

সারা রাত ঘুম আসে না গুলনাহারের চোখে। খাট থেকে নেমে বার বার দাওয়ায় গিয়ে বসে। সোহাগি কাঁইকুঁই করে, গুলনাহারের পিঠে আর মাথায় হাত রাখে। নতুন বোনটার কিছু একটা যে হয়েছে তা সে বুঝতে পারে।

BanglaBook.org

কিছুতেই অস্থিরতা কাটে না গুলনাহারের। রাত জেগে হামজার সঙ্গে দেখা করার উপায় খুঁজতে থাকে। পরদিন এয়াছিনের হাতে আট আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে বলল, একটা কাজ করে দিতে পারবি ভাই?

একসঙ্গে এত পয়সা পেয়ে এয়াছিন তো অবাক। বলল, শাড়ি-কাপড় কিনে আনতে হবে বুঝি?

আরে না।

তাহলে?

ওই যে গঞ্জে লস্কররা ঢোলসহরত করেছে, তারা এখন কোথায় আছে এই খবরটা এনে দে না ভাই।

আপনার কাছে আসতে বলবো তাদের?

না না, সাবধান! দোদেল হামজা নামের কেউ সেখানে আছে কিনা এই খবরটা নিয়ে আসবে শুধু। লাগলে আরো পয়সা দেব।

খবর আনেনি এয়াছিন, খুশিতে গদগদ হয়ে খোদ খবরের মানুষটাকেই নিয়ে ফিরল। তখন দুপুর। জোহরের আজান পড়েছে মসজিদে। কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছে জালাল মির্জা। গোসল সেরে মসজিদের দিকে চলে গেছে। তার পিছু পিছু পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ায় গুলনাহার। দক্ষিণপাড়ে মির্জা বাড়ির পারিবারিক গোরস্তান। গাছগাছালিতে সবুজ হয়ে আছে গোরস্তানটা। বর্ষাকালে চারপাশ এমনই সবুজ হয়ে থাকে। স্থানে স্থানে আগাছার দঙ্গল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারই ফাঁকে দূরে গঞ্জের বড় রাস্তা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে এয়াছিনের ফেরার প্রতীক্ষা করেল গুলনাহার।

আপা!

হঠাৎ এয়াছিনের গলার আওয়াজ পেয়ে পেছনে ফিরে তাকাল। এয়াছিনের সঙ্গে হামজাকে দেখে চমকে উঠল। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, সেপাইরা কোথায়?

হামজা নিরুত্তর। গুলনাহারকে দেখেই কান্না শুরু করেছে। কতদিন পর দেখা! সে ভাবেনি এই জীবনে আর গুলনাহারের দেখা পাবে। গুলনাহারের দেখা পাওয়াটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত।

চোখ মুছতে মুছতে একটা কাপড়ের থলে গুলনাহারের পায়ের কাছে রাখল হামজা। সেদিকে খেয়াল নেই গুলনাহারের। সে বারবারই সেপাইদের কথা জানতে চাচ্ছে। হামজা বলল, গঞ্জের ঘাটে অপেক্ষা করছে সেপাইরা, তোমার চিঠি পেলেই ফিরে যাবে।

চিঠি? কিসের চিঠি? বিস্মিত কণ্ঠ গুলনাহারের।

BanglaBook.org

পাঠক, এখানে এসে হয়ত আপনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন। বিশ্বাস করতে চাইবেন না, জাজিনগরের মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য সামান্য এক নটীর জন্য এমন ভালোবাসা দেখাতে পারে। হয়ত লোকপুরাণ বলে না সেই কথা। কিন্তু সাক্ষী সুধাবতী, গুলনাহার ফিরে আসার পর এমন ঘটনাই ঘটেছিল। গুলনাহারের কাছে সেই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে শুরু করল হামজা।

প্রথমবার যখন হামজা ও শীতাংশুদেবকে মহলে তলব করা হলো তার প্রায় মাস তিনেক পরের কথা। একদিন পেয়াদা এসে হামজাকে জানাল, মহারাজ জরুরি তলব করেছেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গেই মহলে হাজির হলো হামজা। তাকে নিয়ে দিঘির ঘাটে গিয়ে বসলেন মহারাজ। হামজার মনে হলো, কোনো কারণে যেন মহারাজ কিছুটা চিন্তিত। করজোড়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। মহারাজ তাকে বারবার বসতে বলছেন, কিন্তু সে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েই রইল। জাজিনগরের মহারাজের সামনে বসার মতো সাহস তার মতো সামান্য তবলচির তো থাকার কথা নয়। শেষে মহারাজ অভয় দিলে সে অন্য ঘাটলায় গুটিসুটি মেরে বসল। মহারাজ নিচু গলায় ডাকলেন, হামজা!

আজ্ঞে মহারাজ।

গুলনাহারের ব্যাপারটা কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না আমাকে।

অপরাধ ক্ষমা করবেন মহারাজ! কী বলবো, একই অবস্থা তো আমারও। কোথায় গেল একবার বলেও গেল না।

বলেই কেঁদে উঠল হামজা।

মহারাজ তাকিয়ে রইলেন দিঘির টলটলে জলের দিকে। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস—কোনো কারণে মন খারাপ হলে দিঘির ঘাটে এসে বসে থাকেন অথবা বড়শি নিয়ে মাছ শিকারে লেগে যান।

মহারাজ বললেন, রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে অনেক নিষ্ঠুরতা দেখাতে হয় আমাকে, কিন্তু অকারণে আমার বিরূপ আচরণের শিকার হয়ে কেউ জাজিনগরের রাজধানী উদয়াচল ছেড়ে চলে যাবে, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না।

মহারাজ!

আচ্ছা, গুলনাহার আত্মহত্যা করেনি তো? শঙ্কার ছাপ মহারাজের চেহারায়।

না না মহারাজ, এমন মেয়ে না গুলনাহার। এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

BanglaBook.org

এমন কিছু ঘটলে তো আর অনুতাপের শেষ থাকবে না আমার। শাস্ত্র বলেছে, অকারণে কারো মনে আঘাত দিতে নেই। আমি জেনেশুনে কখনো তা করি না।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মহারাজ। তারপর বললেন, উদয়াচলে ফিরে আসুক গুলনাহার সেটা অবশ্য আমি চাই না, কিন্তু যেভাবেই হোক তার সন্ধান চাই আমি।

আজ্ঞে মহারাজ।

মহারাজের এমন নমনীয় মনোভাব দেখে নিশ্চিত হলো হামজা। তার ধারণাই ঠিক। জলসা, সুরা বা নাচ-গানের প্রতি আসলেই এখন আকর্ষণ নেই তার। তিন মাস আগে সে মহারাজকে যেমন দেখেছিল এবারের দেখা তার চেয়ে অনেক ব্যতিক্রম। ভাব-গাম্ভীর্য আগের চেয়ে অনেকটা বেড়েছে, কথাও বলেন খুব চিন্তা-ভাবনা করে, মেপে মেপে। হাতে একটা জপমালাও দেখা যাচ্ছে।

মহারাজ বললেন, সত্যি গুলনাহারের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি আমি। জানি, এটা নিতান্তই তুচ্ছ একটি ঘটনা, তবু কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছি না।

হামজা ভাবল, এবার বুঝি মহারাজ চলে যেতে বলবেন তাকে। শেষবারের মতো তাই একবার রাজমহলের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। পাথরের কারুকার্যখচিত রাজমহলের দুই শিখর সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করে উঠল তার। বহু দিনের পরিচিত এই রাজমহল চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাবে আজ। সে তো আর রাজপাদোপজীবী কেউ নয়, কে তাকে ঢুকতে দেবে মহলে!

শেষে মহারাজ যা করলেন তাতে হামজার মুখ থেকে কথা হারিয়ে গেল। গুলনাহারের সন্ধানে আজই কমলাঙ্কে পাঠানো হচ্ছে তাকে। যতদিন লাগুক, যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সঙ্গে দিলেন অস্ত্রধারী চার বিশ্বস্ত সেপাই এবং চারটি তেজি ঘোড়া। আরো দিলেন একটি থলেতে পঁচিশটি স্বর্ণখণ্ড এবং ত্রিশটি রৌপ্যখণ্ডসহ নগদ চল্লিশ হাজার টাকা। বললেন, সত্যি সত্যি যদি হরিদশ্বে গুলনাহারের খোঁজ পাওয়া যায়, তবে এসব উপহার তাকে দেবে। এসব যেন সে ফিরিয়ে না দেয়। দিলে কিছুতেই স্বস্তি পাব না আমি। এতদিনে হয়ত তার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলেও ভিটেমাটি বেচে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়নি তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই নগদ টাকার

BanglaBook.org

কিছু দিয়ে সে নিজগ্রামে বাড়িঘর তৈরি করুক। আর এসব স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ড ভবিষ্যতের জন্য, যাতে কারো কাছে হাত পাততে না হয় তাকে।

বিস্ময় কাটে না হামজার। একেবারে থ হয়ে গেল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট স্বর—আজ্ঞে মহারাজ।

মহারাজ বললেন, তাকে বলবে, পারলে যেন নটীবৃত্তি ছেড়ে দেয়। এতেই তার মঙ্গল। এই পেশায় দুর্নাম আছে, সুনাম নেই। সুখ আছে, শান্তি নেই। এই সমাজ বড় নিষ্ঠুর। এই পথে থাকলে একদিন গলায় ফাঁস দিয়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

গুলনাহারকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সেপাইদের ফিরে আসতে বারণ করে দিলেন মহারাজ। প্রয়োজনে ছয় মাস লাগুক, তবু তাকে খুঁজে বের করা চাই। পথে দস্যু-ডাকাতের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। এজন্য সেপাইদের হাতে উন্নত অস্ত্রও দিলেন। যদিও তিনি জানেন, চাকলা রৌশনাবাদের কোনো পরগণার কেউ জাজিনগরের সেপাইদের সামনে কখনোই দাঁড়ানোর সাহস করবে না। তবু সাবধানতার তো বিকল্প নেই।

তারপর? অশ্রুত কণ্ঠ গুলনাহারের।

হামজা বলল, শুধু তোমারই নয়, আমার দায়িত্বও নিয়েছেন মহারাজ। দুই হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি যদি গুলনাহারের সঙ্গে থেকে যেতে চাও তো ভালো, আর যদি উদয়াচলে ফিরে আসতে চাও তবে রাজ-কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করা হবে তোমাকে।

কথা হারিয়ে ফেলল গুলনাহার। চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবে, হামজা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না তো? সামান্য নটীর জন্য জাজিনগরের মহারাজের এমন ভালোবাসা! মহারাজের দয়ার কথা সে শুনেছে, বদান্যতার কথা শুনেছে। কিন্তু তা এত বিপুল! তাকে এতটা ভালোবাসতেন মহারাজ?

ব্যস্ত হয়ে উঠল হামজা। বলল, দাও দেখি, একটা চিঠি লিখে দাও। আমি সেপাইদের বিদায় করে আসি।

আর পারল না গুলনাহার, মুখে আঁচল ছাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। বিগলিত অশ্রু তার চিবুক স্পর্শ করল। এই কান্না আনন্দের না বিষাদের, তার কিছুই জানে না সে। বুকের ভেতর জমে থাকা কষ্টগুলো মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। খুব হালকা লাগে বুকটা। মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল।

ঘরে গিয়ে একটা চিঠি লিখে হামজাকে দিল। সেপাইদের বিদায় করে ফিরে এল হামজা। রাজ-কর্মচারী হওয়ার লোভ নেই তার। কম পথ তো

BanglaBook.org

হাঁটেনি জীবনে। সমান্তরালও ছিল না সেই পথ। গুলনাহারের মতো সেও কম ক্লান্ত নয়। পোড় খেতে খেতে সেও কম অঙ্গার হয়নি। এবার একটু শান্তি চায়। তা ছাড়া সুধাবতী তীরের এই অজগাঁয়ে একা কীভাবে থাকবে গুলনাহার? থাকুক না সে। গুলনাহারের দাস হয়ে থাকতেও তার আপত্তি নেই।

রাজনটী গুলনাহারের কাহিনি হয়ত এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু বেহুলা, ভেলুয়া, কাজলরেখা, নূরুন্নেহা বা পরীবানুর ধারাবাহিকতায় যে নারীর জীবন, সেই জীবন তো এত নিষ্কণ্টক হতে পারে না। লোকপুরাণের জমিন চষে অতল-তালাশ এবং এক জীবনের যে বিপুল বৈচিত্র্যের কথা বলার জন্য কাহিনির সুতোটাকে টানতে টানতে সুধাবতীর উজান থেকে ভাটির এই হরিদশ্ব গ্রামে নিয়ে আসা হলো, সেটাই তো বলা হলো না এখনো। তাই কমলাঙ্কের ধর্মসাগর সাক্ষী রেখে এই কথক বলছে, এতক্ষণ যা বলা হলো তা কাহিনির প্রস্তাবনা মাত্র, এখান থেকেই শুরু রাজনটী গুলনাহারের মূল কাহিনি।

সুধাবতীর পাড় ছেড়ে খানিকটা সামনে এগুলে সেই যে জমিনের মাঝখানে ঢিবিটা, একদিন যেখানে একটা মাথাভাঙা তালগাছ ছিল, সেখানেই এখন গুলনাহারের বাড়ি। ভিটা তৈরি থেকে ঘর তোলা পর্যন্ত সবই হয়েছে জালাল মির্জার তদারকিতে। তার বাড়িতে আশ্রিতা গুলনাহারকেই যে ঢোলসহরত করে খুঁজেছিল রাজার সেপাইরা, তা সেদিন স্বীকার না করে পারেনি গুলনাহার। মির্জার দুই পা ধরে বলেছে, এই বেয়াদবির মাফ আমাকে করতেই হবে মামা।

মির্জা তো অবাক। হঠাৎ পা ধরে মাফ চাওয়ার মতো কী এমন ঘটনা ঘটল? দ্রুত সে পা ছাড়িয়ে নিতে গেল, কিন্তু ছাড়ল না গুলনাহার, বলল, আগে মাফ পাব কিনা বলুন, তারপর ছাড়ব।

হুকোর নলটা নামিয়ে রেখে জালল হেসে উঠল, কী বিপদের কথা বাবা! বলো না আগে কী হয়েছে?

দেউড়ি থেকে ডেকে আনা হলো হামজাকে, ঘটনার আদ্যোপান্ত বলতে শুরু করল গুলনাহার। তবে সঙ্গে আরেকটা নতুন গল্প ফেঁদে। হরিদশ্বের নামকরা কবিয়াল তার বাবা, আকালের বছর সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে মা তাকে বেচে দিয়েছিল—এ পর্যন্ত সত্য ঘটনাই বলল। কিন্তু কোথায় বেচেছে,

BanglaBook.org

সেখান থেকেই গল্পটা ফাঁদল গুলনাহার। কোথায় আর? সেই যে জুগিদিয়ায়। পান-তামাকের বেপারির কাছে নয়, সোবানালি তাকে বিয়ে দিয়েছিল জুগিদিয়ার এক ভুঞাবাড়িতে। এত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হবে এমন কপাল কি তার আছে? ভুঞার আগের বউ মারা যাওয়াতেই তার কপাল খুলে যায়। কিন্তু ভুঞা ছিল কোম্পানি-বিরোধী, জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। কোম্পানির সরকার যখন মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করল, তার কিছুদিন পরই জর্জ ডানড্রিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল ভুঞা। সৈন্যরা তাকে গুলি করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। সাত বছরের ছেলেটাকেও রেহাই দিল না তারা। ধরা খেলে গুলনাহারও বাঁচত না। বহু কষ্টে সে উদয়াচলে পালায়। ওখানেই রামগঙ্গা বিশারদের সঙ্গে পরিচয়। তিনি পাঠালেন তার বন্ধু অজয় পণ্ডিতের কাছে।

তাহলে দোদেল হামজা কে? কে আর? ভুঞার রায়তি দেখাশোনা করত হামজা। ভুঞাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সেও উদয়াচলে পালিয়ে গেল। আশ্রয় চাইল জাজিনগরের মহারাজের। তারই সহায়তায় সহায়-সম্পত্তি বেচে দিয়ে গুলনাহারকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল হামজা।

শুনে জালাল মির্জা মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, আমি আগেই এমন কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম। তোমার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল যেনতেন ঘরের মেয়ে নও তুমি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল গুলনাহার। যাক, শেষ পর্যন্ত বানানো গল্পটা জালাল মির্জাকে বিশ্বাস করানো গেল! এরকম ডাঁহা মিথ্যাচারের জন্য খারাপও কম লাগল না তার। কিন্তু সে তো অতীতকে মুছে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। অতীত-জীবনের কথা বললে তো কেউ ঠাঁই দেবে না তাকে। সংগীত খুব প্রিয় মানুষের, খেম্‌টা নাচ দেখার জন্য মাঠে-ময়দানে শত শত মানুষ জড়ো হয়, সমাজের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাঁড়ের বাড়ি যেতেও তাদের আপত্তি নেই। আপত্তি তখনই জাগে, যখন নটী-বাইজিরা সামাজিকদের মতো সামাজিক হয়ে উঠতে চায়।

মাফ কেন করবে না জালাল মির্জা? এই অসহায় নারীর জন্য তার মনের ভেতরও কষ্টের ঝড় বইছে। অজয় পণ্ডিত কি যাকে-তাকে পাঠিয়েছেন তার কাছে? গুলনাহারের প্রতি নিশ্চয়ই তার স্নেহ আছে। যা হওয়ার হয়েছে, গুলনাহার এখন তারই মেয়ে। দুই মেয়ের স্থলে না হয় তিন মেয়েই হলো এবার। ওই অবাধ্য তিন ছেলের চেয়ে তার এই নতুন মেয়ে অনেক ভালো।

BanglaBook.org

গুলনাহারের ইচ্ছে ছিল বাবার ভিটায় একটা ঘর তুলবে এবং কিছু আবাদি জমি কিনবে। বাড়িভিটাসহ মোট দুই একর জমি কেনা গেছে। জমিগুলো ছিল মাধব ঘোষ নামের গঞ্জের এক আড়তদারের। জমিগুলো বেচে দিয়ে সে গঞ্জের দক্ষিণে জায়গা বন্দোবস্ত নিয়েছে। কালেক্টর অফিস হওয়ার পর থেকে ওদিকে জমির দাম বাড়ছে। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না সে। কিছু জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে রাখলে মন্দ কী? নতুন নতুন আইন হচ্ছে দেশে, পাঁচসালার পরিবর্তে জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। কখন আবার কী হয় তা তো বলা যায় না। জালাল মির্জা যখন গুলনাহারের জন্য জমি খুঁজছিল তখন প্রস্তাবটা দিল মাধব ঘোষ। গুলনাহারও আর বাদ রাখেনি কিছু, নদীর এই পাড়ে ঘোষের দখলে যা যা ছিল সবই নিজের নামে বন্দোবস্ত নিয়ে নিল। কিন্তু বাবার ভিটাটা কিছুতেই উদ্ধার করতে পারল না। ভিটাটা এখন হায়াত তালুকদারের সম্পত্তি। দুর্ভিক্ষের সময় নাকি মনজুরি তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের বেশিরভাগ লোক হায়াতের কথা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। হায়াতকে তারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেনে, গলা শুনেই বুঝতে পারে তার কুটিলতা। ছেলেপিলেরা তাকে 'শালা' ছাড়া কথাই বলে না। ধোঁকাবাজ, দখলবাজ, বজ্জাত হিসেবে গ্রামে তার পরিচিতি।

তারু সরকারের ভিটা নিয়ে হায়াত তালুকদারের টালবাহানার খবর শুনে একদিন নসির মণ্ডল দেখা করতে এল গুলনাহারের সঙ্গে। বলল, ওই শালা ইবলিশের খালাতো ভাই। খোদা তারে মাটি দিয়ে বানায়নি। তোমার বাবার সুনাম এখনো আছে গ্রামে। আমরা এখনো মরিনি। ধীপতি দাস মরার আগে আমাকে বলে গেছে তোমার মা বসতভিটা বিক্রি করেনি। অভাবে আর টিকতে পারছিল না বলে দুই মেয়েকে নিয়ে সে রঙসোনাপুর চলে গিয়েছিল। বহুদিন শূন্য পড়ে থাকার পর ভিটাটা দখল করে নিয়েছে হায়াত।

সত্যি বলছেন চাচা?

হ্যাঁ মা, সবই আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। সাবধান, কিছুতেই তোমার দাবি ছাড়বে না তুমি।

বাবার ভিটার দাবি কি কেউ ছাড়ে? গুলনাহার তাই নিজে গিয়ে দেখা করেছে হায়াত তালুকদারের সঙ্গে। কিন্তু হায়াতের এক কথা—মাগনা তো নিইনি বাড়ি, নগদ পঞ্চাশ টাকা হাতে নিয়ে তারপর তোমার মা দলিলে টিপসই দিয়েছে।

কিছুতেই যখন সুবিধা করা গেল না, শেষে সালিশ ডাকল জালাল মির্জা। ঘটনা যদি সত্য হয় তবে হায়াতের সাধ্য নেই বাড়ি দখল করে রাখবে।

BanglaBook.org

তালুকদার নয় জালাল মির্জা, তাই বলে তার শক্তিও কম নয়। দরকার হলে আদালতে মামলা ঠুকবে। তাতে কাজ না হলে ডোঙাতলা থেকে লাঠিয়াল ভাড়া করে আনবে। হায়াতকে বুঝিয়ে দেবে সে যে মির্জা বাড়ির সন্তান।

কিন্তু সালিশে হেরে গেল জালাল মির্জা। গঞ্জের এক মিষ্টির দোকানে বসেছিল সালিশ। হরিদশ্বের পঞ্চায়েতের গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে গঞ্জের বেশ কজন ব্যবসায়ীও হাজির ছিল। শুরু থেকেই হায়াত চুপচাপ। ভাবটা এমন—রায় যেন তার বিরুদ্ধেই যাবে।

গুলনাহারের দীর্ঘ অভিযোগ শুনল সবাই। তারপর অভিযুক্তের মতামত জানতে চাইল সালিশদাররা। হায়াত আগের মতোই চুপচাপ, শুধু তর্জনীর ঈশারা করল একজনকে। সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরনামা আর খাজনার কাগজ পেশ করা হলো সালিশদারদের সামনে। তাতে যা হওয়ার হলো, রায় পেল হায়াত তালুকদার। ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার হাসি ঝুলিয়ে বৈঠক থেকে উঠে গেল। যেন এরকম কত সালিশ সে দেখেছে জীবনে!

কিন্তু এসব হস্তান্তরনামায় বিশ্বাস করতে নারাজ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ। হায়াতের জাল কারবারের কথা জানা আছে সবার। দুর্ভিক্ষের বছর নওচান্দিয়ার বহু মানুষ বাস্তুভিটা এবং ধানি জমি অল্প টাকায় বন্ধক দিয়ে দেশান্তরি হয়েছিল। অনেকে ফিরে এসেছিল পরে, কিন্তু বন্ধকি জায়গা-জমি কেউ ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। হায়াতের এক কথা—সবই বাপু আমার কেনা সম্পত্তি। কাগজপত্র দেখতে চাও তো দেখো। তোমরাই তো স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে দলিলে টিপসই দিয়েছিলে। একটাও হারাইনি আমি, যত্ন করে রেখে দিয়েছি সব।

এসব হস্তান্তরনামা আর টিপসইর সবই যে ভুয়া, তা তো গ্রামবাসীর জানা কথা। সালিশে পেছন থেকে কেউ একজন 'জাল-জাল' বলে কয়েকবার হাঁকও দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনকে বলতে শোনা গেল, জাল হলে মামলা ঠুকছ না কেন? আদালত তো বাড়ির কাছেই।

জালাল মির্জা আদালতে মামলা ঠুকে দিতে চেয়েছিল, বারণ করল গুলনাহার। কী লাভ শত্রুতা বাড়িয়ে? কদিন বাঁচবে জালাল মির্জা! গুলনাহারকে তো একাই এই গ্রামে বসবাস করতে হবে। শত্রুতা বাড়ালে তখন কে দাঁড়াবে তার পাশে?

সালিশে জিতলে কী হবে, গুলনাহারের বাড়িঘরের জাঁকজমকের কাছে হেরে গেল হায়াত। গ্রামে এতদিন তার বাড়িটাই ছিল সবদিক থেকে সেরা। ভিন-গাঁয়ের কেউ বেড়াতে এলে দূর থেকে তার আলিশান বাড়িটা একবার না

BanglaBook.org

দেখে যেত না। কী এমন কারিশমা দেখাল দুই পয়সার কবিয়ালের বেটি, সবার মুখেই এখন কিনা তার বাড়ির সুনাম! হায়াতের ঈর্ষা তো হওয়ারই কথা। এরকম বাড়ি আর কয়টা আছে গ্রামে? বাড়ির পেছনে ধু-ধু মাঠ, বর্ষাকালে ঠিক ধর্মসাগরের মতো দেখায়। সামনের দিকে খানিকটা পথ, তারপরই সুধাবতীর উঁচু বাঁধ। আম-জাম-বেল-আমলকি—নানা গাছগাছালির সমাহার ওই বাঁধে। সেসব গাছ আড়াল করে রেখেছে গুলনাহারের বাড়িটা। ঝড়-তুফানের প্রাচীর।

আর ঘর? ময়নামতি থেকে আনা হয়েছে শাল-গর্জন-সিঁদুর কাঠ, ডাকাতিয়া পারের কাঠমিস্ত্রি আর দাঁদরা থেকে আনা হয়েছে দক্ষ বাঁশ-বেতের কামলা। চারপাশে নকশাকাটা দাফনার বেড়া, বড় বড় শালখুঁটি, গর্জনের চৌকাঠ, জামকাঠের টাঁসা-বাতা, কাঁঠাল কাঠের দরমা। আর? আর দরজা-জানালার খাঁজকাটা কপাটগুলো দেখে মনে হয় যেন এক ছোটখাটো জমিদারবাড়ি।

মাঝেমধ্যে ঈর্ষা ঘাই মারে হায়াতের মনে। হরিদশ্বে তার বিরুদ্ধে কখনো কেউ সালিশ ডাকার সাহস করেনি, তারু সরকারের বেটি কাঠকয়লার ছ্যাঁকা দিয়েছে তার মান-সম্মানে। হরিদশ্বে তার তালুকদারি নেই, আছে নওচান্দিয়ায়। ঠিক তালুকদারি বলা যায় না। জমিদারের কাছ থেকে আধা দ্রোন জমি পত্তনি নিয়েছে, এই যা। তাই তার আরেক নাম টাট্টু তালুকদার। উত্তরে যেখানে হরিদশ্বের সীমানা শেষ, সেখান থেকেই নওচান্দিয়ার সীমানা শুরু। হরিদশ্বের মানুষরা কেন যে তাকে পাত্তা দিতে চায় না, তার কোনো কারণ সে খুঁজে পায় না। সেদিন গ্রামের একজনের সঙ্গে খানিকটা মেজাজ দেখিয়েছিল। লোকটা মুখের ওপর বলে দিল, ঠাঁটবাঁট সব নওচান্দিয়ায় দেখান গিয়ে, এই গ্রামের কেউ আপনার গোলাম না।

অপমানটা হজম করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। নওচান্দিয়ার কেউ হলে নিশ্চিত সে মুখের গ্রাস কেড়ে নিত। হরিদশ্বের বেলায় সে অসহায়, জোঁকের মতো মেরুদণ্ডহীন। এক সময় এই গ্রামে তার দাদার অনেক আবাদি ছিল। পুরো একটা পরগণার সিকি ভাগের মালিক ছিল তার দাদা। মদ আর নারী—যৌবনে এই দুটোর পাল্লায় পড়ে সব খুইয়েছে হায়াতের বাপ রহমত।

গ্রামের মানুষদের আচার-আচরণ খেয়াল করে এখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে হায়াত—বাবা যা খুইয়েছে তো খুইয়েছে, আর এক কড়া জমিও সে হাতছাড়া করবে না। দশ বছর পরে হলেও সে হরিদশ্বে তালুকদারির পত্তন

BanglaBook.org

করবেই করবে। তারু সরকারের ভিটাটার মতো এরকম আর দু-চারটা হোক, মনসুর ভুঞ্ঞা আর কদিন, তার ছেলেটা তো উচ্ছন্নেই গেছে, তখন তার কাছ থেকেই খরিদ করে নেবে হরিদশ্বের তালুকদারিটা। পারলে এখুনি গিয়ে মনসুর ভুঞ্ঞার কাছে খরিদের প্রস্তাব রাখে, পাছে আবার কী মনে করে সে, তাই ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখতে হয়। ভুঞ্ঞার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে কুলাতে পারবে না। জমিদার অনিমেষ রায় ও রেসিডেন্ট বাবুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। নইলে কে ঠেকাত তাকে? উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ত না হরিদশ্বের ফকিরের বেটাদের!

প্রতিশোধ হিসেবে গুলনাহারের বিরুদ্ধে কুৎসা কম রটাল না হায়াত। সরকারের বেটিকে নিয়ে একটা গুজব শুরুতে অবশ্য সবার মুখে মুখে ছিল। তাতে অবিরাম ফুঁ দিয়ে গেছে হায়াত, তার জাল হস্তান্তরনামার মতো নানা জাল-কাহিনি সৃষ্টি করেছে। বলেছে, আরে কিসের ভুঞ্ঞা! সে তো একটা ডাকাত। সফর ডাকুর নাম শুনেনি এমন মানুষ নেই জুগিদিয়ায়। কোম্পানির সৈন্যদের পেঁদানি খেয়েই হয়ত এখানে পালিয়েছে। কদিন পর দেখবে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওই ডাকাইতটাও এই বাড়িতে হাজির হবে। আগের কথা ভালো বাবা, গ্রামে কিন্তু দস্যু-ডাকাতের জায়গা হবে না। গ্রামের মান-ইজ্জত বলে তো একটা কথা আছে।

কাহিনিটা কদিন সবার মুখে মুখে ফেরার পর যখন ডুবে যাওয়ার সময় হলো তখন আরেকটা কল্পকাহিনি সৃষ্টি করল হায়াত। সেই কাহিনি আরো আজগুবি। শুনে হাঁ হয়ে গেল লোকের মুখ। সবাই বলতে লাগল, তাহলে এই হলো ঘটনা সরকারের বেটির! দেখলে তো মনে হয় বায়েজিদ পীরের মা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

এভাবে একের পর এক কুৎসা রটিয়েই যায় হায়াত। তবে সেসব কেউ তার মুখ থেকে শোনে না, বলে বেড়ায় তার বিশ্বস্ত বর্গাচাষা দাউদ। তবু এসব কুৎসা যে হায়াতের মুখ থেকেই উৎপন্ন তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। তাই বলে আবার গুলনাহারকে নিয়ে তাদের কানাঘুষারও শেষ নেই। তাদের কাছে মনে হয়, এক অন্তহীন রহস্যময়ী নারী গুলনাহার। আজকাল কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে, গুলনাহার নাকি স্বর্ণের হাঁড়ি পেয়েছে। যেখানে সে এখন বাড়ি করেছে সেখানে আগে বৌদ্ধদের বসতি ছিল। লক্ষ্মণ রাজার আমলে যখন তাদের কচুকাটা করা হয় তখন কেউ কেউ সোনা-গয়না মাটির নিচে পুঁতে পুবের দেশে চলে যায়। পুকুর কাটাতে গিয়ে নিশ্চয়ই এরকম একটা কিছু পেয়েছে গুলনাহার।

তার কথা উড়িয়ে দেয় আরেকজন। বলে, আরে না, তুমি জানো মিয়া কচু। শোননি মাথাভাঙা তালগাছটার নিচে সাপেদের মিলন হতো?

তো?

তো আর কি, সাপের মাথার মণি পেয়েছে সরকারের বেটি।

এ্যাঁহ! সাপের মণি অত সোজা!

এভাবে কল্পকাহিনির ডালপালা কেবল গজাতেই থাকে। একটা ডাল শুকিয়ে গেলে আরেকটা তাজা হয়ে ওঠে। শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় গুলনাহারের। হায়াতের বোকামি দেখে তার প্রতি মায়া হয়। কোথাকার কোন সফর ভুঞা, এই নামের কেউ দুনিয়ায় আছে কিনা সন্দেহ, অথচ তাকেই কিনা ডাকাত বলে প্রচার করছে হায়াত! যা খুশি সে করুক। এখনো যে কেউ নটী-বেশ্যা বলেনি সেটা গুলনাহারের ভাগ্য।

তবু মাঝেমধ্যে খারাপ লাগে গুলনাহারের। অনেক চেষ্টা করেছে হায়াতে সঙ্গে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে, অথচ দিন দিন অকারণেই শত্রুতা বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে। শত্রুতা বাড়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে গুলনাহারের বদান্যতা। বড় মন তার। গ্রামের কেউ খেতে পাচ্ছে না? তবে এসো নতুন বাড়িতে, তারু সরকারের গুণধর মেয়ের হাত-পা ধরে ঝি-বাঁদির কাজে লেগে যাও। নিজে খাও আর ছেলেপিলের জন্য বাসন ভরে নিয়ে যাও। কেউ খাজনা দিতে পারছ না? তবে যাও গুলনাহারের কাছে। খুব ভালো মেয়ে গুলনাহার, গরিবের দুঃখ-কষ্ট একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ধারের টাকা কখন শোধ দেবে, না আদৌ দেবে না, সে পরের কথা। আপাতত জমিদারের খাজনা মেটাও। রোগ-শোকে কষ্ট করছ কেউ? তবে শরণাপন্ন হও দোদেল হামজার। সরকারের বেটির খুব বিশ্বস্ত লোক এই চাপাভাঙা লোকটা। প্রয়োজনে তার হাতে-পায়ে ধর গিয়ে। কবিরাজ বাড়ির খরচটা মেটানোর একটা ব্যবস্থা সে না করে ফেরাবে না।

কদিন আগে একটা ছেলে আমগাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙল। গরিবের ছেলে, কবিরাজ বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই ছেলের বাবার। খবর পেয়ে হামজার মারফত ছেলের বাবাকে ডেকে আনলো গুলনাহার। কিছু টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নিন, ছেলেটাকে কবিরাজবাড়িতে নিয়ে যান। লাগলে পরে এসে আরো নিয়ে যাবেন।

গুলনাহারের এসব বদান্যতার কারণে গুজবগুলো মেরুদণ্ড সোজা করে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তার বিস্তর সুনামের কাছে এসব দুর্নাম গৌণ হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে হাল ছেড়ে দেয় কৌতূহলীরা। যা-ই হোক না

BanglaBook.org

কেন গুলনাহার, তাতে কার কী? কার বগলে গন্ধ নেই? সে তো আর হায়াত তালুকদারের মতো কৃপণ নয়, আঙুলের ফাঁকে যার এক ফোঁটা পানিও সরে না। কারো পেটেও তো লাথি মারছে না গুলনাহার। এত সমালোচনা কেন? তার স্বামী হার্মাদ হোক বা দস্যু-ডাকাত, সে তো কাজ করছে ভালো। হিন্দু-মুসলমান সবাই সমান তার কাছে, বিপদে-আপদে কাউকে সে নিরাশ করে না।

উদয়াচল যা কেড়ে নিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়েছে গুলনাহারকে। এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের কথা তো সে কখনো কল্পনাও করেনি। বছরখানেক আগেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা তাকে অস্থির করে রাখত সারাক্ষণ। সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় থাকতেই সেই অস্থিরতার শুরু। শুনেছিল, বয়স বেড়ে গেলে নাকি মালকিনরা কোঠা থেকে নটীদের খেদিয়ে দেয়। তখন ফাঁস দিয়ে মরা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না তাদের। খুবই ভাগ্যবতী গুলনাহার, দু-বছর যেতে না যেতেই মহারাজের নজরে পড়ল। কিন্তু যখন রাজনটীর পদ হারাল, তখন শুরু হলো আবার সেই তামাদি অস্থিরতা। উদয়াচল ছেড়ে আসার পর তো সে জীবনের মায়াই ছেড়ে দিয়েছিল। বাঁচিয়ে দিলেন অজয় পণ্ডিত। এখন সবকিছু খোদার কুদরতই মনে হচ্ছে তার কাছে। তাকে সহায়তা করার জন্য যেন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল গোটা পৃথিবী। নইলে কি আর এত সহজে আরাম-আয়েশ আসে তার জীবনে?

এত সুখী গুলনাহার, তবু একটা গভীর দুঃখবোধ তার ভেতরে কাজ করে সবসময়। বোন দুটির কথা কখনোই সে ভুলতে পারে না। হরিদশ্বে ফিরে না এলে হয়ত তাদের কথা মনেই থাকত না। রোজ কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কজনের কথা মনে থাকে? এক জীবনে মানুষ যত কিছু দেখে সব যদি মনে রাখার দরকার হতো, তবে মস্তিষ্কের কোষে জায়গা হতো না। দরকারি স্মৃতিটি মনে রাখে মানুষ, বেদরকারিটি ভুলে যায়। এটাই জগতের নিয়ম। গুলনাহারও তেমনি ভুলে যেত দুই বোনের কথা। ভুলে গিয়েছিলও বটে। কিন্তু পুরনো শোক জাগিয়ে দিল পিতৃভূমি হরিদশ্ব। যেদিকে তাকায়, শৈশবের নানা স্মৃতি উঁকি দেয় তার মনে। এই মাটি যেন তাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে দিল। হয়ত মাটি নয়, জীবনের স্থিতিশীলতাই এখন আপনজনদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এত বড় বাড়ি, অথচ বাস করার মতো মানুষ নেই। একটা শূন্যতার ভেতর যেন তার বসবাস। এ শূন্যতার কূল-কিনারা নেই। প্রায়ই সে ভাবে,

BanglaBook.org

হায়, যদি একবার দেখা পেত বোন দুটির, তবে আর যেতে দিত না কোথাও। দরকার হলে ছেলেপিলে আর স্বামীদেরও এনে রাখত এই বাড়িতে। সেদিন হামজাকে বলল, চল না ভাই, একবার রঙসোনাপুর থেকে ঘুরে আসি। বোন দুটির জন্য বুকটা খুব জ্বলছে। একবার খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করছে।

হামজা বলল, আমি তো কিছুই চিনি না। কত বড় পরগণা রঙসোনাপুর, কোথায় গিয়ে খুঁজবে তাদের?

কত আর বড় হবে, কমলাঙ্কের মতো তো নয়। বজরা একটা তৈরি করে নিক, তারপর রঙসোনাপুর যাবে গুলনাহার। ভেবেছিল ঘরের কাজ শেষ হলে ছোটখাটো একটা বজরা তৈরির কাজ শুরু করবে। কী ভেবে আপাতত সেই পরিকল্পনা বাদ দিল। বজরায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর খুব শখ তার। প্রায়ই ভাবে, বর্ষায় যখন খাল-বিল একাকার হয়ে যায়, তখন বজরাটা সে বাড়ির পেছনে এনে রাখবে। পৌর্ণমাসীর রাতে হামজাকে নিয়ে চলে যাবে পুবে, বিল যেখানে পাহাড়ের পা ছুঁয়েছে। বিলের মাঝখানে গিয়ে ঢোল ধরবে হামজা আর গলা ছেড়ে গাইবে গুলনাহার। গানের রেয়াজ ছাড়া একদিনও চলত না তার, অথচ এখন সময়ই পায় না। নটীবৃত্তি ছাড়বে না বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা থেকে এখন সরে এসেছে। একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওসবে আর নিজেকে জড়াবে না কোনোদিন। যিনি তার জন্য এত কিছু করেছেন তার অনুরোধ তো রক্ষা তাকে করতেই হবে। তাই বলে গান সে ছাড়বে না। আসরে না হোক, নিজের ভেতর বাঁচিয়ে রাখবে সংগীত। শীতের মৌসুমটা যাক, একদিন হামজাকে শহরে পাঠিয়ে একটা তাম্বুরা আনাবে। ভেতরের কক্ষে বসে রেয়াজ করবে প্রতিদিন। গজল ও রাগ-সংগীতের দিকেই এখন তার আকর্ষণ। সংগীতের এই দুটি ধারায় মনোনিবেশ করবে এবার। মীরের গজলের খুব ভক্ত ছিলেন মহারাজ। মীরের গজলের ভাবই আলাদা। প্রেমের এক চিরন্তন রূপ যেন তার গজলগুলোতে ফুটে ওঠে। আর তাতে একটা অধরা আনন্দ জাগে শ্রোতাদের মনে। ঠিকঠাক মতো সব গুছিয়ে উঠতে পারলে বাড়িতে একটা সংগীতশালা খোলার ইচ্ছে আছে গুলনাহারের। হামজা শেখাবে বাজনা-বাদন, সে শেখাবে গান। তবে তা এখুনি নয়, গ্রামবাসীর মতিগতি আগে বুঝে উঠুক। আজ হয়ত বেশিরভাগ লোক তাকে ভালোবাসছে, তার প্রশংসা করছে। কাল যে তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে না তারা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মুসলমান পরিবারের সংখ্যা তো কম নয় গ্রামে, গান-বাজনাকে তারা সহজভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কদিন আগে একটা যাত্রাপালা হওয়ার কথা ছিল গ্রামে, কিন্তু কাদের মৌলবির বাধার

BanglaBook.org

মুখে তা আর হলো কই। বেশি বাড়াবাড়ি দেখলে বেশরা কাজের দায়ে তাকেও অভিযুক্ত করাটা বিচিত্র কী। এই কয় মাসে গুলনাহার বুঝে গেছে গ্রামের মানুষরা যতটা সহজ-সরল ঠিক ততটাই কুটিল। যতটা ধার্মিক, ঠিক ততটাই গোঁড়া।

তবে যে যা-ই বলুক, আগামী শরতে গঞ্জ থেকে ঢাকির দল ভাড়া করে আনবে গুলনাহার। তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবে রঙসোনাপুরের গ্রামে গ্রামে। ঢাক-ঢোলের বাজনা শুনে ছুটে আসবে শত শত মানুষ। তাদের উদ্দেশে তখন সে বলবে, তোমারা কি জানো আমার দুই বোনের খবর?

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন হাঁক দিয়ে জানতে চাইবে, কোন দুই বোন?

নাম তো জানি না ভাই। বাবার নাম তারু সরকার, সাকিন হরিদশ্ব।

এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ঠিকই একদিন পেয়ে যাবে দুই বোনের খোঁজ। তারা নিশ্চয়ই মায়ের হদিস জানে। যেখানেই থাকুক মনজুরি, তাকে এখানে নিয়ে আসবে গুলনাহার। সেগুন কাঠের একটা পালঙ্ক বানাবে মায়ের জন্য। পালঙ্ক থেকে নামতে দেবে না মাকে। তার জন্য দাসী রাখবে চারজন। মনজুরি আপত্তি করলে সে বলবে, জীবনে যত দুঃখ পেয়েছ, তার সমান সুখ ভোগ করো, মা।

কিন্তু আমি যে তোকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম মা! তুই কি আমাকে ক্ষমা করতে পারলি?

সেই কথা আর বলো না মা। আমি সব ভুলে গেছি। নতুন জন্ম হয়েছে আমার। তুমি আমার এই জনমের মা।

গুলনাহারের এসব কথাবার্তা শুনে হামজা হাসে। আমলে নেয় না খুব একটা। এসব কিছু গুলনাহারের অতি আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হয় তার।

মা-বোনের চেয়ে বাবার কথা বেশি মনে পড়ে গুলনাহারের। যখন তার কবিসত্তার কথা ভাবে, শ্রদ্ধায় তখন মাথা নত হয়ে আসে। যেদিন থেকে সে সংগীতকলা বুঝতে শিখেছে সেদিন থেকেই তারু সরকারের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হতে থাকে তার ভেতর। বাবার চেয়ে বাবার শিল্পসত্তাটাই বড় হয়ে ওঠে তার কাছে। ভেবেছে, কবিয়ালের ঘরে জন্মেছিল বলেই তো তার কণ্ঠ এত মধুর, সবাই এত সুনাম করে। শিল্প বুঝি রক্তের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হয়?

নির্জন দুপুরে যখন জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন মাঝে মাঝে কী যেন হয় গুলনাহারের। বেশ কদিন ধরে ব্যাপারটা সে খেয়াল

BanglaBook.org

করেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখে, বহেরা গাছটার তলা দিয়ে পাটের একটা থলে কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তার বাবা। পুবমুখী হাঁটছে বলে চেহারাটা ঠিক দেখা না গেলেও পাকা দাড়ি আর বাবরি চুল দেখে চিনতে ভুল করে না গুলনাহার। কিন্তু এই দেখল তো ফের শূন্যে মিলিয়ে গেল।

গুলনাহারের বুকের ভেতর দপাদপ শব্দ ওঠে। দু-হাতে চোখ কচলে সে আবার তাকায়। না, কেউ নেই কোথাও। তবে কি ঝিমুনি এসেছিল তার চোখে? আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে, চেতন ও অবচেতনের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখেছিল? না, তাও তো নয়। তবে? একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় সে।

প্রায় দু-মাস পরের কথা। রাতে গুলনাহার স্বপ্নে দেখল, সামনের ঘরে খাটের ওপর বসে আছে তার বাপ। কাঁসার কারুকার্যখচিত বাটা থেকে এক খিলি পান নিয়ে সে সামনে বসা আরেকজনের দিকে এগিয়ে দিল। গুলনাহারকে ডেকে বলল, তোর জেঠার দাঁত নেই মা, শক্ত কিছু চিবুতে পারে না, সুপারিটা ছেঁচে দে।

গুলনাহার জিজ্ঞেস করে, তিনি কে বাবা?

আরে কী বলে মেয়ে! গান গাস্ অথচ তাকে চিনিস না?

গুলনাহার লজ্জা পায়। তারু সরকার বলে, তার নাম শেখ মনোহর। ভাটির বীর শমসের গাজীর পুঁথি লিখেছেন তিনি। শুনিসনি তার নাম? পায়ে ধরে সালাম কর। বড় গুণী মানুষ, কবিরও কবি, আমাদের শিরোমণি।

শেখ মনোহরকে কদমবুচি করে সুপারি হাতে হেঁশেলে চলে গেল গুলনাহার। ফিরে এসে ঘরে কাউকে না দেখে উঠোনে নেমে দাঁড়াল। দেখল, বহেরা গাছটির নিচের জমিতে শুয়ে আছে বিশাল একটা সাপ। কয়েক ক্রোশ লম্বা। মাথা দেখা যায় তো লেজ দেখা যায় না। সাপটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার বাবা। মুখে তার রহস্যের হাসি। সাপটার কথা যেন মেয়ের কাছে থেকে লুকাতে চাচ্ছে সে। ভয়ে মূর্ছা যায় গুলনাহার। ঘুমের ভেতর চিৎকার করে বাবাকে ডাকে, চলে এসো বাপজান, গিলে খাবে তোমাকে। দেখছ না কত বড় হাঁ। আসো বাবা, তাড়াতাড়ি আসো।

তারু সরকারের মুখে সেই একই হাসি। বলে, ভয় পাস না মা। এই সাপ গোরস্তানে থাকে, জ্যান্ত মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। কবরের ভেতর পাপীদের শরীরটাকে লেজে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। সেই আছাড়ে সত্তর হাত মাটির নিচে দেবে যায় শরীর।

BanglaBook.org

কী বলো বাবা!

তারপর টেনে তুলে আনে আবার।

আবার টেনে তুলে আনে?

আবার দেয় আছাড়।

তারপর?

এইভাবে চলতে থাকে। এই গজব জারি থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

তারপর আর তারু সরকারকে দেখতে পায় না গুলনাহার। সেই বিশাল ভয়ঙ্কর সরীসৃপ ধীরগতিতে তার খোড়লের ভেতর ঢুকতে শুরু করে। যখন দেখল খোড়লটা ঠিক এই বাড়িরই নিচে, অকস্মাৎ শোয়া থেকে উঠে বসল গুলনাহার। বুকের ভেতর অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পায়। রেহেনার নাম ধরে হাঁক দিতে থাকে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রেহেনা এত রাতে গুলনাহারের ডাক শুনতে পায় না।

এই স্বপ্নটার কথা ভুলেই গিয়েছিল গুলনাহার। কদিন পর যখন একই স্বপ্ন আবারও দেখল, একটা তীব্র ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তাকে। হুবহু একই স্বপ্ন! কিছু মাত্র বেশকম নেই। নিশ্চয়ই এই স্বপ্নের পেছনে কোনো কারণ আছে।

সেদিন সকালে হামজাকে ডেকে বলল রাস্তার আশপাশে কোনো গর্ত আছে কিনা দেখে আসতে। কিছু বুঝতে পারে না হামজা। বলে, গর্ত দিয়ে কী করবে?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই ভিটায় বিষধর একটা সাপ আছে।

নতুন বাড়ি, সাপ আসবে কোত্থেকে?

না, নাই। তবু সন্দেহ লাগছে। একদিন ওখানে সাপেদের মিলন হতো।

হামজা হাসতে হাসতে বলে, ওসব মিথ্যা কাহিনি। মানুষকে সব প্রাণী ভয় পায়। যেখানে মানুষের বসতি সেখানে ক্ষতিকর কোনো প্রাণী থাকে না। থাকলেও তারা মানুষের ক্ষতি করে না।

তবু গুলনাহারের মনের সন্দেহ দূর করতে হামজা দেখতে গেল, কিন্তু সাপ-খোপের চিহ্নও দেখতে পেল না। রাস্তার পাশে শত শত খোড়ল। কাঁকড়া আর গুইসাপের বসতি ওসব খোড়লে। কোনটা সাপের, কোনটা কাঁকড়ার তার কিছু বোঝা যায় না। কতগুলোর মুখ বন্ধ করবে?

স্বপ্নের রেশ সহজে কাটতে চায় না গুলনাহারের মন থেকে। রাতে ঘর থেকে বেরোতে ভয় পায়। কেবলই মনে হয় এই বুঝি সাপটার লেজে পা পড়ল! আর মনে হয়, এই বুঝি জানালার ধারে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা।

BanglaBook.org

স্বপ্নের কথা এতদিন কাউকে বলেনি সে। ভয় যখন ধীরে ধীরে তার ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিল তখন হামজাকে না বলে পারল না। একদিন বলল, চরজোয়ারি থেকে গাড়লি ডেকে বাড়িটা বন্দিশা করে দিলে কেমন হয়?

কথাটা আমলে নিল না হামজা। বলল, সাপ কি জাদু-টোনার ধার ধারে? গাড়লিদের ওসব কারবার একদম ভুয়া, পয়সা রুজির ফন্দি।

তবু পীড়াপীড়ি করে গুলনাহার। জমিতে কামলা-মুনিষ রেখে চরজোয়ারি যাওয়ার ফুরসতই-বা কোথায় হামজার? একে তো চাষাবাদে অনভ্যস্ত, তার ওপর সে একা। নসির মণ্ডল না থাকলে তার পক্ষে একা এত জমি আবাদ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। যা-ই হোক, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে হলেও সহযোগিতা করছে নসির মণ্ডল। তিতাস এলাকার দিনঠিকা মুনিষ জোগাড় করে দিয়েছে, নিজের গোলা থেকে দিয়েছে বীজ। দেউড়িতে কামলা-মুনিষদের নিয়ে থাকে হামজা। বাড়ির ঘাটায় তার জন্য দেউড়িটা করে দেওয়া হয়েছে। বড়ঘরের সামনের কক্ষটিতে থাকতে বলেছিল গুলনাহার, রাজি হয়নি সে। বলেছে, আমি একা থাকতে চাই।

কেন, একা থাকবে কেন?

কামলা-মুনিষদের আওলাঘরে থাকতে নাই।

এই কথায় মনে কষ্ট পেয়েছিল গুলনাহার। কদিন হামজার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। করবে না? কে বলেছে হামজা এ বাড়ির মুনিষ? নিজেকে এরকম ভাবা মোটেই ঠিক হয়নি তার। এই পৃথিবীতে গুলনাহারের আপন বলতে তো একজনই, দোদেল হামজা। মায়ের পেটের ভাই নয়, চাচাতো-খালাতো-মামাতো বা ফুফাতো ভাইও নয়, রক্তের কোনো সম্পর্কই নেই, তবু তার চেয়েও আপন। এই সম্পর্কের কোনো লোকনাম নেই। বলা যায় সে তার শিল্পসঙ্গী। তার ঢোলের মিষ্টি বোলেই তো গুলনাহারের নাচ এত আবেদনের সৃষ্টি করত দর্শকদের মনে। তার চেয়ে বড় কথা, অসংখ্য রাতের নীরব সাক্ষী এই হামজা। জলসা শেষে শোবার ঘরে রোজ রাতে কী ঘটেছে, তা নিয়ে কোনোদিন তার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছিল না। মাস শেষের মাইনে ছাড়া অন্য কোনো দাবি নিয়ে গুলনাহারের সামনে দাঁড়ায়নি কখনো। সবসময়ই ভেবেছে গুলনাহারই তার সারা জীবনের আশ্রয়। তাতেই স্থির এখনো। এই আশ্রয় সে কিছুতেই হারাতে চায় না। মহারাজের দেওয়া টাকাগুলোও সে গুলনাহারের হাতে তুলে দিয়েছে। টাকা দিয়ে কী করবে সে? খবর পেয়েছে, বাবা-মা কেউ আর বেঁচে নেই। ছোট দুই ভাই বিয়ে-শাদি করে সংসারী হয়েছে। শুধু সংসারী হতে পারল না সে। গুলনাহার কতবার বলেছে,

BanglaBook.org

বয়স তো আর কম হলো না, এবার একটা বিয়ে করো। বুড়োকালে মেয়ে কে দেবে তোমাকে। তখন আফসোসের সীমা থাকবে না।

কিন্তু এখন বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই হামজার। আরো কয়েকটা বছর যাক। এটা তো নিজেরই সংসার। সংসারটাকে এখনো ঠিকমতো গুছিয়ে তুলতে পারেনি। নদীর ওপারে যে জমিটা কিনেছিল, সেটার দখল এখনো বুঝে পায়নি। কেনার পরই জানতে পারে হস্তান্তরনামায় ঘাপলা আছে। জমির দাবিদার দুই ভাই। জালাল মির্জার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। ওই ঝামেলাটা যাক, তারপর না হয় একটা মেয়ে দেখতে বলবে মির্জাকে।

গাড়লি আসার অপেক্ষায় থাকল না গুলনাহার, এরই মধ্যে বাড়িতে বড়সড় একটা জেয়াফতের আয়োজন করে ফেলল। তার মন বলল, নিশ্চয়ই কবর-আজাব হচ্ছে তার বাবার। সে-কারণেই এসব দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। বাবার রুহের মাগফিরাতের জন্য সন্তানের তো কিছু করা উচিত। তা ছাড়া নতুন বাড়ি করেছে, একবেলা ফকির-মিসকিন না খাওয়ালে বালা-মুসিবত দূর হবে কেন? আরো আগেই জেয়াফতটা দেওয়া উচিত ছিল। জালাল মির্জাও কিছু বলল না, এত কিছু কি আর বোঝে গুলনাহার?

বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত করে এল হামজা। আশুরার দিন দুপুর বেলায় গ্রামের প্রায় আড়াইশ মানুষ এসে পেট ভরে খেয়ে গেল। জালাল মির্জার সঙ্গে এল গঞ্জের বড় বড় আড়তদাররা। হায়াত তালুকদারও না এসে পারল না। জেয়াফতে শত্রু-মিত্র নেই, এটা পরকালের ব্যাপার, এখানে রুহের মাগফিরাতই বড় কথা। তারু সরকারের সঙ্গে তো হায়াতের কোনো শত্রুতা ছিল না। তার মেয়ের সঙ্গেই-বা এমন কী আর? টুকটাক মনোমালিন্য হয়েছে আগে, সেসব কি এতদিন সে মনে পুষে রেখেছে?

বেশ কিছুদিন ধরে বৈষমপুর যাওয়ার জন্য গুলনাহারকে তাগাদা দিচ্ছিল জালাল মির্জা। দূরের পথ নয় বৈষমপুর। সুধাবতীর দুই ক্রোশ ভাটিতে সরু যে খালটি নওচান্দিয়ার ধার ঘেঁষে উত্তরদিকে চলে গেছে, তারই পশ্চিমে মাঠের মাঝখানে লম্বা জারুল গাছটা থেকে বৈষমপুরের সীমানা শুরু। গঞ্জের ঘাট থেকে নৌকায় করে এক প্রহরের পথ। গরুর গাড়িতে বা পালকিতেও প্রায় একই সময় লাগে। আগের বউয়ের সুবাদে বৈষমপুর জালাল মির্জার শ্বশুরবাড়ি। গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় খালের ওপারে ছিল তার

BanglaBook.org

শ্বশুরবাড়ি। ছিল মানে কি, আছে এখনো। তবে মির্জার সঙ্গে ওই বাড়ির কারো যোগাযোগ নেই। শালারা খোঁজ-খবর নেয় না। বউ মারা যাওয়ার পর জালাল মির্জা মাত্র একবার ওদিকে গিয়েছিল। জাহান কলন্দরের আমলে মাসে দু-মাসে একবার যাওয়া হতো। তার মৃত্যুর পর সেই যে জানাজা দিয়ে এল আর যায়নি। অবশ্য না যাওয়ারই কথা। সে তো আর জাহান কলন্দরের হাতে-হাত রাখা মুরিদ নয়। চাকলা রৌশনাবাদের সব গ্রামেই দু-চারজন করে মুরিদ আছে জাহান কলন্দরের। কুঁচিমারা গোল টুপির নিচে লম্বা বাবরি চুল দেখলেই কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না লোকটা কোন পীরের মুরিদ। মুরিদ হওয়ার ইচ্ছা কখনো ছিল না মির্জার। প্রতি বিষ্যুদবার রাতে দরগায় জিকিরের মাহফিল হতো। কমলাঙ্ক, রঙসোনাপুর, দেবিদ্বার, কচুয়া বা আরো দূর-দূরান্ত থেকে মুরিদারা গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে চলে আসত সেদিন। তাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে জালাল মির্জাও যেত। এশার নামাজের পর শুরু জিকির চলত ভোর পর্যন্ত। শত শত মুরিদের সমস্বরের ইল্ ইল্ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতো বৈষমপুর। খানিক পর পরই মূর্ছা যেতেন জাহান কলন্দর। মুরিদরা মূর্ছা বলত না। তাদের মতে, পীর তখন পাক মাওলার দিদারে মশগুল হতেন। তার দেখাদেখি আশেকানদের অনেকের দেহও ভূপাতিত হতো। চারদিকে এত মানুষের মুণ্ডু দোলানো আর মূর্ছা যাওয়ার দৃশ্য দেখে ভয় লাগত জালালের। কেবলই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু জাহান কলন্দরের মুরিদ হওয়ার সৌভাগ্য হলো না তার। কলন্দরিয়া পীর আবার যাকে-তাকে মুরিদ বানাতেনও না। স্বভাব-চরিত্রে সাচ্চা হওয়া ছাড়া কাউকে তিনি বয়েত দিতেন না।

এই ভাটির দেশে সুনাম আছে কলন্দরিয়া তরিকার পীরের। পানামনগর, মেহেরকূল, পদুয়া, চাকলা, দাদরা, জুগিদিয়া, ভুলুয়া, হিঙ্গুলি—এসব অঞ্চলে ডজনখানেক খলিফা আছে তার। বাহরাম কলন্দরের বাবা জাহান কলন্দর, তার বাবা ঈমান কলন্দর, তার বাবার পরদাদা অর্থাৎ বাহরাম কলন্দরের পরদাদার পরদাদা যবনরাজা বখতিয়ার খিলজির আমলে পশ্চিম দেশ থেকে এই ভাটির দেশে এসেছিলেন। কলন্দরিয়া পীরেরা কোথাও থিতু হতে পারতেন না। আজ এ গ্রামে তো কাল ওই গ্রামে, পরশু আবার আরেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। বাহরাম কলন্দরের পরদাদার একটা মস্ত হাতি ছিল। ছয়টি সমুন্দ-ঘোড়ার বিনিময়ে জাজিনগরের মহারাজের কাছ থেকে হাতিটি খরিদ করেছিলেন। সেই হাতির পিঠে চড়ে তিনি পানাম থেকে জুগিদিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। বৈষমপুরে এসে

BanglaBook.org

খিতু হয়েছিলেন জাহান কলন্দরের বাবা ঈমান কলন্দর। খিতু অবশ্য হতে পারতেন না, যদি না তার বাবার পরদাদার ঈশারা থাকত। সেই গূঢ় কেরামতির কথা জাহান কলন্দরের খাস মুরিদরা ছাড়া আর করো জানার কথা নয়।

ঈমান কলন্দরের বাবা পূর্বপুরুষদের ধর্ম প্রচারের ঈমানি দায়িত্ব ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে বহু ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তাতে নাখোশ হলেন তার বাবা ও বাবার বাপ-দাদারা। নাখোশ হলেও ওয়ারিশকে তারা বদ্‌দোয়া দেননি। তার মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন ছেলে ঈমান কলন্দর। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলেই তো আর নিজেকে পীর হিসেবে জাহির করতে পারবেন না। কারণ, মাঝের এক পুরুষ যে দুনিয়ার ধোঁকাবাজিতে পড়ে পীরালি ছেড়ে দিয়েছিল! ফলে বাবার ভুলের মাশুল দিতে হলো পুত্রকে। খেলাফত নিতে গেলেন কসবার মশহুর পীর মোজফফর শাহের কাছে। মোজফফর শাহ বললেন, এমনি এমনি যে তোমাকে খেলাফত দেওয়া যাবে না!

কী করতে হবে বলুন হযরত, এই বান্দাহ আপনার গোলাম হয়ে থাকতে রাজি।

এক কঠিন শর্ত দিলেন মোজফ্‌ফর শাহ। বললেন, বছরখানেক খানকায় থেকে আমার খেদমত করতে হবে তোমাকে।

কী খেদমত?

বিশেষ কিছু না, কয়েক পাল ছাগল-ভেড়া আছে আমার, সেগুলোর দেখভাল করতে হবে।

আপত্তি করলেন না ঈমান কলন্দর। কেন করবেন? খেলাফত তো আর কাঁঠাল গাছের পাতা নয় যে গাছ থেকে ছিঁড়েই হাতে ধরিয়ে দেবে। খেলাফত পেতে হলে মুর্শিদের বিস্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। রাখালের কাজ দিতে চাচ্ছেন হযরত, এটাও যে তার বিশেষ কোনো পরীক্ষা নয়, তা নিশ্চিত করে কে বলবে?

কথামতো খেদমত শুরু করলেন ঈমান কলন্দর। মাঠে-ঘাটে কাটতে লাগল তার দিন। রাতে দু-দণ্ড ঘুমানোর জন্য জায়গা পেলেন মুর্শিদের গোয়ালঘরে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের গোরা রং কালো হয়ে গেল, চিতে পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেল ধবধবে সাদা পিরান।

এই করে ছয় মাস কেটে যাওয়ার পর একদিন 'বায়তুলখালার' মেথরকে ডাকলেন মোজফফর শাহ্। একটা গুরুদায়িত্বের ভার দিলেন তার উপর। কী

BanglaBook.org

সেটা? তেমন বিশেষ কিছু না, কাল ভোরে যখন পায়খানার মল ভাগাড়ে ফেলার জন্য নিয়ে যাবে সে, তখন একটুখানি মল ঈমান কলন্দরের পিরানে লাগিয়ে দিতে হবে। কাজটা করতে হবে খুব হুশিয়ারে। এমনভাবে করতে হবে যাতে ঈমান কলন্দর কিছুতেই বুঝতে না পারে কাজটা যে ইচ্ছাকৃতভাবেই হয়েছে।

দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে 'জি হযরত' বলে বিদায় নিল খাদেম। কাজটা একটু ঝামেলার হলেও হযরতের হুকুম অমান্য করার সাধ্য নেই তার। প্রথমে সে খানিকটা অবাক হয়েছিল, একজনের পরনের কাপড়ে জেনেশুনে গু লাগিয়ে দেবে এটা কেমন কথা! পরে নিজের গোস্তাকির জন্য তওবা পড়েছে। কারণ, হযরত তো শিশু নন, যা কিছু বলেন বা করেন তার পেছনে নিশ্চয়ই বড় কোনো মাজেজা আছে।

পরদিন ভোরে এশরাকের নামাজ আদায় করে ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হলেন ঈমান কলন্দর। ওদিকে পায়খানার মল নিয়ে ভাগাড়ের দিকে চলল খাদেম। দ্রুত কাছাকাছি গিয়ে ভাণ্ডটা সামান্য কাৎ করে সে খানিকটা মল ঈমান কলন্দরের পিরানে ঢেলে দিল। ঈমান কলন্দর তো রেগে একসার। বলতে লাগলো, জানো আমি কার পুত্র? তোমার মতো ডজন ডজন মালি-মেথর আমার বাড়িতে কাজ করে। পায়খানা পেশাব নিয়ে তো দূরের কথা, কখনো তারা কাছে ঘেঁষতেও সাহস করে না। বলেই কয়েকটা চড় লাগিয়ে হেস্তনেস্ত করে ছাড়লেন খাদেমকে। খাদেম বেচারা কোনো প্রতিবাদ করল না। কারণ প্রতিবাদ করা হযরতের বারণ। মাথা নিচু করে ফিরে গিয়ে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হযরতকে জানাল সে। শুনে চুপ করে থাকলেন মোজফফর শাহ্।

এরই মধ্যে কেটে গেল আরো ছয় মাস। আবার ডাকা হলো খাদেমকে। একই ঘটনা আবারও ঘটাতে হবে। তবে মলটা এবার আগের তুলনা খানিকটা বেশি লাগাতে হবে।

পরদিন ভোরে যথারীতি হুকুম পালন করল খাদেম। এবার আর ঈমান কলন্দর কিছুই বললেন না, কিছুই করলেন না, কেবল চোখ দুটি লাল করে তাকিয়ে থাকলেন খাদেমের দিকে।

দ্বিতীয় ঘটনার পর আরো ছয় মাস চুপচাপ থাকলেন মোজফফর শাহ্। এদিকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জোগাড় ঈমান কলন্দরের। এটা কেমন পরীক্ষা? আর কত কাল ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকতে হবে?

BanglaBook.org

তারপর একদিন খাদেমের প্রতি আবার একই হুকুম এল। এবার ভাণ্ডের সব মল ঈমান কলন্দরের গায়ে ঢেলে দিতে হবে। খাদেম তো ভয়ে অস্থির। মেরে এবার নির্ঘাত তুলোধুনো করে ছাড়বেন ঈমান কলন্দর। ওরে বাবা! গেলবার চোখ দুটো থেকে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল। কিন্তু কিছুই করার নেই বেচারা খাদেমের, হযরতের হুকুম শিরোধার্য। কতদিন ধরে সে খেলাফত পাওয়ার আশায় হযরতের বায়তুলখালার মল সাফ করে আসছে। আর মাত্র কয়টা দিন, এবার নিশ্চয়ই হযরত নেকনজর দেবেন তার প্রতি।

সেদিন ভোরে ইলশেগুড়ি হচ্ছিল। ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে যথারীতি বের হলেন ঈমান কলন্দর। না দেখার মতো করে পিছে পিছে চলল খাদেম। কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ কিছু একটার সঙ্গে পা লেগে পড়ে যাওয়ার ভান করে ভাণ্ডের সমস্ত মল ঢেলে দিল ঈমান কলন্দরের গায়ে। মলের আঠালো রস আর বৃষ্টির পানিতে জবুথবু হয়ে গেলেন ঈমান কলন্দর। সাদা পিরানে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে গেল। পেছনে ফিরে দেখলেন বেচারা খাদেম উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হায় হায় বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। দ্রুত খাদেমকে টেনে তুলে বললেন, ভাই, আপনার লাগেনি তো? দেখি দেখি কোথায় ব্যথা পেয়েছেন?

খাদেমের কাঁইকুঁই থেমে যায়। বিস্ময়ে সে ঈমান কলন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলন্দরের চেহারায় সে তখন নূরের ঝলকানি দেখতে পায়। মোজফফর শাহের এ কী কেরামতি! রিপুতাড়িত মানুষকে তিনি কিনা ফেরেশতা বানিয়ে ছাড়লেন!

গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে হযরতের কক্ষে গিয়ে ঈমান কলন্দরের এই অলৌকিক পরিবর্তনের কথা জানাল খাদেম। শুনে হাসলেন মোজফফর শাহ। সেই হাসির মধ্যে কী গূঢ়ার্থ নিহিত, তার কী জানে জাহেল খাদেম।

এতসব কঠিনতর পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়ার পরও খেলাফত পেলেন না ঈমান কলন্দর। ভাবলেন, আরো কিছুদিন বুঝি ছাগল-ভেড়ার পালের পিছে থাকতে হবে তাকে। এক বছরের জায়গায় দুই বছর কেটে গেল, অথচ মোজফফর শাহ কিছুই বলছেন না। না বলুক, অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই তার।

একদিন পদুয়া যাত্রার আয়োজন করলেন মোজফফর শাহ। সেখানকার এক খলিফার বাড়িতে হালকায়ে জিকিরের মাহফিল হবে। দশজন মুরিদ আর দুজন খলিফাকে সঙ্গে নিলেন। যাত্রার আগে পাটের রশি দিয়ে শক্ত করে ঈমান

BanglaBook.org

কলন্দরের হাত দুটো বাঁধা হলো। রশির মাথাটা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো হযরতের তেজি ঘোড়ার গলায়। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন মোজফফর শাহ, কষে চাবুক লাগালেন ঘোড়ার পিঠে। টগবগ টগবগ ছুটতে শুরু করল ঘোড়া আর পেছনে ধেয়ে চললেন ঈমান কলন্দর। ঘোড়া ছুটছে, ছুটছেন কলন্দর। পথে কিছুক্ষণ জিরোয়, তারপর আবার ছুটে চলে ঘোড়া।

এভাবে ছুটতে ছুটতে জলমহলার কাছাকাছি এলে ঈমান কলন্দরের শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়া যে থামে না! উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই টেনে-হিঁচড়ে টেনে চলল ঘোড়া। বুক, পিঠ, উরুর চামড়া ছড়ে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। হায় হায় রব উঠল মুরিদদের মুখে, অথচ নির্বিকার মোজফফর শাহ। কারো সাধ্য নেই হযরতকে বাধা দেওয়ার।

ঘোড়া তখন বৈষমপুরের কাছাকাছি, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হ্রেষা ধ্বনি তুলে জারুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ঈমান কলন্দরের তখন বেহুঁশ হাল। মোজফফর শাহ দেখলেন, গাছের মগডালে সদা আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছেন এক দরবেশ। সেদিকে তাকিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। আওয়াজ এল—রে পাষাণ মোজফফর, আমার ওয়ারিশের সাথে তুই এ কী ব্যবহার করছিস?

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন মোজফফর শাহ, তায়াম্মুম করে বসে গেলেন মোরাকাবায়। কেঁদে কেঁদে সারা বেলা পার করলেন।

মোজফফর শাহের মুরিদদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, ঘোড়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে, শরীরের চামড়া ছড়ে যেতে এবং রক্তের স্রোত বইতে বইতে এলমে মারেফাতের চার তব্‌কা অতিক্রম করে পঞ্চম তব্‌কার দরজায় উপনীত হয়েছিলেন ঈমান কলন্দর। আর একটি মাত্র তব্‌কা অতিক্রম করতে পারলে তিনি হতেন যুগশ্রেষ্ঠ দরবেশ, অলিকুলের শিরোমণি, তার নামের আগে যুক্ত হতো 'পিরানে পীর দস্তগীর' উপাধি, সাত আসমান এবং সাত জমিন তার নামে ধন্য ধন্য করত। কিন্তু তার বাবার পরদাদা পথ আগলে দাঁড়ানোয় শেষ তব্‌কাটি অতিক্রম করতে পারলেন না।

গভীর রাতে মোরাকাবা ত্যাগ করলেন মোজফফর শাহ। মুরিদদের সাক্ষী রেখে তখনই জারুলতলায় বসে ঈমান কলন্দরকে খেলাফত দিলেন। অসিয়ত করলেন, এখানেই যেন বসতি পত্তন করে ঈমান কলন্দর। কারণ, এই জারুলতলাতেই তার বাবার পরদদাদা জিন্দাপীর সশরীরে জাহির হয়েছিলেন, আর এখানেই তিনি পেয়েছেন মোজফফর শাহের খেলাফত।

BanglaBook.org

সেই যে থিতু হলেন ঈমান কলন্দর, সারা জীবনের জন্য আর কোথাও গেলেন না। এখানে থেকেই তিনি ইসলামের বাণী ছড়িয়েছেন বিভিন্ন পরগণায়। তারতিল-মোরাকাবায় বসে পাপী-তাপী মানুষদের জন্য খোদার দরবারে ফরিয়াদ করেছেন। ধীরে ধীরে তার কেরামতের কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিকে দিকে, তার হাতে বয়েত নিতে আসতে শুরু করল শত শত মানুষ। জালাল মির্জা তখনো শিশু, আট-নয় বছর বয়স হবে বুঝি, কামাল মির্জার সঙ্গে একবার এসেছিল ঈমান কলন্দরের কাছ থেকে পানিপড়া নিতে। সেই একবারই দেখেছে পীরকে। এর বছরখানেক বাদেই এন্তেকাল করেন তিনি।

সেই ঈমান কলন্দরের ওয়ারিশ বাহরাম কলন্দর। বাপ জাহান কলন্দরের মতো পীর এখনো হতে পারেননি তাতে কি? হতে কতক্ষণ? চল্লিশ বছরের আগে তো নবীরাও নবুয়ত পাননি।

জালাল মির্জার ইচ্ছা গুলনাহার একবার গিয়ে বাহরাম কলন্দরের দোয়া নিয়ে আসুক। সবই তো হয়েছে তার, এবার ধর্মকর্মের দিকে মন দিক। কোম্পানির সৈন্যরা সফর ভুঞার সাথে তাকেও তো মেরে ফেলতে পারত, খোদার রহমতে বেঁচে গেছে। সেই শুকরিয়া আদায় না করলে খোদা বেজার হবেন না?

জালাল মির্জার কাছে কলন্দর পীরের গুণগান শুনতে শুনতে তার এক রকম ভক্ত হয়ে গেছে গুলনাহার। আর কয়টা দিন যাক, তারপর তহুরা মামিকে নিয়ে বজরা ভাড়া করে চলে যাবে বৈষমপুর। হুজুরের সঙ্গে দেখা করুক বা না করুক, দরগার ফকির-মিসকিনদের কিছু দান খয়রাত করে আসবে, এমন ইচ্ছা তার। কিন্তু সেই কয়টা দিন আর শেষ হয় না তার। তাতে রাগ ওঠে জালাল মির্জার। মনে মনে বলে, আল্লা-খোদা পীর-আউলিয়ার কী বুঝে সরকারের বেটি। বাবা ছিল কবি, জামাই ছিল ধনী, অলি-আল্লার সঙ্গ তো পায়নি জীবনে, তাদের মাজেজার কী বুঝবে সে?

জালাল মির্জার পীড়াপীড়িতে অবশেষে বৈষমপুর যেতে রাজি হলো গুলনাহার। এত করে বলছেন, মুখ রক্ষার খাতিরে হলেও তো একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু যেদিন যাবে বলে মনস্থির করল সেদিনই জয়গুনপুর থেকে অজয় পণ্ডিতের চিঠি পেয়ে বৈষমপুর যাত্রার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মাসখানেক আগে চিঠি পাঠিয়েছিল গুলনাহার, জবাব এল এতদিন পর। এতদিন লাগারই কথা। রানাররা তো আর কমলাঙ্ক থেকে সরাসরি জয়গুনপুর যায় না। চিঠিপত্র নিয়ে প্রথমে রাজধানী উদয়াচল, তারপর দু-

BanglaBook.org

একদিন জিরিয়ে কিংবা হাতবদল হয়ে চিঠিপত্র জয়গুনপুর যায়। ঘরদোর তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর মন্দিরের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছিল গুলনাহার। কোনো জবাব আসেনি। ভেবেছে, কোথায় সেই অজগাঁয়ের পরিত্যক্ত মন্দির, এত দুর্গম এলাকায় কি আর রানার যায়? তাই সে বুদ্ধি করে নিজের নাম গোপন রেখে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিল উদয়াচলে রামগঙ্গা বিশারদের ঠিকানায়। বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে, ঠিক দেড় মাসের মাথায় অজয় পণ্ডিতের জবাব এল। লিখেছেন, আগামী দু-একদিনের মধ্যেই বন্ধু রামগঙ্গা বিশারদকে নিয়ে তিনি হরিদশ্বে বেড়াতে আসছেন।

অতিথিবরণের প্রস্তুতি শুরু করল গুলনাহার। কী সৌভাগ্য তার, এত বড় কবিকে নিয়ে তার বাড়িতে আসছেন অজয় পণ্ডিত! রাজকবি রামগঙ্গা বিশারদ, এই বাড়িঘর যেন তার উপযুক্ত নয়। তাকে কোথায় বসতে দেবে গুলনাহার! অতিথিসেবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল সে। শুরু হলো ঘরদোর ঝাড়া-মোছার কাজ। কয়েকজন দাসী লেগে গেল দুটি নতুন নকশীকাঁথা বোনার কাজে। কয়েক সের বালাম চাল কিনে আনা হলো উত্তরপাড়া থেকে। অজয় কাকা আসুক, গ্রামের সবচাইতে মিষ্টি তালটা কিনে আনা হবে তখন। তালের রস আর দুধ দিয়ে বালাম চালের ভাত তার খুব পছন্দের খাবার। হামজাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো গঞ্জে। একটা বড় খাসি, চার-পাঁচটা রাতামোরগ আর কয়েক জোড়া কবুতর কিনে আনা হলো। তারা এলে দু-চার দিন কি থাকবেন না? সবকিছুর আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে।

অজয় পণ্ডিতের আসার খবর শুনে জালাল মির্জাও বৈষমপুর যাওয়ার কথা ভুলে গেল। কতদিন পর দেখা হবে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে! দুদিন গুলনাহারের বাড়িতে থাকলে তার বাড়িতে থাকবে আরো দুদিন। তাদের সম্মানে এই গ্রামে বড়সড় একটা কবিগানের আসরের আয়োজন করা হবে। কোথায় কোথায় কবিয়ালের দল আছে, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করল। জমিদার অনিমেষ রায় এবং কালেক্টর মেকগুইয়ার বাবুকেও নিমন্ত্রণ করা হবে মেলায়। তারা এলে কোথাকার কোন কাদের মৌলবি কি আর বাধা দেওয়ার সাহস পাবে? বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন তারা। গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে জালাল মির্জার। সত্যি এবার একটা তেলেসমাতি কারবার দেখাবে সে এই গ্রামে। সালিশে হায়াত তালুকদারের কাছে হেরে গিয়ে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল তার মনে, এবার তার খানিকটা হলেও উপশম হবে। মনে মনে বলে, শালা তালুকদার, তোমার গ্রামে মেলা

BanglaBook.org

করব আমি আর তুমি দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। কেউ পুছবে না তোমাকে। গ্রামের সবাই জালাল মির্জার নামে ধন্য ধন্য করবে। কবি গানের কী বোঝ তুমি মূর্খ তালুকদার?

এলাহাবাদের জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সঙ্গে যে গুলনাহারের কথিত স্বামী সফর ভুঞার সম্পর্ক ছিল, ভাগ্যিস সে-কথাটি জালাল মির্জা কাউকে বলেনি। বললে এখন সুড়সুড় করে তলের খবর বেরিয়ে পড়ত। সত্য-মিথ্যা পরের কথা, কোম্পানির সৈন্যরা প্রথমে বাড়িতে এসে বেঁধে নিয়ে যেত গুলনাহারকে, গুপ্তচররা লেগে যেত প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের কাজে। পরে যখন জুগিদিয়ায় সফর ভুঞা নামক কারো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না, তখন গুলনাহারের কথার সত্যতা নিয়ে জালাল মির্জা তো বটেই, গ্রামের মানুষদের মধ্যেও একটা সন্দেহের সৃষ্টি হতো।

জালাল মির্জাই খবরটা আনলো, জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী নাকি এখন কমলাঙ্কের বন্দিশালায়। রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে বন্দী করেছে কোম্পানির সৈন্যরা। খবরটা শুনে আঁতকে উঠল গুলনাহার। সিরসির করে উঠল দুই চোয়াল। চোখে-মুখে অজানা ভীতি নিয়ে জালাল মির্জা জানতে চাইল, মোহাম্মদ আলীর সাথে তোমার স্বামীর যে সম্পর্ক ছিল সেকথা কাউকে বলোনি তো, মা?

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল গুলনাহার। বলল, আপনাকে ছাড়া তো কাউকে বলিনি। আপনিও তো বলেননি, তাই না?

জালাল বলল, আল্লার কী কুদরত দেখ, শুধু এই কথাটা আমি কাউকে বললাম না। নইলে এখন কী যে হতো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জালাল মির্জা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হলো গুলনাহারের। এই সরল মনের মানুষটার সঙ্গে কিনা সে একের পর এক মিথ্যা বলে যাচ্ছে!

জালাল বলল, তারপরও সাবধান থেকো, মা। কে কার শত্রু তা তো বলা যায় না।

জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বন্দী হওয়ার খবর শুনে গুলনাহারের খারাপ লাগল। চাকলা রৌশনাবাদের এই এক জমিদার, যাকে জাজিনগরের মহারাজ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য খুব ভালোবাসতেন, মাঝেমধ্যে ডেকে আনতেন রাজধানী উদয়াচলে। বহু বছর চাকলা রৌশনাবাদ জাজিনগরের

BanglaBook.org

মহারাজের অধীন থাকলেও দুর্ভিক্ষের এক যুগ পর কোম্পানি সরকারের খাস শাসনে চলে যায়। ফলে মহারাজ দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্যও শাসনভার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে বার হাজার টাকা উপস্বত্ব পেতেন তিনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার আগে কোম্পানি সরকার অবশ্য চাকলা রোশনাবাদের শাসনভার আবার মহারাজকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রেসিডেন্ট জন বুলারের বিরোধিতার কারণে হয়নি। তাতে মহারাজের সঙ্গে রোশনাবাদের অনেক জমিদারের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়লেও মোহাম্মদ আলী চৌধুরীই সম্পর্কটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সুবাদেই তাকে চিনত গুলনাহার। চিনত বলেই তো তার সঙ্গে কোথাকার কোন সফর ভূঞাকে জড়িয়ে জালাল মির্জার কাছে অভিনব গল্পটা ফাঁদতে পেরেছিল।

মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে গুলনাহার প্রথম দেখেছিল উদয়াচল ছেড়ে আসার বছর পাঁচ আগে। রাজ্যের কোনো জমিদারকে নিয়ে মহারাজ সাধারণত জলসায় আসতেন না। কিন্তু সেই রাতের জলসায় দাড়িওয়ালা নম্র, ভদ্র এবং গম্ভীর প্রৌঢ় মানুষটির ভাব-ভঙ্গিমা লক্ষ করে গুলনাহার খানিকটা অবাকই হয়েছিল। রাত আড়াই প্রহর পর্যন্ত মীরের গজল চলল। বাম হাতের তালুর ওপর মাথাটা রেখে চোখ বন্ধ করে লোকটি শুনেই গেলেন, একবারও গুলনাহারের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না। নহবৎখানায় কেউ আসে নটীর রূপসুধা আহরণের লোভে আর কেউ আসে সংগীতসুধা আহরণের লোভে। মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর চেহারা দেখেই গুলনাহার আন্দাজ করতে পেরেছিল তিনি আসলেই সংগীতের একজন প্রকৃত সমঝদার।

পরে হামজার কাছ থেকে তার পরিচয় জানতে পেরে যেচে গিয়ে পরিচিত হয়েছিল গুলনাহার। তার সেই কথাটি এখনো মনে আছে—সংগীত যে আসলেই মানুষের মন পবিত্র করে তা তোমার গান শুনলেই বোঝা যায়।

অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খানিকটা লজ্জা পেয়েছিল গুলনাহার। বলেছিল, গজল বুঝি আপনার খুব প্রিয়?

গজল কার না প্রিয়?

গুলনাহার বলল, আপনের যখনই ইচ্ছে হয় চলে আসবেন। প্রকৃত সমঝদারকে গান শোনাতে পারলে শিল্পীর মনেও তৃপ্তি আসে।

মুচকি হেসে 'আচ্ছা' বলে সেদিনের মতো চলে গেলেন মোহাম্মদ আলী। সেই যে গেলেন তার ছায়াও আর দেখতে পায়নি গুলনাহার। তবে তার চেহারাটা এখনো একেবারে ভুলে যায়নি। শুধু সে কেন, সেই গম্ভীর আর তেজস্বী চেহারাটা কে ভুলতে পারে সহজে? তিনি যে একজন কোম্পানি-

BanglaBook.org

বিদ্বেষী জমিদার, উদয়াচল থাকতেই জানতে পেরেছিল গুলনাহার। সবার মুখে মুখে এখন তার কথা শুনে মানুষটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ হয় তার। কিন্তু গ্রামের চাষাভুষারা কি আর এত কিছুর খবর রাখে? রাখে কেবল ওই এক হায়াত তালুকদার আর নসির মণ্ডল। জালাল মির্জার কাছে জমিদারের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইতে গেলে সে যদি প্রশ্ন করে বসে—তোমার স্বামীর বাড়ি না জুগিদিয়ায় ছিল? ওদিককার কে না চেনে মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে?

নসির মণ্ডলের কাছ থেকে এই প্রজাদরদী জমিদার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে গুলনাহারের খারাপ লাগল। কেবল তার কেন, জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বন্দী হওয়ার খবর শুনে কার না খারাপ লেগেছে? চৌধুরীর মরহুম দাদা জমিদার ফাজেল মোহাম্মদ চৌধুরী ছিলেন ঈমান কলন্দরের খলিফা। তার বেটা জমিদার ফতেহ মোহাম্মদ চৌধুরীর পুত্র হচ্ছেন জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী। অকুতোভয় স্বাধীনচেতা প্রতাপশালী ভূপতি। দাঁদরা-এলাহাবাদের একচ্ছত্র অধিপতি। গোরা বাবুদের নাম শুনলে জমিদার তো জমিদার, রাজা-মহারাজাদের সিংহাসনও যেখানে কেঁপে ওঠে, সেখানে এই এক বাপের বেটা জমিদার, যিনি গোরাদের থোড়াই কেয়ার করেন। প্রজাদরদী জমিদার হিসেবে চাকলা-রৌশনাবাদে তার খুব নামডাক। নিজের প্রজাদেরই যে কেবল ভালোবাসতেন তা নয়, আশপাশের পরগণার কেউ গিয়ে তার সাহায্য চাইলে তিনি কখনোই নিরাশ করতেন না। দুর্ভিক্ষের সময় কমলাঙ্কের যারা অভাবের তাড়নায় এলাহাবাদের দিকে চলে গিয়েছিল তারা কি কখনো ভুলতে পারবে তার নাম? তাদের মুখে এখনো জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর গুণগান। আপন-পর বাছবিচার ছিল না, নিরন্ন অসহায় মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি বিপুল ধন-সম্পদ উদার মনে দান করেছিলেন তখন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজ কুঠিয়ালরা উপকূলীয় এলাকার কর ঠিকমতো পরিশোধ করত না। খাজনা আদায় করতে খুব চেষ্টা করেছেন নবাব, কানেই তুলল না কুঠিয়ালরা। শেষে মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে নায়েবে নাজিম পদে নিযুক্ত করলেন নবাব মীর কাশিম। আর ঠেকায় কে তাকে! নবাবের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি কুঠিয়ালদের কাছ থেকে বিগত পাঁচ বছরের কর দাবি করলেন। কুঠিয়ালরা তা আমলে না নেওয়ায় পাইক-পেয়াদা নিয়ে তিনি কুঠিয়ালদের আটক তো করলেনই, কুঠিতে যা যা পেলেন সবই নবাবের নামে বাজেয়াপ্ত শুরু করলেন।

BanglaBook.org

কুঠিয়ালরা দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সাহায্য চাইল। কিন্তু আলী চৌধুরী কি ওসব হেস্টিং-টেস্টিংয়ের ধার ধারেন? গভর্নরের অনুরোধ উপেক্ষা করে বরং ওখানে নবাবের শাসন কায়েমের ব্যাপারে আরো জোরাল ভূমিকা নিলেন।

বছরখানেক পর বক্‌সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাশিম পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হলে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী দারুণ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। পরের বছর দিল্লি বাদশাহর কাছ থেকে কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভের পরও তিনি কোম্পানির রাজকোষে তার জমিদারির খাজনা দিতে অস্বীকার করে বসলেন। তার এক কথা—জমিদারি আমার, প্রজা আমার, উড়ে এসে জুড়ে বসা ইংরেজদের কেন খাজনা দেব? আমার জমিদারি এলাকার লবণচাষী প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে বছর বছর লাখ লাখ টাকা আয় করে নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে কোম্পানি। খাজনা দিতে হলে তো উল্টো তারা আমাকে দেবে।

ফলে দাঁদরা এলাকার তার জমিদারি কোম্পানির খাসে চলে যায়। গেলে কী হবে, ওসব খাস-টাস মানেন না তিনি। ওসব কেবল কাগজপত্রেই, নিজ এলাকায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটুকু কমল না। পাইক-পেয়াদারা তার আঙুলের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। প্রজারাও তাদের প্রিয় জমিদার ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

পেরে না উঠে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করে দিল কোম্পানি সরকার। অপরাধ, কোম্পানির সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলা।

সৈন্যরা তাকে খুঁজে বেড়ায়, অথচ ধরতে পারে না। কীভাবে পারবে? তিনি কোথায় থাকেন সেকথা কেউ তো জানাবে না কোনোদিন। তাই বহু চেষ্টা করেও তাকে বন্দী করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল তার দেওয়ান নূর মোহাম্মদের পুত্র গাউস মোহাম্মদ এবং ওয়াসেক মোহাম্মদ। জমিদারি লাভের আশায় তারা কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত করে জমিদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল।

একদিন নিজ এলাকায় প্রজাদের চলাচলের সুবিধার্থে একটা কাঠের পুল তৈরির তদারকি করছিলেন জমিদার মোহাম্মদ আলী। ষড়যন্ত্রকারীরা জমিদারের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিল কোম্পানির সৈন্যদের। সেখান থেকেই তাকে বন্দী করে কমলাঙ্কে নিয়ে আসা হলো।

খেদোক্তি করল নসির মণ্ডল, বুঝি না দুনিয়ার হালচাল। নাসারারা এখন

BanglaBook.org

এই দেশের মালিক। তাদের তৈরি আইন আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে। এমন একজন দেশপ্রেমী জমিদারকে কিনা বন্দী করল তারা! ক্ষমা করবে বলে মনে হচ্ছে না। হয়ত ফাঁসিতেই ঝুলিয়ে দেবে।

গুলনাহার বলল, ফাঁসিতে ঝুলাবে?

তাই তো শোনা যাচ্ছে।

আচ্ছা, মহারাজ ইচ্ছে করলে তাকে বাঁচাতে পারেন না?

পারেন, কিন্তু বাঁচাবেন না।

কেন?

কেন আবার? চাকলা রৌশনাবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছেন মহারাজ। কোম্পানির কাজে বাধা দিলে তার স্বার্থের ক্ষতি হবে না?

সবকিছু অবাক লাগে গুলনাহারে। মহারাজের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর এত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তবু তার পক্ষে মহারাজ দাঁড়াবেন না!

জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বন্দী হওয়ার খবরে চাকলা রৌশনাবাদের ঘরে ঘরে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিদিন শত শত মানুষ সদর দেওয়ানি আদালতের সামনে ভিড় করতে লাগল। অবশ্য তাদের বেশিরভাগই দাঁদরা ও এলাহাবাদ এলাকার। লোকজনের ভিড় দেখে কোম্পানির বন্দুকধারী সৈন্যরা সেদিন আদালত এলাকা থেকে তাদের খেদিয়ে দিতে চাইলে ভিড়ের মধ্যে হৈ-হাঙ্গামা শুরু হলো। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আশঙ্কায় বন্দুকধারীরা অতর্কিত লাঠিপেটা শুরু করল জনতার ওপর। বেধড়ক মার খেয়ে হাত-পা ভাঙল কয়েকজনের। তাদের মধ্যে হরিদশ্বের রাজ্জাক সারেংও ছিল। হাঁটুতে লাঠির আঘাত লেগে বেচারা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই দৃশ্য দেখে আরো ক্ষেপে গেল জনতা। প্রতিবাদ করতে গেলে কয়েকজনকে তাৎক্ষণিক বন্দী করে ফেলল সৈন্যরা। বন্দীদের মধ্যে হামজাও একজন।

আসলে কোনো দোষ ছিল না হামজার। দাঁদরা থেকে লোকজন আসার খবর শুনে হিঙ্গুলির কারো দেখা পাওয়া যায় কিনা, এই আশায় সে ওখানে গিয়েছিল। ভেবেছিল, সুযোগ পেলে একবার জমিদার মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। তাকে হয়ত চিনবেন না তিনি, তবু একবার গিয়ে দেখা করার খুব ইচ্ছা তার।

যেই না কান্দিরপাড়ের বড় রাস্তা পার হয়ে আদালতের দিকে চলল, অমনি লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হলো। ঘটনা আঁচ করার আগেই বন্দুকধারীদের একজন এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাকে। ভাগ্য ভালো,

BanglaBook.org

বিকেলেই আবার ছেড়ে দিল। বলতে গেলে তার অসিলাতেই সেদিনের মতো বাকিরাও ছাড়া পেয়ে গেল। জালাল মির্জা গঞ্জের গণ্যমান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে সরাসরি কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে হামজাকে ছাড়িয়ে আনতে যায়। তখন হামজার সঙ্গে বাকিদেরও ছেড়ে দেওয়া হয় কালেক্টরের নির্দেশে।

ছাড়া পেয়ে মনে মনে তওবা পড়ল হামজা। জীবনে আর কখনো আদালত পাড়ার দিকে ভুলেও পা দেবে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে, তার মতো নগণ্য প্রজার এমন কী দরকার ওসব ঝামেলায় জড়ানোর?

জমিদার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে বন্দী করা এবং আমজনতার ওপর হামলার কারণে মেহেরকূল থেকে দাঁদরা পর্যন্ত যে চাপা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল তা আর দানা বেঁধে উঠতে পারল না, তার আগেই মারা গেলেন মোহাম্মদ আলী চৌধুরী। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোম্পানি সরকার সত্যি সত্যিই তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। রায় ঘোষণার আগেই একদিন সদর দেওয়ানি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের অঙ্গুরী চুষে মৃত্যুর কাছে সঁপে দিলেন নিজেকে। হয়ত ভেবেছিলেন, দখলবাজ, অত্যাচারী, লুটেরা কোম্পানির হাতে মরার চাইতে স্বেচ্ছামৃত্যু অনেক ভালো।

সেই কখন থেকে অনর্গল গেজিয়ে যাচ্ছে জসিম।

বাড়িতে অতিথি আসবে কাল, তাই বিকেলে জালটা নিয়ে গাঙে নেমেছিল হামজা। খেপ দিতে দিতে স্রোত ঠেলে ক্রোশখানেক উজানে চলে গিয়েছিল। বেলা তখন অস্তাচলে। গরমকালের মেঘেঢাকা সূর্যের মতো হঠাৎ উদয় হলো জসিম। সেও খেপ দিতে দিতে ভাটির দিকে যাচ্ছিল। সেই যে কাঁঠালের আঠার মতো হামজার পাছায় লাগল আর সরতেই চাচ্ছে না। কতক্ষণ পরপরই অহেতুক প্যাঁচাল পাড়ার তৃষ্ণা লাগে তার। শুরু করলে আর শেষ করার কথা মনে থাকে না। একেবারে বেহায়া আলাপী মানুষ জসিম। ভুলে কখনো বাড়ির ঘাটায় গুলনাহারের সঙ্গে দেখা হলেই হলো, গেজাতে গেজাতে কষে একেবারে ফেনা ধরিয়ে ছাড়ে। রাজ্যের নানা খবরা-খবর সে মাথায় নিয়ে ঘোরে। দুপুরে একবার দেখা হয়েছিল গুলনাহারের সঙ্গে। হায়াত তালুকদারের প্রসঙ্গ ধরে শুরু করল গেজানি। মুখে হাসি ঝুলিয়ে কতক্ষণই-বা সায় দেওয়া যায়? কথার এক ফাঁকে গুলনাহার যখন খানিকটা রসিকতার সুরে বলল, আচ্ছা জসিম ভাই, তোমাকে সবাই ঠাটা জসিম বলে কেন? ছোটবেলায় তো আমরা তোমাকে এই নামে ডাকতাম না।

BanglaBook.org

ব্যাস, যারা তাকে ঠাটা জসিম বলে, শুরু হলো তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী ধুয়ে দেওয়ার পালা। বাপ-মা তুলে বিশ্রী ধরনের গালাগাল শুরু করল। গুলনাহার ভেবেছিল কথাটা বললে হয়ত জসিম লজ্জা পেয়ে কেটে পড়বে। অথচ ফল হলো কিনা উল্টো! শেষে গুলনাহার বলতে বাধ্য হলো, মনে রাগ নিও না জসিম ভাই, ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছি।

জসিম বলল, না, ঠাট্টা তুমি করতেই পার। আমি বলি ওই খানকি মাগীর বেটা বেজন্মাদের কথা। শুয়োরের বাচ্চারা, সাহস থাকলে আমার সামনে বল। পেছনে মানুষের নাম বিকৃত করিস কেন? তুমি আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, তোমার কথায় মনে রাগ নেব কেন?

মনে রাগ না নিলেও এসব গালাগালের এক-আধটু ছটা যে তার গায়েও পড়েছে, বেশ বুঝতে পারল গুলনাহার। ঠাট্টা হোক আর যা-ই হোক, ঠাটা শব্দটা তো সে মুখে এনেছে। ছোটকালে সে আদৌ তার খেলার সাথী ছিল কিনা সেকথা মনে নেই গুলনাহারের। দেখা হলেই কেবল·ছোটবেলার কথা খুঁচিয়ে তোলে জসিম। এখন যে ছোটকালের খেলার সাথীর দোহাই দিয়ে কিছু মনে না নেওয়ার কথাটা বলল, তা হয়ত গুলনাহারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই। অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে আসলে সে গুলনাহারের দিকেই গুলিটা ছুঁড়েছে।

বেচারার নামের শুরুতে এই উপাধিটা কে প্রথম জুড়ে দিয়েছিল তার কোনো পাত্তা নেই। পাত্তা না থাকুক, যে দিয়েছে কাজটা সে খারাপ করেনি বলেই লোকজনের ধারণা। কারণ, জসিম যেসব আজগুবি কথাবার্তা বলে তাতে এই উপাধির যথার্থতা মেলে বৈকি। লোকে বলে, ঠাটা জসিমের গল্প ঠাটার মতোই ভারী। ঠাটা আদৌ ওজন করা যায় কিনা, করলেও তার ওজন কতটুকু, সেই ওজনের সঙ্গে ঠাটা জসিমের ঠাটামার্কা গল্পের ওজন দেওয়া গেছে কিনা, সেই বিচারটা কেউ করে না। সবার মুখেই এক নাম—ঠাটা জসিম। হায়াত তালুকদারও মাঝেমধ্যে তাকে এই নামে ডাকে। সামনে কিছু বলে না বটে, পেছনে তালুকদারের গালে পচা গোবর ছুড়ে মারার ইচ্ছে হয় তার—শালার ব্যাটা শালা, মানুষকে সম্মান দিতে জানে না।

কথা কিছু বেশি বলে জসিম, কিন্তু মনটা তার খুবই ভালো। সারাক্ষণ ঠাট্টা-রসিকতায় মেতে থাকে। চোখ লাল করে কেউ কখনো ধমক দিলে কাঁচুমাচু শুরু করে দেয়, হে হে করে বোকার মতো হাসে। এত বয়স হলো, তবু বিয়ে-শাদি করেনি। নদীর পারে একটা ঝুপড়িতে একা থাকে। সৎ ভাই-বোনদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখে না। দিন-রাত পড়ে থাকে নদী

BanglaBook.org

অথবা ধর্মসাগর বিলে। সকাল-বিকাল জাল কাঁধে কলাপাতা মুড়িয়ে বা ডুলায় ভরে মাছ নিয়ে যে লোকটা গঞ্জের দিকে ছোটে, সে জসিম।

হামজা হাঁক দিয়ে বলল, এবার থামো না জসিম ভাই! তোমার কথার চোটে তো একটা মাছও থাকবে না গাঙে।

জসিম থামে না। হামজার সঙ্গে না হোক, নিজের সঙ্গেই সে কথা চালিয়ে যায়। অনেকে বলে, তার সঙ্গে নাকি খারাপ কিছু আছে। কদিন আগেও ঝুপড়িতে বসে রাতভর আবোল-তাবোল বকেছে, শেষ রাতেও থামেনি মুখটা। সকালে লোকজন তাকে কাদের মৌলবির কাছে নিয়ে গেল—দেখেন হুজুর, জসিমকে জিন-পরীতে আসর করেছে। ঝাড়-ফুঁ দিয়ে তাবিজ-তুমার একটা দিয়ে দেন।

হুজুরের সামনে বসেও জসিমের বকা থামে না। কাদের মৌলবি ধমক দেয়—থামো জসিম, বেশি কথা আল্লার পছন্দ না।

মৌলবির ধমক খেয়ে গলার আওয়াজ খানিকটা খাদে নামিয়ে আনলো বটে জসিম, কিন্তু ঠোঁটজোড়ার নড়াচড়া বন্ধ হলো না। আন্দাজে একদিকে তাকিয়ে ফুসুর-ফাসুর কী সব বকেই গেল। কাদের মৌলবিও কম যায় না, রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে মক্তবঘরের চাটাইর ওপর বসিয়ে বাইরে থেকে দরজার শেকল আটকে দিল। এটি সকালের ঘটনা। মক্তব ছুটি দিয়ে কাদের মৌলবি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এল। ভেবেছিল, এবার ছেড়ে দেবে জসিমকে। মক্তবঘরের দরজা খুলে দেখল জসিম নেই। রশিটা পড়ে আছে ঘরের এক কোণে। কী আজব কাণ্ড! দ্বন্দ্বে পড়ে গেল কাদের মৌলবি। এটা কি জসিমের কেরামতি, না তার সঙ্গে থাকা কোনো জিন-পরীর কারসাজি? দ্বিতীয়টাকেই প্রাধান্য দেয় কাদের মৌলবি। মূর্খ ঠাটা জসিমের কী সাধ্য কেরামতি দেখাবে? তওবা-এস্তেগফার পড়ে মরদুদ শয়তানের কাছ থেকে ফানা চাইল মৌলবি। জিনে পাওয়া বহু মানুষ সে দেখেছে জীবনে, কিন্তু এমন দুষ্ট জিন কখনো দেখেনি।

হাঁক দিল জসিম—শোনো হামজা ভাই, গ্রামে তুমি নতুন মানুষ, হায়াত তালুকদারের ফন্দি-ফিকিরের কিছুই জানো না। কী করে চুপ থাকি বলো, এই দেখ এবার সে গাঙ দখল শুরু করে দিয়েছে।

হুঁ, তাই তো দেখছি। সায় দিল হামজা।

ঘাটের খানিকটা পশ্চিমে বিশাল জায়গাজুড়ে মুলিবাঁশের লগি, কাঁটাবাইরার কঞ্চি আর বাদিগাছের ডালপালা পুঁতে নদীতে জাঁক দিয়েছে হায়াত। কদিন ধরে ব্যাপারটা খেয়াল করছে হামজা, যদিও জাঁক কে দিয়েছে

BanglaBook.org

তা জানা ছিল না তার।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। পুরট চাঁদ বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। খেপ দিতে দিতে কখন রাত হয়ে গেল খেয়ালই ছিল না হামজার। জাল মারতে এলে প্রায়ই এমন হয় তার। বিকেলে হাতে কোনো কাজ না থাকলে আজকাল সে তৌড়া জালটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কলাগাছের ভেলায় চড়ে একবার উজানে আবার ভাটিতে খেপ দিতে দিতে বেলা ডুবে সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার ঘন হয়ে এলে তারপর বাড়ির দিকে রওনা হয়। মাছ তেমন একটা উঠে না জালে। দু-এক খেপ পর পর দু-চারটা টেংরা-বাইলা বা পাবদার বাচ্চা ওঠে। তাই বলে হাল ছাড়ে না সে। প্রতিবার খেপ দেওয়ার সময় ভাবে এটাই তার শেষ খেপ, আর না, এবার বাড়ি ফিরে যাবে। যেই না একটা বড় পুঁটি উঠে এল জালে, অমনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে—আরেকটা খেপ দিয়েই যাই, রাত আর কতই-বা হলো?

এই করতে করতে শেষ খেপ আর শেষ হয় না তার। তবে আজ তার কপাল ভালো। সন্ধ্যার পর থেকেই দু-একটা করে মাছ জালে উঠছে। খানিক আগে মুঠোহাত লম্বা একটা আইড়ও উঠেছে। তাতে আরো বেড়ে গেল লোভ। কখন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই।

তখন হায়াত তালুকদারের ঘের ছাড়িয়ে তারা আরো ভাটিতে চলে এসেছে। জসিম বলল, এক কাজ করা যায় না হামজা ভাই?

কী?

চল যাই নিকারি পাড়ায়।

কেন?

সাইদল মাঝিরে খবর দিয়ে আনি।

তারে দিয়ে কী হবে?

বেড়জাল নিয়ে আসুক সে।

তো?

তালুকদারের ঘের বেড় দেব।

আরে না, এত মাছ দিয়ে কী করব আমি? ধরা খেলে মান-সম্মানের ব্যাপার।

তুমি একটা বোকা হামজা ভাই। সব মাছ আমরা নেব নাকি? সমান সমান ভাগ হবে। আমাদের ভাগেরটা বিক্রি করে দেব সাইদল মাঝির কাছে। কী বলো তুমি?

যদি তালুকদারের কানে যায়?

BanglaBook.org

কেমন করে যাবে? দেখছ না কেমন নির্জন জায়গা। রাতে কেউ ভুলেও আসে না এদিকে।

না রে ভাই, পরের ধনে আমার লোভ নেই।

শুরু হলো আবার জসিমের গেজানি—কথাটা তুমি ঠিক বললে না হামজা ভাই। পরের ধন হলো কেমন করে? তাকে জাঁক দিতে বলেছে কোন শালায়? গাঙটাও পত্তনি নিয়েছে নাকি ওই শালার বেটা? গাঙ তার বাবার সম্পত্তি? গাঙের মালিক আমি তুমি সবাই। তালুকদার শালার বেটা শালা কোন সাহসে এখানে ঘের দিল?

জসিমের গেজানি উজিয়ে উত্তর তীরের বাঁশঝাড় লাগোয়া ছোট খাঁড়িটার কাছে চলে এল হামজা। স্রোত এখানে এসে একটা চক্কর দিয়ে আবার ভাটির দিকে ছোটে। এখানে খেপ দিয়ে প্রথম বারেই একটা বড় কালিবাউশ উঠেছিল তার জালে। সেই লোভে আর জায়গাটা থেকে সরতেই চাচ্ছে না, চক্কর দিতে দিতে কেবল খেপের পর খেপ দিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে ব্যাকুলতা বাড়ে গুলনাহারের। এত রাত হয়ে গেল তবু হামজার ফেরার নাম নেই। বারবার দেউড়ির দিকে তাকিয়ে বাতির আলো জ্বলছে কিনা দেখে। কেউ নেই। দরজা বন্ধ। দাওয়ায় বসা কুকুরটা কতক্ষণ পরপরই কুঁই কুঁই করতে থাকে। কুকুরটা ডাক শুনে হাঁক দেয় গুলনাহার, এলে নাকি হামজা?

কুঁই কুঁই করে কুকুরটা যেন হামজার হয়েই জবাব দেয়, এখনো আসেনি।

জাল মারতে যাওয়ার আগে ঠাট্টা-রসিকতায় বাড়িটা সরগরম করে তুলেছিল হামজা। রাতে শখ করে হাতে-পায়ে মেহেদি লাগিয়েছিল গুলনাহার। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে নতুন কেনা রূপগঞ্জের নীলরঙা জামদানি শাড়িটা পরে আঁচলটা গলায় পেঁচিয়ে তার ওপর দিয়েছিল রুপার হাঁসুলিটা। শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে দিয়েছিল নীল টিপ, হাতে পরেছিল বাহারি চুড়ি, আলতায় রাঙিয়েছিল দুই পা এবং চন্দনের সুবাস মেখেছিল সারা শরীরে। দেখে হামজা রসিকতার সুরে বলেছিল, ঘর থেকে বের হবে না আজ।

চুড়িতে রিনঝিন শব্দ তুলে গুলনাহার হেসে বলেছিল, কেন?

জিন-পরী আসর করতে পারে। বলেই অট্টহাসি দিল হামজা। বাঁশের একটা কঞ্চি নিয়ে তাকে তাড়া করল গুলনাহার। দুজনের কাণ্ড দেখে রেহেনাসহ কয়েকজন দাসী জড়ো হলো উঠোনে। সে কি হাসাহাসি দাপাদাপি তাদের। গুলনাহারের আনন্দ দেখে তাদের আনন্দও উথলে উঠল।

BanglaBook.org

সেকথা মনে করে হাসি পেল গুলনাহারের। ধীর পায়ে উঠোনে নেমে এল। পৌর্ণমাসীর রাত তার মনে কী এক অব্যক্ত বেদনা জাগিয়ে তোলে। তারকার জলসায় পুরট চাঁদের দিকে তাকালে বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস আসে। কী যেন নেই, কাকে যেন কী বলার ছিল, কোথায় যেন যাওয়ার ছিল, কী যেন করার ছিল—স্মৃতি ও বিস্মৃতির এসব ঘেরাটোপে পড়ে যায় সে। তবে আজকের রাতটা একেবারেই আলাদা। বেদনার বদলে এখন ফুরফুরে আনন্দ তার মনে। বিশ্বজুড়ে যেন আনন্দস্রোত বয়ে চলেছে। নদীর পাড়ে মৌমাছির গুঞ্জরণ। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে বাতাস। ইচ্ছে করছে নদীর তীরের চিকচিকে বালুচরের দিকে দৌড় দিতে, প্রাণ খুলে হাসতে, কারো সঙ্গে কানামাছি গোল্লাছুট খেলতে।

এতসব ইচ্ছার পূরণ সে সুরের মাধ্যমেই করল। বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গাইতে লাগল :

মধুর মধুর মিলন, হের রে যুগল নয়ন
চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন।
চাঁদের লহরী ছোটে, চাঁদের কিরণ ফোটে
চকোর সে সুধা লুটে সুখেতে মগন
হাস রে গগন-চাঁদ, হেরি এ যুগল চাঁদ
পুরিল মোদের সাধ হেরি রতনে রতন।

ওদিকের রাস্তায় মুখে শিঁই শিঁই শব্দ তুলে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে। কে আবার? হাঁটার সময় মুখে এরকম শব্দ তো একজনই করে এই গ্রামে—জসিম। সামনের দিকে এগিয়ে গেল গুলনাহার। জসিমে কাঁধে জাল, হাতে ডুলা।

জসিম ভাই নাকি?

কে?

আমি, নাহার।

আরে নাহার! রাতের বেলা বাইরে কেন?

হামজাকে দেখেছ? এখনো তো বাড়ি ফিরল না। কত করে বললাম রাতের বেলায় মাছ ধরার দরকার নেই। কানেই তোলে না কথা।

সে তো এখনো গাঙে। এসে পড়বে এখুনি, তুমি বাড়ি যাও।

বাড়ি যায় না গুলনাহার, নদীর বাঁধ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খাঁড়ির কাছাকাছি চলে এল। ধবধবে জোছনামাখা ফুরফুরে বাতাসে বালুচরে ধূলিঝড় উঠল। বাতাসে হামজার গামছাখানা উড়তে দেখা গেল। খানিকটা ঝুঁকে সে জালের

BanglaBook.org

রশি গুটাচ্ছে। দেখে মায়া হলো গুলনাহারের। কোমল স্বরে ডাক দিল, হামজা!

কে, নাহার?

বাড়ি ফিরবে না আজ? বালিশ একটা এনে দিই, ভেলার ওপর জালটা বিছিয়ে শুয়ে পড়।

হা হা করে হেসে উঠল হামজা। বলল, খাঁড়িটা কালিবাউশে ভরা। বড় বড় তিনটা উঠল জালে।

ভেলায় খুঁটি গেড়ে তীরে উঠে এল হামজা। ডুলাটা রেখে জালটা পরিষ্কার করে নিল। বালুচরে উবু হয়ে বসে ডুলার মুখে ঝুঁকে মাছ দেখে গুলনাহার। বলে, কই তোমার কালিবাউশ, সব তো দেখি নলা?

দূর বোকা! এই বলে হামজা জাল রেখে ডুলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। মাছ বের করতে করতে, কালিবাউশ ও নলা চেনার উপায় বাতলে দিতে দিতে তার নাক গুলনাহারের খোঁপার ওপর গিয়ে ঠেকল। হঠাৎ কথা হারিয়ে গেল তার। যে সুবাসের কথা সে কখনো শোনেনি, যে সুবাস জীবনে তার নাকে লাগেনি, সেই অজানা-অচেনা উন্মাতাল সুবাস এসে লাগল তার নাকে। তন্ময় হয়ে খোঁপার ওপর ঝুঁকে থাকল কিছুক্ষণ। ডুলা থেকে মাছ বের করে আনার কথা ভুলে গেল। এক অদৃশ্য জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় সে ধীরে ধীরে পাথর হয়ে যেতে থাকে। না, ঠিক পাথর নয়, যেন লোহার শাবল। কোনো এক কামার হাঁপরের কাঠকয়লার আগুনে ঢুকিয়ে দিয়েছে শাবলটা। আগুনের তাপে উষ্ণ হয়ে ওঠে শাবল, তারপর ধীরে ধীরে অঙ্গার হতে শুরু করে।

পৃথিবী আলো করা চাঁদিমায় হামজার মুখের দিকে তাকাল গুলনাহার। তার মাথার দিক থেকে একটা হালকা শিরশিরানি নিচের দিকে নেমে গেল। ডুলার জায়গায় ডুলা, মাছের জায়গায় মাছ—সেসব ভুলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল দুই জোছনা-মানব।

কী! কাঁপা গলায় অস্ফুট শব্দ করল গুলনাহার।

শব্দটা ঠিক চিনতে পারে না হামজা। এ যেন অন্য কারো গলার স্বর। নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল সে। মনমাতানো অপার্থিব ঘ্রাণ তাকে যেন বধির করে দিয়েছে। বাতাসের ঝাপটা এসে গুলনাহারের খোলা চুল উড়িয়ে তার বাহু ঢেকে দিল। হায়াত তালুকদারের ঘেরের দিকে বড় মাছের ঘাই উঠল। দখিনা বাতাস শব্দটাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এদিকে। গুলনাহারের খোঁপার সুবাসটা মিলায় না, নদীর চরে একবার পাক খেয়ে সারা পৃথিবী সুবাসিত করতে দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছে। ডুলার ভেতর মাছেদের দাপাদাপি শুরু হলো। পশ্চিম

BanglaBook.org

আকাশে একটা তারা শাঁই করে উড়ে গিয়ে আরেকটা তারার সঙ্গে ধাক্কা খেল। তারাটিকে আর দেখা যায় না। একটার ভেতর আরেকটা সেঁধিয়ে গেল, না ছুটে আসা তারাটি ফের ছুটে চলল, ঝাপসা চোখে তা ঠাহর করতে পারল না কেউ।

একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল গ্রামে। কারণটা খুবই তুচ্ছ। মেলার মাঠে হরিদশ্বের কোন মেয়েকে সিনার ধাক্কা কি ল্যাং মেরেছে নদীর ওপারের গ্রাম ডোঙাতলার টুকু নাকি টুইক্যা নামের এক যুবক। মেলার শেষ দিনের ঘটনা এটি। সেদিন জমিদার অনিমেষ রায়ও উপস্থিত ছিলেন মেলায়। গ্রামে এত বড় একটা মেলা হয়ে যাবে তা কেউ ভাবেনি। অজয় পণ্ডিত ও রামগঙ্গা বিশারদকে কেন্দ্র করে হোক বা হায়াত তালুকদারের কাছে কারিশমা জাহির করার জন্যই হোক, হুট করে কবিগানের আসরের ঘোষণা দিয়ে দিল জালাল মির্জা। এসব ব্যাপারে সে খুবই দক্ষ। গঞ্জের মাঠে প্রতি বছর যেসব যাত্রাপালা, পুতুলনাচ বা বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সবকিছুর পেছনেই তার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে। থাকারই কথা। গঞ্জের পঞ্চায়েতসভার একজন সদস্য সে। আচারে-বিচারে, সালিশে-দরবারে বাবা কামাল মির্জার মতো তারও ডাক পড়ে।

যেই না কবির আসরের কথা বলল, অমনি লুফে নিল হরিদশ্ববাসী। গ্রামে কবির আসর হবে সে তো ভারি আনন্দের কথা। শুধু কবির আসর কেন, মির্জার বেটার মতো গঞ্জের আরো কয়েকজন পাশে থাকলে এই উপলক্ষে ছোটখাটো একটা মেলার আয়োজনও করা যেতে পারে বলে উৎসাহ প্রকাশ করল গ্রামবাসী। তাদের আগ্রহ দেখে একটা কমিটি গঠন করে দিল জালাল। সবাই যখন চাইছে তবে হোক না একটা মেলা। টাকা-পয়সা লাগলে সে কিছু দেবে, দরকার হলে জমিদার বা কালেক্টরের কাছ থেকে কিছু এনে দেবে। তবে দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে রাজি নয় সে। এই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে যত খাতিরই থাকুক তার, সে তো আসলে অন্য গ্রামের মানুষ। আসর বা মেলার ভালো-মন্দ তো এ গ্রামের মানুষকেই দেখতে হবে।

যেদিন অজয় পণ্ডিতের আসার কথা ছিল ঠিক তার পাঁচ দিন পরই আসরের দিন ধার্য হলো। তামাম পরগণায় ঢোলসহরত করা হলো গরুর গাড়িতে করে। জমিদার অনিমেষ রায় ও কালেক্টর বাবুর সঙ্গে অজয় কুমার

BanglaBook.org

পণ্ডিত আর রামগঙ্গা বিশারদের নামের আগে-পিছে লম্বা উপাধি জুড়ে হরিদশ্বে তাদের পদধূলির কথা ঘোষণা করা হলো। পাণ্ডববর্জিত অজগাঁ হরিদশ্বে আসছেন রাজকবি রামগঙ্গা বিশারদ, এ নিয়ে পরগণাবাসীর আনন্দের সীমা থাকল না। কার সূত্র ধরে তারা এখানে আসছেন, সেই সুলুক সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কার আবার? ওই যে তারু সরকারের বেটির।

তার হাত তো তাহলে খুব লম্বা?

অথচ দুর্ভিক্ষের বছর এই মেয়েকেই কিনা বিক্রি করে দিয়েছিল তার মা।

সবই কপাল। আল্লায় যাকে দেয় তাকে গোলা ভরে দেয়। সবই তার লীলা।

বহু বছর পর তারু সরকারের নাম লোকজনের মুখে মুখে আবার ফিরতে লাগল। মেয়ে একটা জন্ম দিয়েছে বটে তারু সরকার। মেয়ে হলে এমনই হওয়া উচিত। ধনে বলো, মানে বলো, কোন দিক থেকে বাবার নাম রাখেনি বেটি?

কেউ হয়ত কোনোদিন রামগঙ্গা বিশারদ বা অজয় পণ্ডিতের নামও শোনেনি, অথচ ঘোষকদের রংচং মেশানো প্রচারণায় দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি তামাম পরগণায় যাত্রাপালা বা সাদেক আলী মুন্সীর পুঁথির নায়ক হয়ে উঠল। রাজকবি কি রাজার মতো পোশাক পরেন, না সাধারণ প্রজার মতো ধুতি পরেন? ভাত খান, না রুটি খান? লম্বা না খাটো, মাথার চুল সাদা না কালো, হাগার পর নিজে ছুচো করেন, না কেউ করিয়ে দেয়? করলে কীভাবে করেন? নানা গল্প-গুজবের ঝড় বইতে লাগল গ্রামে গ্রামে।

অথচ মেলার প্রথম দিন গেল, সেই অদেখা রাজকুমার কি রাজকবি এলেন না। সবাই ভাবল, দূরের পথ, আজ না হোক কাল তো নিশ্চয়ই আসবেন। দ্বিতীয় দিনও গেল, অথচ সেই দুই পাণ্ডবের খবর নেই। তৃতীয় দিন মেলা এতটাই জমে উঠল যে, লোকজন সেই দুই অতিথির কথা বেমালুম ভুলে গেল। হোমনা ও রঙসোনাপুর থেকে যে কবিয়ালের দল এসেছিল, তারা মাতিয়ে তুলল আসর। ভৈরব থেকে এল পুতুলনাচের দল, চরজোয়ারি থেকে এল গাড়লি আর বাজিকররা। আরো এল নাগরদোলা, বায়োস্কোপঅলা। মনোহরি হরেক রঙের মালামাল নিয়ে এল পসারিরা। শুরুর দুদিনে ছিল নিমাই সন্ন্যাসের পালা ও বড়পীরের পালা। সব মিলিয়ে চৈত্রসংক্রান্তির মেলার চেয়ে কোনো অংশে কম হলো না।

মেলার শেষ দিন কবিয়ালদের দুই পক্ষের ঢুলির মধ্যে যখন শুরু হলো ঢোলের লহরা, ঠিক তখনই মাঠের দক্ষিণে হৈ-হুল্লোড় শুরু হলো। কমিটির

BanglaBook.org

কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ছুটে এল নসির মণ্ডল। টুকুকে গাছের সঙ্গে পিছমোড়া বেঁধে রেখেছে গ্রামের ছেলেরা। তাকে ঘিরে নারী-পুরুষের জটলা। লুচ্চা, বদমাশ ইত্যাদি গালাগাল চলছে অনর্গল।

যা হওয়ার হয়েছে, পরে দেখা যাবে—এই বলে নসির মণ্ডল গিয়ে টুকুর বাঁধন খুলে দিল। পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এখন যাও তো বাবা, জমিদারের কানে গেলে কারো জন্যই মঙ্গল হবে না।

সালিশ-দরবারের ধার ধারল না ডোঙাতলাবাসী। তাদের এক কথা—এই গ্রামের কারো গায়ে হাত তোলার সাহস কে দিয়েছে হরিদশ্বের চাষা-মজুরদের? সকাল হলে ডোঙাতলার পথ না মাড়িয়ে যাদের গঞ্জে যাওয়ার উপায় নেই, তাদের এত বাহাদুরি কিসের? তাদেরকে বাঘে বিইয়েছে না শিয়ালে, তা একবার দেখে নিতে চায় ডোঙাতলার মানুষ। পরদিন বিকেলে হরিদশ্বের তিন-চারজন ছেলেকে ঠিক একইভাবে একটা গাছের সঙ্গে পিছমোড়া বেঁধে রাখল। সন্ধ্যা নাগাদ তামাম হরিদশ্বে চাউড় হয়ে গেল এই খবর। লাঠিসোটা দা-কুড়োল টেঁটা বল্লম নিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ছুটে গেল সবাই। ঘটনা আঁচ করার আগে প্রথম হানাতেই হাতের কাছে যাকে পেল তাকে ধরে নিয়ে এল নদীর এই পারে। ঠ্যালা সামলাও এবার বাচাধনরা। হরিদশ্বের মানুষদের তোমরা মানুষ ভাবতে চাও না। অন্যায় করল তোমাদের লোক, আর বেঁধে রাখলে কিনা আমাদের লোকদের?

আর কি বসে থাকতে পারে ডোঙাতলাবাসী? তখন এশার অক্ত। নামাজ ফেলে নামাজিরা, দুধের শিশু কোলে মায়েরা, বৌয়ের আলিঙ্গন ছেড়ে স্বামীরা এবং যুবক বুড়ো বালক নাবালক, হাবাগোবা ওলা-কাশি হাঁপানি রোগী—কেউ বাদ থাকল না। হাতের কাছে যে যা পেল তা-ই নিয়ে ছুটে চলল নদীর দিকে। শত শত মশালের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত মুহূর্তে দিনের মতো ফকফকা হয়ে উঠল। হাঁকডাক চিৎকার চেঁচামেচি আর খিস্তি-খেউড়ে গমগম করতে লাগল নদীর দুই তীর। শালারপুত, সম্মুন্দিরপুত, বান্দিরপুত, মাগীরপুত, কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা—যার মুখে যা আসছে তাই ছেড়ে দিচ্ছে। মোটা গলা, চিকন গলা, হেঁড়ে গলা—নানা গলার শোর-চিৎকার। শোনা যায় নারীকণ্ঠের বিলাপও—ওগো বাবারা, তোরা আমার ধর্মের বাপ, আমার ছেলেটারে ছেড়ে দে। সারা দিন পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে পেটে কিছু দিতে পারেনি ছেলেটা।

কে শোনে কার বিলাপ। যুদ্ধের মাঠে ওসব কান্নাকাটির মূল্য নেই। খোদ ফেরেশতারা এসেও যদি থামতে বলে, কেউ থামবে না।

BanglaBook.org

ওপার থেকে ডাক আসে—ভাগ্য ভালো চাইলে আমাদের লোকজনদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে, নইলে কেয়ামত নাজিল হবে এই গাঙের চরে।

এপার থেকে নসির মণ্ডল কি রাজ্জাক সারেং নাকি হামজা হাঁক দিল—ঐ মাগীর পুতেরা, কেয়ামত নাজিল করবি তোরা? আমরা কি আঙুল চুষব? দোযখের আগুন জ্বালাব তোদের বাপ-দাদার কবরে। শালারা, তোদের ওসব হুমকি-ধমকি কার বালে পৌঁছে?

নদীর দুই তীরে উভয় পক্ষের হাঁকডাক আর অশ্রাব্য গালাগাল চলতে থাকে, কিন্তু কেউই নদী পার হয়ে যাওয়া বা আসার সাহস করে না। হরিদশ্ববাসীর অজান্তে এই মহারণের রণপতির মর্যাদায় উন্নীত হলো হামজা। এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে কে কী করবে, কোন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে, ওরা আক্রমণ করলে কীভাবে পাল্টা আক্রমণ করতে হবে, আপস-মীমাংসায় গেলে কে কে যাবে ওপারে, বা তাদের কেউ এই পারে এলে এই পক্ষের হয়ে কে কথা বলবে—সব দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে হামজা। এতদিন গ্রামের যারা তাকে তেমন একটা পাত্তা দিতে চাইত না, তাদের মুখেও এখন হামজা ভাই ছাড়া কথা নেই।

এরই মধ্যে কেউ একজন গিয়ে মসজিদ থেকে টিনের চোঙাটা নিয়ে এল। অন্ধকারে সেটি হামজার দিকে বাড়িয়ে দিল। চোঙার মুখে মুখ লাগিয়ে হাঁক দিল হামজা—ঠিক আছে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ চাই না আমরা, আমাদের লোকদের ছেড়ে দাও তোমরা।

ওপার থেকে কর্কশ গলার জবাব—আমাদের লোকদের ছাড় আগে, তারপর তোমাদের লোকদের ছাড়ব।

আগে তোমরা ধরেছ আমাদের লোকদের, ছাড়তে হলে আগে তোমাদেরকেই ছাড়তে হবে।

না, এই যুদ্ধের মাঠে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। হরিদশ্বের ওই মূর্খ চাষাভুষাদের বিশ্বাস করবে ডোঙাতলাবাসী? আর যা-ই হোক, এরকম বোকামি করবে না তারা। আর ওই ডোঙাতলার লেঠেলেরা? তাদেরকেই-বা কী করে বিশ্বাস করে হরিদশ্ববাসী? তল্লাটের নামকরা লেঠেলদের বসবাস ওই গ্রামে। যুগ যুগ ধরে জমিদার-জোতদারদের লেঠেলি করে আসছে তারা। তাদের বিশ্বাস করে অকালে আজরাইলের হাতে জীবন সঁপতে রাজি নয় হরিদশ্ববাসী।

শেষে হামজা দিল পরামর্শটা। ঠিক আছে, কেউ যখন কাউকে বিশ্বাস

BanglaBook.org

করতে পারছে না, তবে দুই পক্ষই আসুক মাঝ-নদীতে, সেখানেই হোক বন্দী-বিনিময়।

তার কথা শুনে ওপারে নীরবতা নামল। শত্রুপক্ষের প্রস্তাবটা বিচার করে দেখছে তারা। তারপর একজন হাঁক দিয়ে এই প্রস্তাবে তাদের সম্মতির কথা জানাল।

এবার শুরু হলো এই পক্ষের শলাপরামর্শ। কে কে যাবে মাঝ-নদীতে, তাদের দলনেতা কে হবে, বন্দী-বিনিময়ের কাজটা কীভাবে করতে হবে—এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। শেষে রাজ্জাক সারেং হামজার নাম প্রস্তাব করলে সবাই এক বাক্যে মেনে নিল। কিন্তু তার সঙ্গে কে যাবে? নসির মণ্ডল তাগড়া চার যুবকের নাম প্রস্তাব করল। তাদের মধ্যে আছে জসিমও। ঝামেলাটা বাঁধল মণ্ডলের খানিক ভুলের কারণে। সে বেখেয়ালে জসিমের নামের আগে 'ঠাটা' কথাটা বলে ফেলল বলে চেতে উঠল জসিম। বলল, যেখানে সেখানে তোমরা আমাকে অপমান করবে, আমার কি মান-সম্মান নাই?

তার কথায় এই বিপদের মুহূর্তে হাসির রোল উঠল। রাজ্জাক সারেং এসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, রাখো তো জসিম, এখন কি এসব নিয়ে রাগ-অভিমানের সময়?

তখন রাতের প্রথম প্রহর শেষ কি দ্বিতীয় প্রহরের শুরু। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার সুধাবতীর তীরে। আকাশের শত-সহস্র তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে টলটলে জলে। বিবদমান দুই পক্ষের চারজন করে মোট আটজন প্রতিনিধি নিজ নিজ বন্দীদের নিয়ে ডিঙায় চড়ে মাঝনদীতে উপস্থিত হলো। মন্থর স্রোত। মশালের আলোয় ঘোলা ফেনা বিচিত্র রং ধারণ করল। শত শত উদ্বিগ্ন মানুষ দুই তীরে অপেক্ষমাণ। তাদের ভেতর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, মুখে হাজার বছরের বাকহীনতা। দুই পক্ষের দুই নৌকার গলুইতে গলাগলি হলো। ধীর পায়ে বন্দীরা উঠে এল নিজ নিজ পক্ষের নৌকায়। কারো মুখে কথা নেই। দুই পক্ষই লগি ঠেলে নিজেদের নৌকা দূরে নেওয়ার উদ্যোগ নিল। দুই নৌকার মাঝখানে হাতখানেক ফাঁক হতেই 'শালা পরগাছা' বলে ওই পক্ষের কেউ একজন জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারল হামজার গায়ে। চট করে বসে পড়ল হামজা। মশালটা পড়ে গেল নদীর জলে। হামজার চিৎকারে কেঁপে উঠল সুধাবতীর তীর। একটা কাঠের চ্যালা ছুড়ে মারল জসিম। চরাটে দাঁড়িয়ে থাকা ওই পক্ষের একজনের ঘাড় বরাবর লাগা মাত্রই টাল সামলাতে না পেরে নদীতে পড়ে গেল লোকটা। আর যায় কোথায়! ধর, মার, কাট রব

BanglaBook.org

উঠল দুই তীরে। খলবল শুরু হলো তীরের জলে। হুটোহুটি, দাপাদাপিতে হায়াত তালুকদারের ঘেরের মাছগুলো পালানোর পথ খুঁজে পায় না। নৌকা থেকে লাফ দিল হামজার দল। নৌকা গোল্লায় যাক, লোকজনদের নিয়ে আগে সে তীরে উঠুক, তারপর রক্তারক্তি যা হওয়ার হবে।

তাদের এই পলায়নপর কাণ্ড দেখে ডোঙাতলাবাসীর সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ওদিকে নদীর জল খানিকটা বেশি। তাই মাঝনদীতে আসতে কিছুটা সময় লাগল তাদের। ততক্ষণে হরিদশ্ববাসী মাঝনদী ছেড়ে তীরে উঠে এসেছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে নদী পাড়ি দিয়ে এই তীরের কাছাকাছি চলে এল ডোঙাতলাবাসী। উদ্দেশ্য, হরিদশ্ববাসীকে গ্রামছাড়া করে বাড়িঘর লুট করে নেওয়া।

নদীর বাঁধে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করছিল হায়াত তালুকদার। দুই গ্রামের এরকম ঠোকাঠুকি সে এর আগেও বহুবার দেখেছে। কেউ কারো রোমও ছিঁড়তে পারে না। কয়েক দিন উত্তাল পরিস্থিতি, ওপারের কেউ এপারে আসে না, এপারের কেউ ওপারে যায় না, গঞ্জে যেতে হলে পুবের মাঠ পেরিয়ে তারপর যায়। কদিন পর সব আবার ঠিকঠাক। কিন্তু এবার পরিস্থিতি খারাপ। সত্যি যদি তারা এপারে এসে বাড়িঘর লুট শুরু করে, তবে তার বাড়ি কি আর বাদ যাবে? ফাঁড়া এখন তার ঘাড়েও চড়ে বসছে দেখে আর চুপ করে থাকতে পারল না সে। হাতচোঙা ফুঁকে ঘোষণা করল—পিছে হটো ভাইয়েরা, এখানে খুনোখুনি হয়নি। আমি কথা দিচ্ছি, অন্যায় যারাই করুক, উচিত বিচার হবে।

ওই পক্ষের কেউ একজন হাঁক দিল—তুমি কে?

আমি হায়াত তালুকদার।

আপনি বাড়ি যান মিয়াভাই, আপনার ওপর আমাদের কোনো ক্ষোভ নাই। শালার বেটাদের কত বড় বুকের পাটা একটু দেখতে চাই আমরা। ওই শালা পরগাছা হামজা না গাঞ্জা, নেতাগিরি মারাচ্ছে শালা। ছাদু পালোয়ান হতে চাচ্ছে মাদারি। ওই বাদাইম্যার বেটা আমাদের লোকদের গায়ে হাত দিয়েছে।

এপার থেকে জসিমের কর্কশ গলার জবাব—চুপ্ মাগীর পুত। হামজা ভাই পরগাছা হলে তুই তো বেটা বেজন্মা।

ওই নটীর বেটা, মুখ সামলে কথা বল। তোর মা-বোন যাবে না গঞ্জে চোদা খেতে?

কথা শেষ হওয়ার আগেই শুরু হলো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। দা-কুড়োল-শাবল-কোদাল দিয়ে বাঁধের চাঙড় উপড়ে ছুড়ে মারছে শত্রুপক্ষের দিকে।

BanglaBook.org

বেড়জালে আটকা পড়া মাছের দাপাদাপির মতো ঝুপঝাপ শব্দ উঠল নদীর জলে। ডোঙাতলার অতিসাহসী কয়েকজন লাঠিসোটা হাতে তীরে উঠতে যাচ্ছিল, অসংখ্য ঢিলের চোট সইতে না পেরে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পিছু হটল। শত শত মানুষের দাপাদাপি, আর্তচিৎকার, কুকুরের ডাক, কলকল জলস্বর—এক ধুন্দুমার লঙ্কাকাণ্ড। অন্ধকারে গুলনাহারের হাঁক শোনা গেল। হামজার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে সে। অগুনতি মানুষের শোর-চিৎকার উজিয়ে গুলনাহারের ডাক হামজার কানে পৌঁছাচ্ছে না। মশালের আলোয় গুলনাহার আবিষ্কার করল হায়াত তালুকদার তার পাশে দাঁড়িয়ে। বাবার বয়সী লোকটাকে দেখে সম্ভ্রমে সে ঘোমটা টানলো। বলল, যান না কাকা, এবার একটু থামান। আপনার কথা শুনবে সবাই। নইলে তো খুনোখুনি হয়ে যাবে।

খেদোক্তি করল হায়াত তালুকদার—তুমি জানো না মা কত খারাপ ওরা। গ্রামের মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তাদের লোক, অথচ ইনসাফ দেখ তাদের। একটা উচিত শিক্ষা তাদের দিতেই হবে এবার। অনেক বাড় বেড়েছে শালারা।

ঠিক বলেছে তালুকদার—হৈ হৈ করে উঠল সবাই। এবার যদি ছাড় দেওয়া হয়, সাহস আরো বেড়ে যাবে শালাদের। দ্বিগুণ উৎসাহে তাই ঢিল ছোঁড়া শুরু করল সবাই। বাঁধের ধারে যাদের বাড়ি, তাদের ঘাটায় শুকাতে দেওয়া আম কি শিমুলগাছের একটা লাকড়িও আর অবশিষ্ট থাকল না, ইটপাটকেলের সঙ্গে কামানের গোলা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো।

বৃষ্টির মতো মাটির চাঙড়, ফাটা বাঁশ ও কাঠের চ্যালার মুখে কতক্ষণই বা টিকে থাকা যায়? শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হলো ডোঙাতলাবাসীদের। পরে দেখে নেবে, গঞ্জে আর যাবে না হরিদশ্বের শালারা? ইত্যাদি বলে গালাগাল করতে করতে নদী পার হয়ে ওই তীরে উঠে গেল। হাততালি আর কটাক্ষ শুরু হলো এপার থেকে। বিশেষ অঙ্গহীন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হলো ডোঙাতলাবাসীদের।

ওইপারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খিস্তি করে মশাল উঁচিয়ে গ্রামের পথ ধরল ডোঙাতলাবাসী, কিন্তু আড়া ছেড়ে গেল না হরিদশ্বের কেউ। বৌ-ঝিদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সারা রাত পাহারায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল সবাই। লেঠেলের জাতকে বিশ্বাস নেই। শেষ রাতে ঘুমের ভেতর হামলা করে বসবে না, তার নিশ্চয়তা কী।

হায়াত তালুকদারের কথাই ঠিক, দু-চার দিন পর পরিস্থিতি আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে এল।

BanglaBook.org

মাস দেড়েক পরের কথা। জয়গুনপুর থেকে একটা চিঠি এল গুলনাহারের ঠিকানায়। খামের ওপর অজয় পণ্ডিতের বদলে অপরিচিত একজনের নাম। গুলনাহার ভেবেছিল অজয় পণ্ডিতেরই চিঠি বুঝি। আসতে পারেননি বলে হয়ত দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন। এই কয়টা মাস চাতকের দশা হয়েছিল গুলনাহারের। ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন—গোটা একটা মাস সে অপেক্ষা করেছে। রোজই ভেবেছে আজই বুঝি আসবেন অজয় পণ্ডিত। বড় রাস্তার দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছে, হামজাকে বারবার পাঠিয়েছে নদীর ঘাটে, দিনে দু-তিনবার উঠোন-ঘাটা ঝাড়ু দিয়েছে, অথচ এভাবে কিনা ফাঁকি দিলেন পণ্ডিত? শেষে হাল ছেড়ে দিল গুলনাহার। ভাবল, ফাঁকি হয়ত ইচ্ছে করে দেননি তিনি। যখন আসার কথা তখন তো জন্মাষ্টমী ছিল, পুজোর কাজে হয়ত ব্যস্ত ছিলেন। শরীর খারাপ হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। এমনও তো হতে পারে, দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে রাজি হননি রামগঙ্গা বিশারদ। বন্ধুর অনাগ্রহ দেখেই হয়ত পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন পণ্ডিত।

চিঠিটা পড়ে থ হয়ে গেল গুলনাহার। অজয় পণ্ডিত নয়, তারই এক শিষ্য লিখেছে চিঠিখানা। মাস দেড়েক আগে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন অজয় পণ্ডিত। কারা মেরেছে তার কোনো হদিস নেই। তবে শোনা যাচ্ছে, মন্দিরে যবন-শাস্ত্র পেয়েছিল সন্তোষ চৌধুরী। এই অপরাধে তাকে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল সে। কিন্তু তার কথা আমলে নিলেন না পণ্ডিত। এর সপ্তাহখানেক পরেই মন্দিরের বটগাছের ডালে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

একটা নতুন খবরে উদ্বেলিত হয়ে উঠল গ্রামবাসী। খবরটা প্রথম শোনা গেল কাদের মৌলবির কাছ থেকে। শুক্রবার ছিল সেদিন। এদিন মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বেশি থাকে। ভেতরের চার কাতার ছাড়িয়ে বারান্দার তিন কাতার পুরো হয়ে মাঠেও এক কাতার করতে হয়। সারা সপ্তায় যারা রুকু-সেজদা তো দূরে থাক, পশ্চিম দিকে ফিরে আছাড়ও খায় না, শুক্রবারে ফুটোফাটা চিতেপড়া টুপিটা মাথায় দিয়ে মসজিদে এসে হাজির হয়। গরিবের জন্য শুক্রবার হজ্বের দিন—এজন্যই তাদের মসজিদে আসা, না বড় পাতিল ভরা শিরনির মৌ মৌ গন্ধ পেয়ে আসা—আসল কথাটা খোলাসা করে কে বলবে? কেউ তো আর কারো মুখের ওপর বলে দিতে পারে না যে, তুমি বাপু শিরনির লোভে

BanglaBook.org

শুক্রবারে মসজিদে এসেছ। আল্লাহর ঘর। কে কখন মসজিদে আসবে তার কৈফিয়ত তলব করবে সেই সাহস কার? গ্রাম ছেঁকে মুসলমান ছেলে-বুড়োরা তো আসেই, কাদের মৌলবির খুতবা পড়া শেষ হলে বারান্দার বাইরে কাঁঠালগাছটির তলায় কলাপাতা নিয়ে শিশুরা কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। তাদের চেঁচামেচিতে নামাজ আদায় করাটা মুসল্লিদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। নামাজ শেষে তাই ছেলেপিলেদের সামাল দিতে দু-একজনকে বেত হাতে নেমে পড়তে হয় ।

সেদিন কাদের মৌলবি খুতবার আগে বেশ কিছুক্ষণ ওয়াজ-নসিহত করলেন। বেশিরভাগ ওয়াজ ছিল কেয়ামত বিষয়ক। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হলো দুনিয়ায়। লম্বা ছুরি নিয়ে সে মুসলমানদের কাছে গিয়ে বলবে, আমার ধর্ম মেনে নাও, নইলে তোমার গর্দান যাবে। যাদের ঈমান দুর্বল তারা কানা দাজ্জালের ধর্ম কবুল করে নেবে এবং যাদের ঈমান মজবুত তারা উল্টো তার ওপর চড়াও হবে। ঈমানদারের ঈমানি জোশ দেখে দাজ্জাল পড়িমরি করে পালিয়ে বাঁচবে। কিন্তু তাতে কী হবে, দুনিয়ায় তো তখন অধর্মের বাতাস বইবে, সারা দুনিয়া শেরেক-বেদাতে সয়লাব হয়ে যাবে। ফলে প্রকৃত ঈমানদার খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে পড়বে। বেঈমানের রাজ্যে যখন রাজত্ব কায়েম করবে কানা দাজ্জাল, তখন তাকে ধ্বংস করার জন্য আসবেন ইমাম মাহ্‌দি। লম্বা তলোয়ার দিয়ে ওই কাফেরকে হত্যা করবেন তিনি। তারপর বহু বছর তার রাজত্ব চলার পর ইস্রাফিল ফেরেশতা প্রথম বার শিঙায় ফুঁ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকুল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তারপর দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁ দেবেন ইস্রাফিল। থর থর করে কেঁপে উঠবে পৃথিবী। পাহাড়গুলো জুগিদিয়ার শিমুল তুলার মতো শূন্য আসমানে উড়তে থাকবে, গর্কির মতো সাগরের সমস্ত পানি ডাঙায় উঠে আসবে, ধ্বংস হয়ে যাবে আসমান জমিন পাহাড়-পর্বত গাছপালা বৃক্ষ-লতা সব।

তারপর কাদের মৌলবি উপস্থিত মুসল্লিদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়—শুধু টিকে থাকবে কোন দুটি জিনিস?

সবাই সমস্বরে জবাব দেয়—আল্লার ঘর মসজিদ এবং নবীর ঘর মক্তব।

সেই মসজিদে কারা ঠাঁই পাবে তাদের পরিচয় ব্যক্ত করেন কাদের মৌলবি। তারা কারা? যারা জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়েছিল এবং যারা ছেলেমেয়েদের দ্বীনি এলেম শেখানোর জন্য মক্তবে ভর্তি করেছিল, তারা ছাড়া আর কে।

দীর্ঘ প্রস্তাবনার পর এবার আসল কথাটা পাড়ার সময় হলো কাদের

BanglaBook.org

মৌলবির। বলল, বন্ধুরা, আপনারাই বলুন, খোদার ঘর দরকার আছে কি নেই?

সবাই সমস্বরে বলল, জি হুজুর, আছে।

আস্তে কেন?

মুসল্লিরা আরো জোরে বলল, জি হুজুর, আছে।

না, হলো না। ওই কোনার দিকে সবাই চুপচাপ কেন?

তীব্র গরমে যাদের চোখে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল এবং যাদের মন পড়েছিল বারান্দার শিরনির পাতিলের দিকে তারাও এবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একযোগে হায়দারি হাঁক দিল, জ্বি হুজুর আছে।

সোবহানাল্লাহ বলে এতক্ষণে হুজুর আসল কথাটা পাড়ল—সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, আপনারা জানেন এই গ্রাম নিবাসী তারু সরকারের বেটি মোসাম্মৎ গুলনাহার বেগমের কথা।

এই পর্যন্ত বলে হুজুর উপস্থিত মুসল্লিদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শুক্রবারে মসজিদে গুলনাহারের প্রসঙ্গ উঠল বলে সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। হুজুর এরপর কী বলতে পারেন, তা মনে মনে অনেকেই এক-আধটু ধারণা করে নিল। কী আর বলবেন, তারু সরকার ছিল কবিয়াল। ওসব কবিগিরি ইসলামে হারাম। নবীপাকের আমলে ইমরুল কায়েস নামের এক কাফেরের সঙ্গে তুলনা দেবে তারু সরকারকে। তার বেটি গান-বাজনা করে, একটা মুসলমান সমাজে এসব চলতে পারে না—এরকম কিছু বলে হুজুর গান-বাজনা থেকে মানুষকে দূরে থাকার জন্য নসিহত করবেন।

হায়াত তালুকদার এতক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ জায়নামাজের দিকে তাকিয়ে তসবিহর দানা গুনছিল। তার মনের মতো একটা প্রসঙ্গ উঠল বলে সে তসবিহটাতে চুমো খেয়ে সামনে জায়নামাজে রেখে কাদের মৌলবির দিকে তাকাল। সবার ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কাদের মৌলবি বলল, যদি মরে গিয়ে থাকে আল্লাহ বেহেশ্‌ত নসিব করুন তারু ভাইকে। আর যদি আল্লাহর দুনিয়ার কোথাও তিনি বেঁচে থাকেন তো আল্লাহ তাকে সহি-সালামতে রাখুন।

রুমালে মুখখানা একবার মুছে নিয়ে বলল, সরকারের বেটি আমাকে কথা দিয়েছেন এই গ্রামে তিনি একখানা পাকা মসজিদ তৈয়ার করবেন। নারায়ে তকবির।

মুহূর্তে মসজিদের ভেতরে-বাইরে উপস্থিত মুসল্লিরা ঈমানি জোশের সঙ্গে হাঁক দিল—আল্লাহু আকবার।

BanglaBook.org

কাদের মৌলবি ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করে হাঁক দিল—দ্বীন-ইসলাম জিন্দাবাদ।

সব মুসল্লির হাত মুষ্টিবদ্ধ না হলেও উচ্চকণ্ঠে সবাই পাল্টা হাঁক দিল—শেরেক-বেদাত মুরদাবাদ।

সবাই যখন তকবিরধ্বনি দিচ্ছিল, হায়াত তালুকদার তখন কাতারের এদিক-ওদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল। সবার মুখ নড়ছে দেখে সেও চুপ থাকতে পারল না, বিড় বিড় করে তকবিরধ্বনি দিল, না সবাইকে শালা-সম্মুন্দির পুত বলে গালি দিল, স্পষ্ট করে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে তার মনে এই সন্দেহ চাড়া দিয়ে উঠল, গ্রামে এত লোক থাকতে মসজিদের ইমামকে দিয়ে কেন মসজিদ তৈরির কথা বলাতে যাবে সরকারের বেটি? এর পেছনে কোনো কুমতলব আছে কিনা মনে মনে তাও হিসাব করে নিল সে। পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মসজিদ গড়া দ্বীন-ধর্মের কাজ, বলতে হলে তো ইমাম সাহেবকেই বলতে হবে। তিনি আল্লাহর খাস বান্দা, ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া। তাই খারাপ যে সন্দেহটা তালুকদারের মনে উঁকি দিয়েছিল, তওবা-এস্তেগফার পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তা মন থেকে মুছে ফেলল। ওলামায়ে কেরামদের গালি দিলে যেখানে বউ তালাক হয়ে যায়, সেখানে তাদের ব্যাপারে খারাপ সন্দেহ করলে তালাক না হোক, অন্য কোনো পাপ যে হবে না তার নিশ্চয়তা কী?

গুলনাহারকে মসজিদ তৈরির পরামর্শটা কাদের মৌলবি না দিয়ে বাহরাম কলন্দরও দিতে পারতেন। কলন্দরিয়া পীরের কাছে নিজের বিগত জীবনের ভালো-মন্দ সবকিছু প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানার জন্যই কদিন আগে বৈষমপুর গিয়েছিল গুলনাহার। সঙ্গে ছিল জালাল মির্জা ও তহুরা। বৈষমপুর সে যেত না, যদি না বহেরাতলার সেই সাপের স্বপ্নটা আবার দেখত। তৃতীয় বারের মতো স্বপ্নটা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। অজয় পণ্ডিত নিহত হওয়ার খবরে মানসিকভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার মতো মানুষ আর কয়টা আছে এই দেশে? ধন-সম্পদের পেছনে না ছুটে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় জ্ঞানের পেছনে ছুটলেন, অথচ তাকেই কিনা মেরে ফেলল দুর্বৃত্তরা! মন্দিরে যবনশাস্ত্র থাকাটা কী এমন পাপ, এই প্রশ্নের উত্তর যখন সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখনই আবার দেখল সেই দুঃস্বপ্নটা।

এতদিন এত বলেও জালাল মির্জা তাকে বৈষমপুর নিতে পারল না, এখন সে নিজ থেকেই যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠল। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইবে সে। এমন দুঃস্বপ্ন কি তার অতীত পাপের

BanglaBook.org

জন্যই দেখছে? তেমন কিছু হলে গত জীবনের সব স্বীকার করে পীরের কাছে এর প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানতে চাইবে।

তখন কার্তিক মাস। খাল-বিলের পানিতে টান ধরেছে। পাটকাটা শেষ হয়ে গেছে, মাঠে মাঠে মোটা-তাজা হয়ে উঠেছে ধানের গোছাগুলো। চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। যেন একটা সবুজ সামিয়ানা পেতে রেখেছে আদিগন্ত মাঠে। কার্তিকের মৃদু বাতাসে সামিয়ানায় সাগরের ঢেউ ওঠে।

আশুরা ছিল সেদিন, তার ওপর বিষ্যুদবার। মুরিদরা দলে দলে খানকায় আসছে। কারো হাতে মুরগি, কারো হাতে হাঁস, কেউ গাইগরুর দুধ এনেছে বাঁশের চোঙায় ভরে, কেউ এনেছে বিন্নি চাল বা আখের গুড়। সবই পীরের খেদমতে। জারুলতলার মুসাফিরখানায় এসব উপহার-সামগ্রীর স্তূপ পড়ে গেছে। তহুরা কত করে বলেছে একটা কিছু নিয়ে আসতে, গুলনাহার শুনল না। তার কথা না শোনায় এখন খারাপ লাগছে তার। তবু এই ভেবে সান্ত্বনা পেল, নাই-বা আনল কিছু, নগদ কিছু টাকা পীরের হাতে দেবে বলে তো সে নিয়ত করেছে।

কিন্তু সেই সুযোগ হলো না তার। কী করে হবে? মহিলা বলতে শুধু সে আর তহুরা তো নয়, কয়েক শ মহিলা এসেছে পীরের দিদারে। এখানে আসার পর সে জানতে পারল বাহরাম কলন্দর তো দূরের কথা, তার পূর্বপুরুষের কেউ কখনো কোনো বেগানা মহিলাকে হুজরার ভেতরে ঢুকতে দেননি। গুলনাহারের মনে প্রশ্ন জাগে, ঢুকতে যদি না-ই দেন, এত মহিলা তবে কেন এল? এরা কি সবাই পীরের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে যাবে?

ভুল ভাঙল আরো কিছুক্ষণ পর। তহুরাকে নিয়ে সে মুসাফিরখানার অদূরে বড় আমগাছটার তলায় জড়সড় হয়ে বসা ছিল। সেখানে অন্য মহিলারাও কালো বোরখা গায়ে দিয়ে হাঁটু-মাথা একত্র করে খোঁয়াড়ের গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে বসা। অতিব্যবহারে জীর্ণ রংজ্বলা একটা বোরখা পরেছে গুলনাহার। বোরখাটি তহুরার। সারা পথ বোরখা গায়ে ছিল না, খানকার কাছাকাছি এলে জালাল মির্জার তাগাদায় বোরখাটা গায়ে দিতে অনেকটা বাধ্য হলো। একে তো ভ্যাপসা গরম, তার ওপর যে পোশাক সে জীবনে পরেনি তা পরায় দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। যত কষ্টই হোক, গায়ে বোরখা না রেখে উপায়ও নেই। খানকায় একটা মহিলাকেও বোরখা ছাড়া দেখা যাচ্ছে না। তহুরা বলে, কলন্দরিয়া পীরের খানকায় বোরখা ছাড়া কোনো মহিলা ঢুকতে পারে না। ঢুকলে একটা না একটা বিপদ তার হবেই। হয় তার

BanglaBook.org

মুখে ঠোসা পড়বে, নয়তো গায়ে গুটিবসন্ত উঠবে। কী বিপদের কথা! তহুরা বলে, গরম পীর তারা। খানকায় কেউ বেশরা কাজ করলে তাদের কিছু করতে হয় না, খোদার তরফ থেকেই গজব নেমে আসে।

জোহরের নামাজের পরে আমগাছের চারদিকে কালো কাপড়ের পর্দা টেনে দেওয়া হলো। পর্দার আড়ালে বসে মহিলারা আল্লাহ আল্লাহ করে। সবার চেহারায় কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব, যেন ডাকাতির আসামি হাতজোড় করে জমিদারের সামনে উবু হয়ে বসেছে। বিচারে কী রায় দেবেন জমিদার সেই প্রতীক্ষায় সবাই।

কিছুক্ষণ পর একটা লম্বা কাপড় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো পর্দার ভেতরে। সুতি কাপড়ের কালো পাগড়ি। পাগড়ির এক মাথা পর্দার বাইরে বাহরাম কলন্দরের হাতে, আরেক মাথার কোণা-কাঞ্চি-সুতো...যে যেটা পারল ধরে বসল। তহুরা আগেই চিলের মতো ছোঁ মেরে পাগড়ির একটা কোনা ধরে বসেছিল। তার ইশারায় গুলনাহার এর-ওর পা মাড়িয়ে, পিঠে আর কাঁধে চাপ দিয়ে তহুরার পাশে এসে পাগড়ির ছোট্ট একটা অংশ ধরে বসল।

পর্দার বাইরে থেকে সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল—পড়ুন সবাই, আস্তাগফিরুল্লাহ...। শুনে কারো বুঝতে অসুবিধা হলো না বাহরাম কলন্দরেরই গলার আওয়াজ। কলন্দরিয়া পীর এ নিয়মেই যে তার গুনাহগার আশেকানদের এস্তেগফার পড়ান তা কে না জানে। তবু ফিসফিস করে গুলনাহারকে তহুরা বলল, হুজুর হুজুর! তার মুখে তওবা পড়ো।

পর্দার ভেতর উপস্থিত শতাধিক মহিলা পীরের মুখে মুখে দোয়াটা পড়তে লাগল—আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিওঁ ওয়াতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আযিম।

পীর তার ভক্ত-শিষ্যদের উদ্দেশে কতক্ষণ ওয়াজ-নসিহত করে মুখে মুখে যে ওয়াদাটি পড়তে বললেন তা এরকম—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ও রাসূল। আমি ওয়াদা করছি যে, জীবনে আর নামাজ ক্বাজা করব না, জীবনে আর মিথ্যা কথা বলব না, পরের হক নষ্ট করব না, মা-বাবার মনে কষ্ট দেব না, সুদ খাব না, চোগলখোরি করব না।

পাগড়ির একটা কোনা আলতো হাতে ধরে রাখা ছাড়া মুখে আর কিছুই বলল না গুলনাহার, বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। তবে আগরবাতি আর গোলাপজলের ঘ্রাণে তার ভেতর-বাইরে যেন এক ধরনের প্রশান্তি নেমে এল। খানকায় ঢোকার আগমুহূর্ত

BanglaBook.org

পর্যন্ত সে নিজের মনে গুনগুন করে গান গেয়েছে, অথচ একটা লাইনও মনে পড়ছে না এখন। কী আজব কাণ্ড! এই তাহলে কলন্দরিয়া পীরের কেরামতি! গান-বাজনা পছন্দ করেন না বলে তার ভক্ত-শিষ্যরা তার সামনে এলে তারাও বুঝি গান-বাজনা ভুলে যায়? ভুলে যায়, না পীর ভুলিয়ে দেন কে জানে।

পাগড়ি ছেড়ে কখন সবাই দু-হাত জোড় করে মোনাজাত ধরল খেয়াল করতে পারেনি গুলনাহার। সে আগের মতোই পাগড়ির কোনা ধরে কালো পর্দার দিকে তাকিয়ে। তার চর্মচক্ষু পর্দার দিকে হলেও অন্তর্চক্ষু কিন্তু পর্দার বাইরের মানুষটার দিকেই। পর্দার ফাঁক-ফোকর গলিয়ে একবার মানুষটিকে দেখার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু এতগুলো মেয়েমানুষ ঠেলে সামনে যাওয়ার তো উপায় নেই। কেন যেন ভয় ভয় লাগে তার। জালাল মির্জা বলেছিল, কলন্দরিয়া পীর যখন পাগড়ি পেতে তওবা পড়ান তখন মানুষের সঙ্গে জিনেরাও অংশ নেয়। চর্মচক্ষে তাদের দেখা যায় না। বাতাস হয়ে বাতাসের সঙ্গে, ধুলো হয়ে ধুলোর সঙ্গে, গাছের পাতা বা কুঁড়ি হয়ে মিশে থাকে। কখনো কখনো মানবেতর প্রাণীর রূপ ধরে খানকায় ঘুরে বেড়ায়। আমগাছটার মরা ডালে লাল পিঁপড়াগুলো যে জিন নয়, তা নিশ্চিত করে কে বলবে।

পর্দার ওপাশ থেকে মোনাজাতে মকবুলের শের ভেসে এল

আয় খোদাওয়ান্দো জাঁহা আয় লাম ইয়াজালও লা ইয়াজাল
মালিকো মোখতারো তেরে জাতও হ্যায় আয় জুলজালাল।

পর্দার আড়ালে সমবেত মহিলাদের কাছে এই ভাষা দুর্বোধ্য হলেও গুলনাহারের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই ভাষাতেই কথা বলত বিরজা মাসি। তার কাছে শুনতে শুনতে ভাষাটা রপ্ত করে নিয়েছিল সে। সুরেলা শের শুনতে শুনতে তার কেবলই মনে হয় শের পাঠরত মানুষটি বুঝি জালাল মির্জা বা নসির মণ্ডলের মতো মাটির তৈরি মানুষ নয়। খানিক আগে কে যেন বলেছিল, খোদা তার পেয়ারা বান্দাদের বিশেষভাবে তৈরি করে দুনিয়ায় পাঠান। নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, আখেরি নবীর পর আর কোনো নবী দুনিয়ায় আসেননি এবং আসবেনও না। আউলিয়া কেরামরাই নবীর হয়ে উম্মতে মোহাম্মদির গোমরাহি দূর করেন।

মোনাজাতের মধ্যে বাহরাম কলন্দর যখন কান্না শুরু করলেন, গুলনাহারের চোখের কোণও তখন ভিজে উঠল। পর্দার ভেতর উপস্থিত নারীরা হু-হু স্বরে কাঁদছে, কাঁদছে তহুরাও। কেন এই কান্নাকাটি, তার কোনো

BanglaBook.org

কারণ খুঁজে পায় না গুলনাহার। তার চোখেই-বা পানি কেন? সে কি দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত? নাকি তার মনে অজয় পণ্ডিতের শোক জেগেছে?

দুই চোখের কোণ মুছে অপলক তাকিয়ে রইল কালো পর্দাটার দিকে। পর্দার পাশে চালভর্তি নারকেলের খোরায় আগরবাতি গেঁথে দেওয়া। কার্তিকের ঠাণ্ডা বাতাসে সুগন্ধি ধোঁয়া ঘুরপাক খাচ্ছে পর্দার চারপাশে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাহ্‌রাম কলন্দরের কথাটি গুলনাহারের অন্তরে বাজে। মুরিদদের নসিহত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই মানবদেহ মহামহিম, ক্ষুদ্র পাপ সহজে এই শরীরকে নাপাক করতে পারে না। পৃথিবীর সবকিছু আছে এই মানবদেহে। মানুষ মহান। এসো ভাই ও বোনেরা, নিজের ভেতর নিজেকে খোঁজো।

তহুরার ধাক্কায় চমকে ওঠে গুলনাহার—চল চল মা, হুজরায় চলে গেছেন হুজুর।

গুলনাহার বলল, হুজুর চলে গেছেন! আমি তার সাথে দেখা করব না?

পাগলি মেয়ে! গুলনাহারের হাত ধরে টেনে বাড়ি ফেরার তাগাদা দেয় তহুরা।

বৈষমপুর থেকে ফেরার দুদিন পরই কাদের মৌলবিকে বাড়িতে মিলাদের দাওয়াত দিল। সপ্তাহের সাত দিনই কোনো না কোনো বেলায় দাওয়াত থাকে তার। যারা নিয়মিত জামায়াতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে তাদের চেয়ে বেনামাজিরাই তাকে দাওয়াত দেয় বেশি। কবিরা-সগিরা যত গুনাহ্ তারা করে, মসজিদের ইমামকে এক বেলা দাওয়াত করে খাওয়ালে তার পুরা না হোক অর্ধেক হলেও মাফ করে দেবেন খোদা—মূলত এই আশা থেকেই মৌলবি দাওয়াত করে খাওয়ানো।

খানাপিনা শেষে মোনাজাত ধরে দোয়া করে গুলনাহারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাদের মৌলবি যখন ফেরার জন্য খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, অমনি ভেতর থেকে গুলনাহারের গলার আওয়াজ ভেসে এল—আপনার সাথে একটু কথা আছে হুজুর।

বিস্মিতচোখে হামজার দিকে তাকাল কাদের মৌলবি। হাত মেলানোর উদ্দেশ্যে ভদ্রতার সঙ্গে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরল হামজা। তার হাতের তালুয় চার আনা কি আট আনা পয়সার সুড়সুড়ি লেগে হে হে করে হেসে উঠল মৌলবি। পয়সাটা পাঞ্জাবির পকেটে চালান করে দিয়ে খাটের ওপর বসতে বসতে বলল, জি, বলুন কী কথা।

BanglaBook.org

বেড়ার আড়ালে বসে গুলনাহার বলল, আপনি যদি একটা ওয়াদা দেন, তবে কিছু কথা জানানোর ইচ্ছে আছে আপনাকে।

কী ওয়াদা দেওয়া লাগবে বলুন। পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে মুচকি হাসি দিয়ে বলল মৌলবি।

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। হেঁশেলে থালা-বাসন মাজায় ব্যস্ত রেহেনা। মৌলবির সঙ্গে গুলনাহার কথা শুরু করার পর দেউড়ির দিকে হাঁটা ধরল হামজা। কাঁচা-সুপারির পান চিবুতে চিবুতে গুলনাহারের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে কাদের মৌলবি। তারু সরকারের নিরুদ্দেশ হওয়া, খেতে না পেয়ে মা কর্তৃক সন্তানকে বেচে দেওয়া, তারপর সোবানালি কর্তৃক সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় বেচে দেওয়া—তাকে তাকে সাজানো জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের কথা বলে যেতে লাগল গুলনাহার। শুনতে শুনতে কাদের মৌলবির কণ্ঠে আহ্ আহ্ ধ্বনির আফসোস ঝরে পড়তে লাগল।

সাবেরি বাঈয়ের কোঠার কথা যখন বলতে শুরু করল গুলনাহার, তখন আহ্ আহ্ ধ্বনির বদলে তার মুখ দিয়ে বারবার আস্তাগফিরুল্লাহ নাউযুবিল্লাহ শব্দ দুটি বেরিয়ে আসতে থাকে। এই গুনাহগার রমণীর কবরের আযাবের কথা ভেবে, নাকি কাঁচা-সুপারির মথাধরা দকে কে জানে, কাদের মৌলবির কপালে চিকন ঘাম জমতে শুরু করল। রাতা মোরগের রান, রুই মাছের দুটি ভাজা টুকরো আর নানা পদের তরকারি দিয়ে পেটভরে খেয়ে গুলনাহারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চেহারায় এতক্ষণ নমনীয় যে ভাবটা ছিল, মুহূর্তে তা উবে গেল। তার বদলে ভেসে উঠল মর্দে মুজাহিদের জোশ। দ্বীনদার মুমিন-মুসলমানদের গ্রাম এই হরিদশ্বে তারই অজান্তে এতদিন কিনা একটা কবিরাহ গুনাহর গাদা বসবাস করে আসছে! নাউযুবিল্লাহ!

তারপর রাজমহলের প্রসঙ্গে কথা শুরু করল গুলনাহার। সে রাজ-জলসাঘরের নটী ছিল, এই কথা যখন বলতে শুরু করল, তখন মৌলবির উচ্চারিত আস্তাগফিরুল্লাহ নাউযুবিল্লাহ শব্দ দুটির ধ্বনি খাদে নামতে থাকে। নামতে নামতে একসময় আর শোনাই যায় না। বিড় বিড় করে সে ওই শব্দ দুটি উচ্চারণ করছে, না কাঁচা-সুপারির কণা চিবুচ্ছে বোঝা যায় না। তার কেবলই মনে হয়, যেন সে সাদেক আলী মুন্সীর পুঁথি শুনছে। মাথা নাড়ায় কাদের মৌলবি—না না, সাদেক আলী মুন্সীর পুঁথি নয়, কৈশোরে পালাকারদের মুখে শোনা ভেলুয়া সুন্দরী বা কমল সওদাগরের পালা হবে হয়ত।

যুবরাজের হাতে লাঞ্ছিত হওয়া এবং মহারাজকে কুর্নিশ না করার অপরাধে মহল থেকে বের করে দেওয়ার প্রসঙ্গ যখন বলতে শুরু করল

BanglaBook.org

গুলনাহার, তখন ওই আরবি শব্দ দুটির উচ্চারণ আবার জোরাল হয়ে উঠল। বলল, ঠিকই আছে, আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নোয়ানো শেরেক। আপনি ঠিকই করেছেন কুর্নিশ না করে। মুসলমান হলে একটা কথা ছিল, মহারাজ তো কাফের।

গুলনাহার বলল, আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই হুজুর।

আলবৎ করবেন।

আপনি ওয়াদা করুন, এসব কথা কখনো কাউকে বলবেন না?

না না, কী যে বলেন, কখনোই না। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করেন। সুবহানাল্লাহ!

বেড়ার ফাঁকে গুলনাহার এক টাকার চারটা নোট বাড়িয়ে দিল মৌলবির দিকে। বলল মসজিদে মোমবাতি কিনে দেবেন হুজুর।

খুশিতে গদগদ মৌলবি বলল, আলহামদুলিল্লাহ! খোদা আপনার দান কবুল করুন।

কিন্তু গুলনাহারের সারা জীবনের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে তা এখুনি বলতে চায় না মৌলবি। মুখস্থ আছে তাতে কি, দ্বীন-ধর্মের কথা কেতাব না দেখে বলা হারাম।

কেতাব দেখে বুলক, নইলে মুখস্থ বলুক, কাদের মৌলবি এই জরুরি মাসায়ালাটা গুলনাহারকে জানাতে দেরি করল না। সেদিন বিকেলেই গুলনাহারকে গ্রামে একটা পাকা মসজিদ নির্মাণের পরামর্শ দিল। বলল যে, এ ছাড়া প্রায়শ্চিত্তের আর কোনো উপায় তার জানা নেই।

এতটা দিন গুলনাহারের মাথার ওপর নিজের বাবার মতো ছায়া দিয়ে রেখেছিল জালাল মির্জা। কে জানত এমন সুস্থ-সবল মানুষটা এত তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে চলে যাবে। যেদিন বৈষমপুরে পীরের খানকায় গেল, সেদিনই চেহারা দেখে তার অসুস্থতার ব্যাপারটি টের পেয়েছিল গুলনাহার। জিজ্ঞেসও করেছিল তাকে। বলেছিল, বুকের বাঁ-পাশে আজকাল কেমন একটা চাপ অনুভব করছে। ফেরার সময় বার বার ফিরে তাকাচ্ছিল শ্বশুরবাড়ির দিকে। তখন তার চেহারাটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছিল। গুলনাহার ভেবেছিল, গত জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় হয়ত মন খারাপ হয়েছে মির্জার।

BanglaBook.org

বৈষমপুর থেকে ফেরার দশ দিনের মাথায় কঠিন জ্বরে পড়ল জালাল। সে কি জ্বর! কপালে চাল রাখলে মুড়ি ফোটার মতো অবস্থা। খবর পেয়ে ছুটে গেল গুলনাহার। দিন-রাত তার সিথানে বসে মাথায় পানি ঢালল। কিছুতেই কিছু হলো না, জ্বর এই কমে তো ফের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। টানা পাঁচ দিন জ্বরে ভোগার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে মসজিদে গেল। নামাজ শেষে পুকুরপাড়ে বড় বউয়ের কবরের সিথানে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে মোনাজাত করল। ঘরে ফিরে যেই না ভাত খেতে বসল, অমনি শুরু হলো রক্তবমি। ভাত আর খাওয়া হলো না, হেঁশেলের ঢেঁকির নিচে বা উনানের ভেতর হয়ত মালেকুল মউত লুকিয়ে ছিল।

কত আশা ছিল গুলনাহারের, বাড়ির মতো মসজিদটাও নিজে তদারকি করে গড়ে দেবে জালাল। সুজা মসজিদের মতো গম্বুজঅলা মসজিদ গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল। বহেরাতলার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল ওই জায়গায় যেহেতু গুলনাহার তার বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে, মসজিদটা সেখানেই হোক। মসজিদের সামনে কুয়ো কাটার জন্য ডোঙাতলার এক মাইট্যাল সর্দারের সঙ্গে কথা পাকাপাকিও করে রেখেছিল। কুয়োর অর্ধেক কেটে ফেলল মাইট্যালরা, অথচ জালাল নেই।

কুয়ো কাটা শেষ হলে কামলাদের লাগিয়ে দেওয়া হলো ইট কাটার কাজে। কামলাদের বেশিরভাগই হরিদশ্বের। মাঘ মাস। ক্ষেত-খামারে কাজ নেই। বসে না থেকে মসজিদের কাজ করাটা মন্দ কী। টাকায় টাকা, সওয়াবে সওয়াব। কুয়ো কাটা, ইট কাটা বা ইট পোড়ানোর কাজে কত লোকের দরকার। তিতাস এলাকার কামলাদের খেতে দিয়ে থাকতে দিয়ে আবার নগদ টাকা দিতে গেলে খরচ বেড়ে যায়। তা ছাড়া এ সময় কামলা পাওয়াটাও কঠিন।

লেনদেনের হিসাব-কিতাব হামজার হাতে থাকলেও সবকিছুর তদারকি করছে নসির মণ্ডল। নিঃস্বার্থভাবে লেগে আছে লোকটা। কামলারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, দিনে কয়টা ইট কাটা হলো, কোত্থেকে আনা হবে ইট পোড়ানোর কাঠ—সবকিছুর তদারকি করছে। আর কাদের মৌলবি তো তার সঙ্গে লেগেই আছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ও নাওয়া-খাওয়ার সময় ছাড়া বাকি সময় বহেরাতলাতেই পড়ে থাকে। গুলনাহারের অসিলায় আল্লাহ তার আয়-রোজগার বাড়িয়ে দিয়েছে। গুলনাহার নটী কি বেশ্যা ছিল তাতে কি? আল্লাহ গাফুরুর রাহিম, মসজিদের অসিলায় তার অতীত জীবনের সব গুনাহ-খাতা নিশ্চয় তিনি মাফ করবেন। কুয়ো কাটার আগে গ্রামবাসীদের নিয়ে

BanglaBook.org

বড়সড় একটা মিলাদ হলো, তবারুক হিসেবে সবাইকে খাওয়ানোর জন্য বাতাসা কিনতে যে টাকা দিয়েছিল গুলনাহার, তার অর্ধেকও খরচ হয়নি, উদ্বৃত্ত টাকা তার পকেটেই গেছে। মিলাদ পড়ানোর হাদিয়ার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। ইট কাটা শুরু হওয়ার আগে আরেক দফা দোয়ার মাহফিলের জন্য বাড়িতে একটা কোরানখানির পরামর্শ দিল। অমত করল না গুলনাহার। দূরের গ্রাম থেকে দশজন কোরানে হাফেজকে দাওয়াত করে আনা হলো। প্রত্যেকের ভাগে দুই পারা পড়লেও কাদের মৌলবি একাই নিল দশ পারা। নিলে কী হবে, দশ পারা তো তাকে খতম দিতে হয়নি। রোজ সকালেই তো সে কোরান তেলাওয়াত করে। গত এক মাসে পনের পারা তেলাওয়াত করেছে, সেখান থেকে দশ পারা এই কোরানখানি বাবদ উসুল করে দিয়েছে। হাতে ছিল আরো পাঁচ পারা। অল্পবয়সী এক হাফেজকে সে প্রস্তাবটা দিয়েছিল—চাইলে তুমি আমার এই পাঁচ পারাও নিতে পারো, তবে টাকা কিন্তু তুমি অর্ধেক পাবে। হাফেজ রাজি হলো না। বলল, তাহলে তো আমারও এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে তেলাওয়াত করতে হতো না, আমিও তো রোজ সকালে দুই পারা করে তেলাওয়াত করি, সেখান থেকে দিয়ে দিলেই তো পারতাম।

কথা আর বাড়ায়নি কাদের মৌলবি। ওই গেদা হাফেজের মুখে চটাং চটাং কথা শুনে মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল। পাছে কেউ শুনে ফেলে, তাই বহু কষ্টে মেজাজ দমিয়ে রেখেছে।

মিলাদ, কোরানখানি, দফায় দফায় দোয়ার মাহফিল—এসবের উসিলায় সংসারে তার বরকত দিয়েছেন আল্লাহ। টাকা-পয়সার অভাবে বড় ছেলেটার খতনা দিতে পারেনি এতদিন। কতদিন ধরে বউটার পেটের অসুখ। অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করে এই এক সমস্যা হয়েছে তার, চারটা ছেলেমেয়ে জন্ম দিতে না দিতেই চোপাচাপা ভেঙে রোগ-ব্যারামে পড়ে গেছে বউটা। হায়েজ-নেফাসের ঠিক থাকে না। দেখলে তার মনে হয় যেন পঞ্চাশ বছরের একটা বুড়ি। অথচ তার বয়স সবে ত্রিশ।

সে যা-ই হোক, সুযোগ মানুষের জীবনে সবসময় আসে না। এই সুযোগে খলিফা ডেকে আগে ছেলের খতনাটা করিয়ে নিক, তারপর ভালো একজন কবিরাজের কাছে নিয়ে বউয়ের চিকিৎসা করাবে। এই ফকির-মিসকিনের গ্রামের মসজিদে পড়ে থেকে জীবনে তার কিছুই হলো না। গ্রামের কেউ জাকাত-ফিতরা তো দূরে থাক, ঠিকমতো কবর জিয়ারতের পয়সাটাও দিতে চায় না। সবাই শুধু নেওয়ার তালে, দেওয়ার তালে কেউ নেই। গুলনাহারকে

BanglaBook.org

সে বলে দিয়েছে জাকাত-ফিতরা যেন সে দেখে-শুনে দান করে। কারা জাকাত-ফিতরা পাওয়ার হক রাখে, গুলনাহার যদি তা বুঝতে না পারে, তবে দায়িত্বটা সে তার ওপরই ছেড়ে দিক। এসব টাকা যাকে-তাকে না দিয়ে তালেবুল এলেমদের দেওয়াটাই উত্তম। তার মক্তবে শ-খানেক তালেবুল এলেম আছে। কায়দা সিপারা কোরান শরীফ রেহেল জুজদান—কত কিছুর দরকার হয়। আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে তারা গুলনাহারের দুনিয়া-আখেরাত দুই জাহানের কামিয়াবির জন্য দোয়া করবে।

মসজিদ তৈরির কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পাঁজা তৈরি করে ইট পোড়ানোও হয়ে গেছে। শুক্রবার দেখে একদিন গ্রামের মুরব্বিদের ডেকে ইটগাঁথার কাজ শুরু হবে। চুন-সুরকির গম্বুজঅলা মসজিদ হচ্ছে হরিদশে, আশপাশের গ্রাম থেকে প্রতিদিন দলবেঁধে নারী-পুরুষ দেখতে আসছে। মহিলারা বাড়িতে এসে গুলনাহারের মাথায় হাত বুলিয়ে যায়—খোদা তোমার মনের আশা পূরণ করুক। এত বড় একটা সওয়াবের কাজ করছ তুমি, বিনা হিসেবে আল্লাহ তোমার জান্নাত নসিব করুক।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে গ্রামে, অথচ হায়াত তালুকদারকে কেউ একটিবার কিনা বলার প্রয়োজন মনে করল না! কুয়ো কাটার আগে মিলাদের সময় সে গ্রামে ছিল না ভালো কথা, ইট পোড়ানোর আগেও তো হামজা বা নসির মণ্ডল তাকে একটিবার জানাতে পারত। নিজের গ্রামের মানুষ এভাবে তাকে অপমান করছে, দুঃখের কথাটা সেদিন দাউদকে না বলে পারল না। দাউদ অবশ্য উচিত কথাই বলেছে—মৌলবি তো সেদিন মসজিদে প্রকাশ্যেই খবরটা দিয়েছে সবাইকে, আলাদা করে আপনাকে বলতে হবে কেন?

হায়াত বলল, তারপরও গ্রামের মাথা হিসেবে আমাকে একটি বার আলাদা করে বলা উচিত ছিল না?

হেসে উঠল দাউদ। বকের মতো গলা টান টান করে, চোখ দুটো গুটিগুটি করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বলল, কী ব্যাপার, হাসির কী হলো?

হাসি থামাল দাউদ। তারপর হয়াতকে ভালো একটা পরামর্শ দিল—এই কথা আমাকে বলেছেন তো বলেছেন, আর কারো কাছে বলতে যাবেন না।

কী কথা?

এই যে বললেন আপনি গ্রামের মাথা?

আমি মাথা না তো মাথা কে? ওই নসির মণ্ডল, নাকি হামজা?

মাথা যে-ই হোক, নিজেরে তো আর কেউ মাথা বলে দাবি করতে পারে

BanglaBook.org

না। শুনলে লোকে বলবে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। নিজের ঢোল নিজে পেটায়।

চুপসে গেল হায়াত। ঠিকই বলেছে দাউদ। নিজের বাপকে উদ্দেশ করে মনে মনে গালি দিল কয়েকবার। জারউয়ার বেটা জারউয়ার কারণেই আজ তাকে হরিদশ্বের কেউ দাম দিতে চায় না। সারা জীবন রেন্ডিবাজি করেছে ভালো কথা, শেষ বয়সে কী দরকার ছিল আলী মিয়ার তালাক দেওয়া বৌটাকে হিল্লা বিয়ে করার? মানুষের দোষ দিয়ে লাভ কী। সবই তার নসিবের দোষ। বাপের কুকীর্তির খেসারত তাকে দিতে হচ্ছে।

দক্ষিণপাড়ার সবাই দাবি করেছিল, মসজিদ যখন একটা হচ্ছে এই পাড়ায়, তবে ঈদগাহটাও এখানে হোক। এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে সেদিন সন্ধ্যায় মক্তবঘরে পঞ্চায়েতসভার বৈঠক হয়। রাজ্জাক সারেং গিয়ে হায়াত তালুকদারকেও ডেকে আনলো। দক্ষিণপাড়াবাসীর এরকম একটা আবদারের কথা শুনে কাদের মৌলবির বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ল। এক গম্বুজ কেন, দশ গম্বুজঅলা মসজিদ বানালেও এখানে ঈদের জামাত করা যাবে না। দুই ঈদের জামাত হবে গ্রামের বর্তমান মসজিদের কাঁঠালতলার ঈদগাহেই। কেননা ঈদের জামাত করার জন্য যে পরিমাণ মুসল্লির দরকার হয়, তা কি আছে দক্ষিণপাড়ায়? গুলনাহারের বাড়িসহ সব মিলিয়ে বারোটি মুসলমান পরিবার, বাকিরা তো হিন্দু। বারো ঘরে সাবালকের সংখ্যা কত? বড়জোর পনেরো জন? এত অল্প মুসল্লি দিয়ে জুমার জামাত হলেও ঈদের জামাত হবে না।

কথা ঠিকই বলেছে কাদের মৌলবি, রাজ্জাক সারেং ও নসির মণ্ডলেরও একই মত। দক্ষিণপাড়ায় একটা পাঞ্জেগানা মসজিদ আরো আগে হওয়ার দরকার ছিল। দক্ষিণপাড়া থেকে উত্তরপাড়ার দূরত্ব তো কম নয়। গ্রীষ্মকালের কথা আলাদা, শীতকালে ফজরের অক্তে আল-ডাঙার পথ পাড়ি দিয়ে জামাতে শরিক হওয়া তো আসলেই তাদের জন্য কষ্টকর। সরকারের বেটির অসিলায় এখন মসজিদ একটা হচ্ছে ভালো কথা, তাই বলে এখানে ঈদের জামাতের কথা বলে সমাজকে দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়ার কোনো মানে নেই। জাজিনগর রাজ্যের চাকলা রৌশনাবাদের হরিদশ্ব নামে একটাই গ্রাম, এই গ্রামের সমাজও হবে একটা।

হায়াত তালুকদার বলল, জুমার নামাজই-বা হওয়ার দরকার কী? গ্রামে তো জুমা মসজিদ একটা আছেই।

কাদের মৌলবি বলল, আচ্ছা না হয় জুমা মসজিদই হলো, কিন্তু খতিব

BanglaBook.org

কোথায় পাওয়া যাবে? অন্তত মেশকাত পড়া আলেম ছাড়া জুমার নামাজ তো পড়াতে পারবে না।

জসিম বলল, কেন হুজুর, আপনি আছেন না?

নাউযুবিল্লাহ! এক ইমাম কী করে দুই মসজিদে জুমা পড়ায়?

আলোচনার ইতি টানল নসির মণ্ডল—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। এখনো ইটগাঁথাও শুরু হয়নি, তার আগেই ঈদের জামাত নিয়ে প্যাঁচাল।

শেষে সবাই এই সিদ্ধান্তে একমত হলো যে, মসজিদ তৈরির কাজ শেষ হলে আপাতত পাঞ্জেগানা মসজিদই থাকবে। ভালো একজন খতিব পাওয়া গেলে তখন জুমা চালু করা যাবে, যদি সরকারের বেটি রাজি হয়। কেননা খতিবকে তো বেতন দেওয়ার ব্যাপার আছে। কাদের মৌলবি এই গ্রামের ছেলে, খেয়ে না খেয়ে সে আল্লাহর ঘরের খেদমত করে যাচ্ছে, বাইরে থেকে একজন আলেম আনতে হলে তাকে তো মোটামুটি বেতন দিতে হবে।

বৈঠক শেষ হতে হতে রাত দেড় প্রহর হয়ে গেল। নানাজনের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে রাত করে ফেলল হামজা। এদিকে মসজিদের কাঁঠালগাছের তলায় তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে জসিমের পায়ে শেকড় গজায়। হামজার দেরি দেখে নিজমনে গেজিয়ে যাচ্ছে সে। এই ঘন কুয়াশার মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? একজনের সঙ্গে কথা শেষ করে হামজা 'এই আসছি' বলে আরেকজনের সঙ্গে শুরু করে। গুলনাহার মহিলা মানুষ, গ্রামের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না, তার হয়ে কাজটা তো হামজাকেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে একটু দেরি তো হবেই।

জসিমকে এগিয়ে দিতে রাস্তার তেমাথা পর্যন্ত আসতে হলো হামজাকে। এই চান্নি রাতেও জসিম ভয় পায়। খিদায় পেট চিনচিন করছে হামজার। সেই যে দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে তারপর তো পেটে আর কিছু পড়েনি। নাছোড়বান্দা জসিম, কিছুতেই সে কবরস্থানটা পেরিয়ে একা বাড়ি যেতে পারবে না। বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে যেতে হলো তাকে।

ঠাকুরবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে তেঁতুলগাছটার সামনে এলে কার যেন গলার আওয়াজ শুনতে পেল হামজা। এত রাতে কেউ এদিকে আসে না তেমন। তেঁতুলতলায় মাথায় মাফলার পেঁচানো দুই লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে তারা কথা বলতে বলতে তেঁতুলতলার নামার রাস্তা ধরে উত্তরদিকে হাঁটা ধরল। চাঁদের আলোয়

BanglaBook.org

পুরোপুরি চেনা না গেলেও নীল লুঙ্গি আর সাদা চাদর দেখে হামজার অনুমান হলো—তাদের একজন দাউদ, অন্যজন ডোঙাতলার টুকু। আজকাল প্রায়ই দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। হামজা ভাবে শেষ রাতে হায়াত তালুকদারের ঘের বেড় দেওয়া হবে হয়ত।

সেদিন সোহাগিকে নিয়ে গুলনাহারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তহুরা। গুলনাহার দুজনকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দিতে দিতে এশার ওয়াক্ত হয়ে গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম তহুরার বাড়ির বাইরে আসা। আসত না, এসেছে গুলনাহারের সঙ্গে জরুরি একটা আলাপ করতে। বাবার মৃত্যুর পর ছেলেরা আগের তুলনায় তার সঙ্গে অনেক বেশি শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। আগে তো একটা অসিলা ধরে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করত, এখন সেসবের ধার ধারে না, বড় আর মেজ বউটা মাজায় আঁচল পেঁচিয়ে বাড়ির ঘাটায় এসে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। শুধু হৈ-হাঙ্গামা করলে একটা কথা ছিল, রোজ এসে হার্মাদদের মতো বাড়ির এটা-সেটা নিয়ে চলে যায়। সকালে গাছ থেকে নারিকেল পেড়ে নিল তো বিকেলে সব কটি সুপারিগাছ উজাড় করে বস্তা বেঁধে নিয়ে গেল। একটিবার তহুরাকে জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করে না। কদিন আগে ছেলেরা এসে পুকুরের পশ্চিমপাড়ের বড় নিমগাছটা কেটে নিয়ে গেল। তহুরা বাধা দিতে গেলে গালিগালাজ তো করলই, মেজ ছেলেটা যা করেছে তা বলতে গেলে বুক ফেটে কান্না আসে তহুরার। সে তাদের সৎ মা, তাই বলে গায়ে হাত তুলবে? ধাক্কা খেয়ে গাছের গুঁড়ির ওপর পড়ে গিয়ে তার ডান হাতের কনুইর চামড়া ছিলে গেছে। পাড়াপড়শিরা বলেছিল পঞ্চায়েতে নালিশ করতে, কিন্তু ছোট ছেলেটা এসে হাত-পা ধরে ভাইদের হয়ে মাফ চাইল, আর তাতেই মন গলে গেল তার। সোহাগিকে নিয়েই তার যত জ্বালা, নইলে এত অশান্তির মধ্যে কে থাকত? সে তো আর ফকিরের বেটি নয়, আজীবন বাবার বাড়ি পড়ে থাকলেও কেউ টু শব্দটি করবে না। বোবা মেয়েটাকে নিয়ে বাবার ঘাড়ে কী করে চড়ে বসে! কানা, ল্যাংড়া যার কাছেই হোক, বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে সে এখন বাঁচে। গুলনাহারও তাতে একমত। দরকার হলে বিয়ের সব খরচাপাতি সে বহন করবে। কিন্তু তহুরার আবদার শুনে তার মাথায় যেন ভাদ্র মাসের ঠাটা পড়ল। কী আবদার? হামজার কাছে সোহাগিকে বিয়ে দিতে চায় তহুরা। এ ব্যাপারে সে গুলনাহারের মতামত জানতে এসেছে।

BanglaBook.org

রাগটা গুলনাহারের মাথা থেকে নামাতে সময় লেগেছে। এমন একটা অন্যায় আবদার শোনার পর সে খানিকক্ষণ দুই ভ্রু বাঁকা করে তহুরার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, পরে হেঁশেলে যাওয়ার নাম করে পুকুরঘাটে গিয়ে বসে থেকেছে। ইচ্ছে হয়েছিল মন্দ-শক্ত কিছু কথা শুনিয়ে দিতে মা-মেয়েকে। গত জীবনের কথা ভেবে কষ্ট করে ইচ্ছেটাকে দমিয়েছে। যত যা-ই হোক, তাদের আশ্রয় না পেলে তো এতদিনে তার পাত্তাই থাকত না। বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হতো হয় উদয়াচলে সাবেরি বাঈয়ের কোঠায়, নয় পানামনগরের বেশ্যালয়ে। মনে কষ্ট থাকলেও গলার আওয়াজ নরম করে তাকে বলতে হয়েছে—ঠিক আছে মামি, হামজার সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে আমার মত পরে আপনাকে জানাব।

পরে গুলনাহার ভাবল, তহুরার আবদারটা অন্যায় হবে কেন? একটা বোবা মেয়েকে হামজার কাছে গছিয়ে দিতে চাচ্ছে বলে? না, সেজন্য তো নয়। তবে কী জন্য? নিজেকেই প্রশ্ন করে গুলনাহার। সঠিক উত্তরটি পায় না। গেলবার জেয়াফতে এসে তহুরা তাকে বলেছিল, যা হওয়ার হয়েছে, নতুন করে আবার বিয়ের কথা ভাবো গুলনাহার। পঁয়ত্রিশ এমন কী আর বয়স, তুমি চাইলে ডজন ডজন ছেলে তোমাকে বিয়ে করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি তো দেখতে ভালো না, তবু প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তোমার জালাল মামা কি আমাকে ঘরে তোলেনি?

শুনে সে কী হাসি গুলনাহারের। তহুরা বলেছিল, হাসিস না মা, স্বামী-সন্তান ছাড়া এই জীবনের কোনো দাম নাই।

দাম যে আসলেই নেই, তা গুলনাহারের চাইতে কে আর ভালো বোঝে? স্বপ্ন তো তারও ছিল একদিন। সোবানালির বাড়ি থাকতেই স্বামী-সংসারের স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেছিল। সাবেরি বাঈয়ের কোঠায় স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে। তবু ভাঙা স্বপ্নটাকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভাগ্যে যা লেখা ছিল তা খণ্ডানোর সাধ্য তো তার নেই।

তবু তহুরার সেদিনের কথাটা গুলনাহারের মনে আজকাল প্রায়ই বাজে। যতবারই বাজে ততবারই তার সামনে এসে দাঁড়ায় একটি মানুষ—হামজা। জোছনামাখা সুধাবতীর বালুচর, ডুলার মাছের আঁশটে গন্ধ, এই বাড়ি, বাড়ির ঘাটায় রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, কদম, কামিনী, কিংবা এই জগৎ-সংসার থেকে তার হুকুমের গোলাম হামজাকে সে আলাদা করতে পারে না। একেকবার ভেবেছে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে নিজের দেশে ফিরে যেতে বলবে। বাপ-দাদার ভিটায় ফিরে গিয়ে সে সুখে-শান্তিতে বাকি জীবন কাটাক। কিন্তু

BanglaBook.org

সেই ভাবনায় বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারেনি। ভাবনার সুতাটাকে বাড়ির সীমানা থেকে বেশি দূর ছড়াতে পারে না। এটা ভাবতে গিয়ে কতবার চোখের পাতা ভিজিয়েছে। তখন তার মনে উদয় হয়েছে আরেক ভাবনা—না, কোথাও যেতে দেবে না হামজাকে। এই জীবন যৌবন ও মরণের সঙ্গী হয়ে থাকবে হামজা। এই সমাজ দুজনের সম্পর্কটাকে ভালোভাবে নেবে না তাতে কি, সবকিছু বেচে দিয়ে তারা চলে যাবে অন্য কোথাও। হরিদশ্বে তো তার কোনো বাঁধন নেই। মায়ার বাঁধনে বেঁধেছিল জালাল মির্জা। সে যখন চলে গেছে, আর পিছুটান কী?

এই ভাবনাটাতেও বেশি দিন স্থির থাকতে পারে না। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে ভুলে যায়। ভুলে থাকতে থাকতে এই কদিনে ভুলে গিয়েছিলও, তহুরার কথা শুনে ভাবনাটা আবার চাঙা হয়ে উঠল। তহুরা বিদায় নেওয়ার পরপরই কাদের মৌলবি এল। একটা দরকারি মাস্‌লা জানার জন্য আসতে বলেছিল গুলনাহার। তার জন্য ভাত-তরকারি আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। মেহমান এসেছে বাড়িতে, সেই উপলক্ষে মৌলবিকেও খাওয়াবে এক বেলা। আল্লাহওয়ালা মানুষকে যত খাওয়ানো যায় ততই সওয়াব। বাপ-দাদার কবর-আযাব মাফ হয়। কিন্তু মৌলবির দেরি দেখে ভাবল আজ হয়ত আসবে না আর।

পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে কাদের মৌলবি বলল, দরকারি একটা কাজ ছিল, তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।

কাঠকয়লার আগুন জ্বলছিল উঠোনে। মোড়া পেতে সেখানেই বসেছে মৌলবি। গুলনাহার বলল, ভেতরে আসেন হুজুর, খাবেন না?

না, আজ আর না খাই। বাড়ি থেকে খেয়ে এলাম মাত্র।

এটা কেমন কথা! আপনাকে না বলেছিলাম আজ রাতে এখানে খাবেন।

হে হে করে হেসে উঠে মৌলবি বলল, সব সময়ই তো খাই, আজ থাক। বরং এক খিলি পান দেন।

একটা জলচৌকি দিয়ে গেল রেহেনা। চৌকিটা টেনে ওপাশটায় বসল গুলনাহার। কাদের মৌলবির সামনে এখন আর পর্দা করে না। সে মনে করে মনের পর্দাই আসল। জীবনের গভীর গোপন কথাটা বলে দ্বীনদার-পরহেজগার এই মানুষটার কাছে নিজেকে তো সেই কবে সে বেপর্দা করে দিয়েছে। দুনিয়া-আখেরাত দুই জাহান এখন তার হাতেই বাঁধা। ইচ্ছে করলে সে এই গ্রামে গুলনাহারকে মানে-সম্মানে রাখতে পারে, ইচ্ছে করলে অপমান করে তাড়িয়েও দিতে পারে। অবশ্য মৌলবিও এখন আর গুলনাহারকে বেগানা আউরাত ভাবে না।

BanglaBook.org

পানদানিটা মৌলবির দিকে বাড়িয়ে ধরল গুলনাহার—নেন হুজুর, পান নেন।

এক খিলির বদলে পানদানিতে গোটা পাঁচেক পান দেখে মৌলবির চোখে আনন্দের ঝিলিক। সেরা পানখোর কাদের মৌলবি, সঙ্গে পার্বত্য-জাজিনগরের খাঁটি সাদাপাতা। হুঁকায় অভ্যেস নেই তাতে কি, দিনে কম করে হলেও তিরিশ খিলি পান খেয়ে হুঁকার ষোলআনা উসুল করে ছাড়ে। ভাগ্যিস লোকজন তার কাছ থেকে তাবিজ-তুমার নিতে এলে আধা বিড়া পান এবং দেড়-দুই হালি সুপারিও আনে। নইলে চাঙে উঠত তার পান খাওয়া।

আদেখলার মতো একটার জায়গায় দুটো পান এবং অর্ধেক সুপারি মুখে পুরে দিয়ে বলল, বলুন, কী মাস্‌লা জানতে চান।

গুলনাহার বলল, আচ্ছা, মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে কেতাব কী বলে?

পানের পিক ঠেকানোর জন্য নিচের ঠোঁটটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে মুখটাকে কালিবাউশের মুখের মতো করে কাদের মৌলবি বলল, নাউযুবিল্লাহ!

জি?

পিকটুকু আর ধরে রাখতে পারল না মৌলবি। ঘাড় বাঁকিয়ে পিক ফেলে ডান হাতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে সাদাপাতার ডিব্বাটা বের করতে করতে বলল, তওবা, তওবা! আল্লাহর ঘর, মুর্দার ঘর—এই দুই ঘরে নারী জাতির যাওয়া বিলকুল হারাম। এরকম খায়েশ আপনার মনে পয়দা হলো কী করে? কাফ্‌ফারা দেওয়া ছাড়া এই গুনাহ মাফ হবে কিনা সন্দেহ। কেতাব দেখতে হবে।

বাতাসের ঝাপটায় নিভে যাওয়া কুপির মতো হঠাৎ নিভে গেল গুলনাহার। এত টাকা-পয়সা খরচ করে সে মসজিদ বানাচ্ছে, নামাজ না পড়ুক, ভেতর-বাহিরটা একটিবার দেখে আসতে পারবে না? একটিবার দেখার খুব শখ তার। লোকের মুখে শুনে কি মনের আশ মেটে? মেয়েলোকের টাকায় মসজিদ নির্মাণ জায়েয, অথচ তার জন্য মসজিদে যাওয়া হারাম, এ কেমন বিধান? কাদের মৌলবিকে গুলনাহারের এই কথাটা বলতে ইচ্ছে হলো—কই, হিন্দুদের মন্দিরে তো নারী-পুরুষের ভেদ নাই। নারী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে মন্দিরে গিয়ে দেবতার পূজা করে।

মনের কথা মনে চাপা দিয়ে কাদের মৌলবির দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। মৌলবির চেহারাটা অচেনা ঠেকল তার কাছে। দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ধূর্ত হাসি, এই তীব্র শীতের রাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মৌলবির

BanglaBook.org

চোখ দেখে তার মনে হলো যেন সে জলসায় সুরাপানে উন্মত্ত কোনো পুরুষের সামনে বসে আছে। চোখ দুটি যেন হরিদশ্ব জামে মসজিদের ইমাম কাদের মৌলবির নয়, অদৃশ্য কোনো শক্তি তার চোখ দুটি উপড়ে নিয়ে সাবেরি বাঈয়ের কোঠার হাজারো পুরুষের চোখ অথবা যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুরের কামনাদীপ্ত চোখ বসিয়ে দিয়েছে। এমন ঘোলানো কামার্ত দৃষ্টি সে বিস্তর দেখেছে।

বিব্রত গুলনাহার কাঁপা কণ্ঠে বলল, হুজুরের কি মাথা ধরেছে?

হে হে হে... । কদর্য হাসি মৌলবির মুখে। কাঁচা-সুপারি তো! খেতে হয় না, দেখলেই মাথায় ধরে।

শুকনোটা আনতে বলি রেহেনাকে?

এই নিরালায় সে আসার দরকার কী?

জি?

না, বলছি যে, আপনার মনে মসজিদে যাওয়ার যে বাসনা জেগেছে, আমার হাতে হাত রেখে এখন তওবাটা পড়ে নিলে ভালো হয়।

মৌলবির কথাটা বুঝে ওঠার আগেই একটা বাদুড় কি কাঠবিড়াল কামরাঙাগাছটার ডালে বসল। বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে কুয়াশার ফোঁটা এসে পড়ল গুলনাহারের গায়ে। শীতে কাঁটা দিয়ে উঠল তার গা। মৌলবির দিকে তাকিয়ে যতটা সম্ভব গলায় গম্ভীরতা এনে বলল, রাত হয়ে গেছে, আজ আসুন হুজুর।

দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল গুলনাহার। দরজাটি বন্ধ করার আগে দাওয়ার খুঁটি ধরে মৌলবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কী যেন বলতে চেয়েছিল মৌলবি, তার আগেই শব্দ করে শক্ত কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে রাত বেশি হলে ঘাটে নৌকা পাবে না বলে হাঁটার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল হামজা। সকালে চুন আনতে রঙসোনাপুর গিয়েছিল। গঞ্জের একটা দোকানে চুন বিক্রি হয়। ওই দোকানে ফুরিয়ে যাওয়ায় অগত্যা তাকে রঙসোনাপুর যেতে হলো। মসজিদের কাজ প্রায় শেষের পথে, শুধু মিম্বার ও দেওয়ালের পলেস্তারা বাকি। তিনটি দরজা ও পাঁচটি জানালার জন্য জয়গুনপুর থেকে গর্জন কাঠ আনা হয়েছে। কাল বিকেলেই দরজা-জানালার কাজ শেষ করে দিয়ে গেছে মিস্ত্রিরা।

রঙসোনাপুর থেকে একটা জায়নামায কিনে আনতে বলেছিল গুলনাহার, অথচ ফেরার পথে বেমালুম ভুলে গেল হামজা। শেষ বিকেলে রঙসোনাপুর

BanglaBook.org

থেকে ফিরে জায়নামাযের জন্য আবার গঞ্জে যেতে হলো তাকে। ভেবেছিল জায়নামাযটা কিনে এবং কিছু খরচাপাতি করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। কিন্তু কালেক্টর অফিসের কাছে দেখা হয়ে গেল জালাল মির্জার ছোট ছেলের সঙ্গে। খারাপ না ছেলেটা, অন্তত বড় দুই ভাইয়ের চেয়ে ভালো। হামজার দেখা পেলে কিছু না খাইয়ে ছাড়তে চায় না। মিষ্টি দোকানে বসে মসজিদ প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে রাত গেল বেড়ে।

রাত তখন প্রায় দেড় প্রহর। যে আশঙ্কা করেছিল হামজা, শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। খেয়াঘাটে মাঝি নেই। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকারের সঙ্গে মাঘ মাসের ঘন কুয়াশা মিশে ভয়ংকর অবস্থা। এই হিমঝরা রাতে থাকবেই-বা কেন মাঝি? শীতকালে রাত এক প্রহর শেষ না হতেই নৌকা বেঁধে চলে যায় মনাধন মাঝির বেটা শেকু মাঝি। ঘাটে পাল-নামানো কয়েকটি নৌকা আছে বটে, কিন্তু জনমানুষের চিহ্ন নাই। দূরের ঘাট থেকে আসা ছাপ্পরঅলা বড় বড় নৌকায় লোকজন থাকলেও কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। এত রাতে কী করে তাদের ডাক দেয় হামজা? ডাকলেও তারা কি উঠবে? উঠলেও দয়া করে কেউ যে নদীটা পার করে দেবে সে নিশ্চয়তা কোথায়? নানাবাড়ির আবদার শুনে গালাগাল করে বসাটাও বিচিত্র কিছু নয়।

চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে হামজার। জালালের ছোট ছেলেটার উদ্দেশে খারাপ একটা গালি এল মনে। অকারণে তাকে বিপদে ফেলে দিল মির্জার বেটা। সঙ্গে আরেকটা মানুষ থাকলে ব্যবস্থা একটা করা যেত। অবশ্য গঞ্জ থেকে তার পিছু পিছু একটা লোককে সে এদিকে আসতে দেখেছিল। কালীবাড়ি পর্যন্ত এসে ডোঙাতলার দিকে চলে গেছে লোকটা।

জায়নামায ও খরচের পোঁটলা-পুঁটলিগুলো উল্টিয়ে রাখা একটা নতুন নৌকার ওপর রেখে পেশাব করতে বসল হামজা। সেই কখন বেগে পেয়েছে, অথচ ফুরসত পায়নি। পেশাব করতে বসে খেয়াল করল মাঝনদীর দিক থেকে ছলাৎ ছলাৎ বৈঠার শব্দ ভেসে আসছে। কুলুখটা সেদিকে নিক্ষেপ করে সে গলাখাঁকারি দিল। টুশ্ করে শব্দ হতেই ওদিক থেকে হাঁক শোনা গেল—কে?

আবার গলাখাঁকারি দিয়ে জোরগলায় হামজা বলল, আমি।

আমিটা কে?

আমি হরিদশ্বের হামজা।

হরিদশ্বের হামজা? এত রাইতে কী করেন ঘাটে?

লোকটার গলার আওয়াজই বলে দিচ্ছে হামজাকে সে চিনতে পারেনি।

BanglaBook.org

হামজা বলল, গঞ্জে গিয়েছিলাম। নৌকা না পেয়ে বিপদে পড়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজ এল—দাঁড়ান, আসছি। পার করে দেব।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল হামজা। ভাগ্যিস, লোকটা এসেছিল, নইলে সাঁতরে পার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। অবশ্য এই কাজে হরিদশ্বের কমবেশি সবাই অভ্যস্ত। বিপদে-আপদে সাঁতার ছাড়া আর কোনো গতি নেই তাদের। কাঁদো, কাটো, হাতে-পায়ে ধরো বা মাথাকুটে মরো, শত চেষ্টা করেও ঘর থেকে বের হবে না শেকুমাঝি। বাবার চেয়ে সে দ্বিগুণ ত্যাড়া। তাকে বেশি ডাকাডাকিও করা যায় না। ডাকতে গেলে তার বাড়ির কুকুরগুলো বেরিয়ে এসে ঘেউ ঘেউ করে পাড়া মাথায় তোলে।

লগি ঠেলতে ঠেলতে মাঝনদী থেকে ডিঙিটা কিনারে এসে ভিড়ল। পাটাতনের ওপর ছোট্ট একটা কুপি মিটিমিটি আলো ছড়াচ্ছে। ঘন কুয়াশার দুর্ভেদ্য বেড় ডিঙিয়ে বেশি দূর যেতে চায় না আলো। ডিঙায় মোট তিনজন লোক। চরাটের দিকে দুজন বসা এবং গলুইয়ের ওপর লগি হাতে একজন দাঁড়িয়ে। দুজনের মাথা উলের মাফলার কি কানটুপিতে ঢাকা, আরেকজনের চাদরে। আলো-অন্ধকারে ঠিক চেনা যায় না লোকগুলোকে। নৌকায় ওঠার আগে গলাটা টান টান করে মুখে হাসি ঝুলিয়ে হামজা বলল, কে?

চরাটের দিকে বসা দুজনের একজন জবাব দিল, চিনবেন না, রঙসোনাপুর থেকে ফিরছিলাম, উজানে যাব।

হামজা বলল, আমিও গিয়েছিলাম সকালে, বেলা থাকতেই ফিরে এলাম।

লগিটা কিনারের বালুতে ঠেঁসে ধরে নৌকার গলুইটা মাঝনদীর দিকে ফিরিয়ে দিল মাঝি। লোকটাকে ভালো করে ঠাওর করার চেষ্টা করল হামজা। এর আগে কখনো এদিকে দেখেছে বলে মনে হলো না তার। চরাটে বসা লোক দুটি উল্টোদিকে মুখ করে বসে আছে। হামজার দিকে একবার ফিরে তাকানোর দরকার মনে করছে না। হামজা ভাবল, শীতের তীব্রতায় হয়ত গুটিসুটি মেরে বসে আছে তারা। কিন্তু তাদের পশ্চাৎদেশ দেখে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো তার। হঠাৎ মুখ ফসকেই বেরিয়ে এল—দাউদ ভাই নাকি?

দুজনের একজনও জবাব দিল না। লগিটা নিচের দিকে ছাড়তে ছাড়তে মাঝি বলল, আমাকে চেনেন নাকি আপনি?

বিব্রত হামজা বলল, আপনার নাম কি দাউদ?

হ্যাঁ। মৃদু শব্দ করল মাঝি।

মাঝনদীতে গিয়ে নৌকাটা সোজা না চলে ভাটির দিকে ছুটতে শুরু

BanglaBook.org

করল। ভাটির দিকে না তীরের দিকে লগি ঠেলছে মাঝি, ঠিক বোঝা যায় না। হামজা বলল, স্রোত বেশি নাকি ভাই?

তা-ই তো মনে হচ্ছে।

নৌকা ততক্ষণে হায়াত তালুকদারের ঘেরের কাছে চলে এসেছে। খানিক আগে গলুইটা ওপারের দিকে ফিরেছিল বলে হামজা ভেবেছিল ঠিকমতোই বুঝি চলছে নৌকা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ও মাঘের ঘন কুয়াশায় তার মনে হলো নৌকাটা বুঝি ঠিক ওপারের দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু ওপারে পৌঁছতে এত সময় তো লাগার কথা নয়! কুপির মৃদু আলোয় ঘেরের বাঁশ দেখে চমকে উঠল সে। বলল, এই মাঝি ভাই! কোথায় নিয়ে চললেন আমাকে?

মাঝির উত্তর কী ছিল, কিংবা প্রতিউত্তরে হামজা কী বলেছিল, এত রাতে ঘাটে নোঙর করা নৌকার ঘুমন্ত মাঝিরা শুনতে পায়নি।

দুদিন পর ডোঙাতলার পশ্চিমে বাবলাবন পেরিয়ে বড় বালুচরটায় হামজার গলাকাটা লাশ পাওয়া গেল। সাত গ্রামের মানুষ ভিড় করল বালুচরে। কেউ শনাক্ত করতে পারে না ফুলে-ফেঁপে যাওয়া লাশটা। হরিদশ্ববাসীরাও ঘরে বসে থাকল না, দলবেঁধে ছুটে চলল সেদিকে। তারা অকুস্থলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মৃত হামজার নাম সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল।

খবর পেয়ে গঞ্জ থেকে এল খাকি পোশাকের সৈন্যরা, সঙ্গে এল হায়াত তালুকদারও। 'পুলিশ পুলিশ' বলে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। সমবেত মানুষ পুলিশ কী বোঝে না। ভাবে, উলুবনের কোনো দেও-দানব বুঝি। তাই যে যে-দিকে পারল ছুটে পালাল।

লাশ নিয়ে শত শত মানুষের মিছিল ঢুকল গুলনাহারের বাড়িতে। শক্তিহারা, বাকহারা গুলনাহার দাওয়ায় একা দাঁড়িয়ে। যেন সে জাহ্নবী দেবী। শীতের বিকেলে সমগ্র জাজিনগরের একচ্ছত্র মালিক সেই মহীয়সী নারীকে এক নজর দেখার জন্য যেমন গঞ্জের মাঠে শত শত মানুষের ভিড় লেগে যেত, বহুদিন পর যেন একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। কারো মুখে রা নেই। মুর্দা বাড়ি, অথচ বিলাপ নেই। তারু সরকারের মেয়েকে এক নজর দেখার সুযোগ যাদের হয়নি এতদিন, ছল ছল চোখে তারা তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মনে মনে আফসোস করে—আহা রে, এই দুনিয়ায় বেচারিকে দেখার মতো কেউ আর থাকল না।

BanglaBook.org

হামজা ভা-ই! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জসিম। কান্নার ধকলে তার কথাগুলো মুখে জড়িয়ে যায়—আমরা এই খুনের বিচার চাই গুলনাহার। চুপ করে থাকবে না তুমি। আমরা কালেক্টরের কাছে যাব, জমিদারের কাছে যাব, দরকার হলে উদয়াচল গিয়ে মহারাজের কাছে এই হত্যার বিচার চাইব।

বিচার চাইলে হয়ত বিচার করতেন মহারাজ, গুপ্তচরদের মাধ্যমে হামজার খুনিকে খুঁজে বের করে ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারতেন, কিন্তু উদয়াচল যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখাল না গুলনাহার। যে গেছে সে চিরজীবনের জন্যই গেছে। ফিরে তো আসবে না আর। এক শোক চাপা দিতে মাটি খুঁড়ে আরেক শোক বের করে কী লাভ? তা ছাড়া, কই, এমন খবর সে তো শোনেনি, রাজকবি রামগঙ্গা বিশারদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয় কুমার পণ্ডিতের খুনিরা ধরা পড়েছে। ওই খুনের বিচার যেখানে হয়নি, সেখানে হামজা নামের নগণ্য এক প্রজা হত্যার বিচার হবে, কে দেবে তার নিশ্চয়তা?

এমন একটা নির্মম খুনের ঘটনায় গ্রামের মানুষকে বিচলিত করে তুলল। কী হতে পারে খুনের কারণ, কারা করেছে, কোথায় করেছে—ঘরে, বাইরে, উঠোনে, গাছতলায়, রাস্তার তেমাথায়, পুকুর ও নদীর ঘাটে সর্বত্র নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু সময় তো সুধাবতীর স্রোতের মতো বহমান। সুধাবতী তীরের মানুষ যেমন ভুলে গেছে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের আমলে ভয়াবহ ভূমিকম্প ও গর্কির কথা, যেমন ভুলে গেছে খেতে না পাওয়া শত শত ফুলে-ফেঁপে যাওয়া গলিত লাশের কথা, তেমনি একদিন ভুলে যায় তারু সরকারের মেয়ে গুলনাহারের আশ্রিত হামজার কথাও। শুধু ভোলে না গুলনাহার। ঋতুর পরিক্রমায় শীত গিয়ে বসন্ত আসে। কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার ফুল রাঙিয়ে দেয় জাজিনগরের জনপদ। শুষ্ক, রুক্ষ প্রকৃতিতে শুরু হয় প্রাণের সাড়া। কিন্তু দখিনা বাতাস, কোকিলের কুহুতান আর উন্মাতাল করে না গুলনাহারকে। অমাবস্যা গিয়ে পূর্ণিমা আসে, গুনগুন করে গান গেয়ে সুধাবতীর বালুচরের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় না আর। তার জীবনের সব আনন্দ বিষাদে রূপান্তরিত হয়েছে। জালাল মির্জার কবর জড়িয়ে ধরে সে কেবল কাঁদে। মৃত্যুর পর মানুষটা বুঝি সব জেনে গেছে! গুলনাহার তার সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তাই হয়ত সে অভিশাপ দিয়েছে তাকে। নইলে তার স্বপ্নগুলোতে এভাবে ভাঙন ধরল কেন? জীবনসমুদ্রের তীরে কেন সে একা দাঁড়িয়ে? সে জানে না আবার কোন বসন্ত, আবার কোন পূর্ণিমা তার বুক থেকে শোকের এই পাথর নামিয়ে দেবে।

BanglaBook.org

এতদিন মসজিদের বাকি কাজগুলো তদারকির অভাবে শেষ করা যায়নি। একদিন নসির মণ্ডল এসে বলল, যা হওয়ার হয়েছে মা, মসজিদের কাজটা তো এবার শেষ করা দরকার। আল্লাহর ঘর এভাবে খালি পড়ে থাকাটা কি ঠিক হবে?

তার আগ্রহ দেখে সব দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দিল গুলনাহার। মসজিদের বাকি কাজ ধরার আগে হামজার কবরটা পাকা করে দিতে বলল তাকে। জসিমকে সঙ্গে নিয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ল মণ্ডল। পনেরো দিনের মধ্যে কবর পাকাকরণের কাজ শেষ করে মসজিদের কাজ শুরু করে দিল।

বাড়ির পুকুরঘাটে দাঁড়ালে পুবপাড়ের গাছগাছালির ফাঁকে হামজার পাকা কবরের পাশে স্পষ্ট দেখা যায় মসজিদটা। কবরের পাশে মসজিদ, না মসজিদের পাশে কবর—পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তালগোল পাকিয়ে বসে গুলনাহার। এক গম্বুজের মসজিদটা স্মৃতিসৌধ হয়ে ধরা দেয় তার চোখে। অজয় পণ্ডিতের মুখে একদিন শুনেছিল উত্তরদেশের কোনো এক রাজার কীর্তিকথা। পণ্ডিত তার শিষ্যদের বলেছিলেন, সেই রাজা বিস্তর টাকা-পয়সা খরচ করে স্ত্রীর নামে মূল্যবান পাথরের একটা সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। কী যেন নাম সেই রাজার? বর্ষার ঘোলা পানির দিকে তাকিয়ে নামটা মনে করার চেষ্টা করে গুলনাহার। গম্বুজের শিখরে ধাতুর তৈরি চাঁদতারাটি রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠলে মনে মনে সে তওবা পড়ে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কী ভাবছি আমি! এ তো সৌধ নয়, এ তো আল্লাহর ঘর মসজিদ।

বহু চেষ্টা করেও মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখতে পারে না গুলনাহার। নামাজ সে পড়তে জানে না বটে, তবু মসজিদের ভেতরটা এক নজর দেখে আসার ইচ্ছেটা কেন যেন বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অজয় পণ্ডিতের সাহচর্যের কারণেই কিনা কে জানে, মাঝেমধ্যে তার মনে প্রশ্ন জাগে—আচ্ছা, খোদা কি কেবলই পুরুষের? কলন্দরিয়া পীর যে বলেছিল এক লাখ কি দুই লাখ কত হাজার নবীর কথা, তাদের মধ্যে একজনও কি নারী নেই?

প্রশ্নগুলোকে বেশিক্ষণ ঠাঁই দেয় না মনে। এসব প্রশ্নের জন্য বরং অনুতপ্ত হয়। সারাটা জীবন পাপে-তাপে কেটে গেল, এসব ভেবে পাপের পাল্লা কেন ভারী করবে? গত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তো এত টাকা খরচ করে মসজিদ তৈরি করছে। নারীদের মসজিদে যাওয়া হারাম—ধর্মের এই বিধান কেন সে লঙ্ঘন করবে? সে তো ধার্মিক হতে চায়। এখনো নামাজ-কলমা পড়া শুরু করেনি তাতে কি, শিগ্রই করবে। পাকা ঈমানদার হয়ে ওঠার

BanglaBook.org

ইচ্ছে তার। দরকার হলে তহুরাকে মাসখানেক বাড়িতে রেখে ধর্মের সব বিধি-বিধান শিখে নেবে। ধার্মিক হয়ে সামাজিকদের মতোই সে বেঁচে থাকতে চায়। ক্ষুদ্র ইচ্ছেটা না হয় অপূর্ণই থাকুক। মানুষের মনে রোজ কত ইচ্ছার জন্ম হয়, কত ইচ্ছার মৃত্যুর হয়। কী হবে মসজিদের ভেতরে ঢুকে? দূর থেকে তো রোজই দেখতে পাচ্ছে। মনকে সে কঠোরভাবে শাসন করে। কিন্তু মন কি আর শাসন মানে? সুধাবতীর মতোই সে উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল, গতিহারা।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা ছিল সেই রাতে। শেষ শ্রাবণে টানা দুদিন বৃষ্টি লেগে থাকার পর রাত দুই প্রহর নাগাদ হঠাৎ থেমে এল। ঘর ছেড়ে উঠোনে নেমে এল গুলনাহার। আশপাশের বাড়িগুলোতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কে জেগে থাকে এই বাদলা রাতে! সুধাবতী-পারের মানুষ রাতের দুই প্রহর খুব কমই দেখেছে। মসজিদে এশার আজান পড়ার পর তারা আর জাগে না। শুধু ঘুম আসে না গুলনাহারের চোখে। একটু হাঁটাহাঁটি করলে হয়ত ঘুম আসবে, এই ভেবে উঠোন পেরিয়ে সে রাস্তায় উঠে এল। মেঘের আড়ালে ভাঙা চাঁদের কানামাছি খেলা শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। চারদিকে শত শত ব্যাঙের অবিরাম ডাক। তহুরা কি জালাল মির্জা কবে যেন বলেছিল, বাদলা দিনে ব্যাঙেরা তাদের ভাষায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তার নিরানব্বই নাম জপে। অগ্নিকোণে থেমে থেমে বিজলি চমকায়। বিজলির আলোয় গুলনাহারের গলার রুপোর হাঁসুলিটা চকমক করে ওঠে, স্পষ্ট দেখা যায় চুনকামকরা মসজিদের সাদা দেওয়াল, দেওয়ালের ওপর গোলাকার সুদৃশ্য গম্বুজ, গম্বুজের উপর ছুঁচালো শিখর এবং হামজার কবর। সেই কতদিন আগে, বৃষ্টির রাতে যখন রাজ-জলসাঘরের দোতলার বারান্দায় দাঁড়াত, বিজলির আলোয় ঠিক এভাবেই প্রাসাদের মূল তোরণের গম্বুজগুলো দেখা যেত।

হামজার কবর কি বিজলির চমকে ঝকমক করা মসজিদের সোনালি দেওয়ালটা একবার ছুঁয়ে দেখার দুর্নিবার ইচ্ছায় এক পা দুই পা করে সামনে হাঁটতে থাকে গুলনাহার। নারীদের মসজিদে যাওয়া হারাম—হাঁটতে হাঁটতে কাদের মৌলবির নিষেধের কথাটি মনে পড়ে যায়। বিজলির আলোয় রাস্তার ওপর একটা ঘাসমুড়া কি শক্ত ইট দেখতে পেয়ে সজোরে ডান পায়ে লাথি মারল। লাথির চোটে ভেজা মাটিতে গেঁথে থাকা শক্ত বস্তুটি গোড়াসুদ্ধ উপড়ে চোখের পলকে জমিনে পড়ল। অসংখ্য সোনাব্যাঙের টানা ডাক কি নাম জপ থেমে গেল অকস্মাৎ। হাঁটার গতি সে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত, তারপরই আবার ব্যাঙেদের ডাক শুরু হয়। গুলনাহারের পাশে তখন অন্য

BanglaBook.org

কেউ থাকলে দেখতে পেত, মানুষ চলাচলের রাস্তায় এরকম একটা বিপত্তিকর বস্তু পড়ে থাকার কারণে তার দুই চোখে কেমন রক্ত জমে গেছে।

ঢোলের লহরার মতো মেঘ ডেকে উঠল আকাশে। খানিক আগে পশ্চিম আকাশ মেঘমুক্ত ছিল, ওদিকে এখন ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আকাশের রং দেখে মনে হয় কালো মেঘ দখল নিয়েছে চার দিগন্ত। বহেরা গাছটির তলায় এসে দাঁড়াল গুলনাহার। সবুজ পাতা ছুঁয়ে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা তখনো রিমঝিম শব্দ তুলে নতুন-কাটা কুয়াটায় ঝরছে। নালা বেয়ে খলখল শব্দে নামার জমিনে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। মানুষের আনাগোনা টের পেয়ে রুই-কাতলের ঝাঁকবাঁধা পোনাগুলো কুয়ার গভীরে ডুব মারল। এই কয় মাসে হাতের তালুর মতো হয়ে উঠেছে পোনাগুলো।

কুয়ার পাড় ধরে হামজার কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গুলনাহার, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় মসজিদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দুই কপাটের সুচারু কারুকার্যের ওপর হাত বুলাতে লাগল। যেন মা তার সন্তানকে আদর করছে। অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে উঠল তার দেহমন। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে উঠেছে শাড়ির আঁচল। চৌকাঠে শেকলআঁটা কপাট খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একবার থমকে দাঁড়াল। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবল। দূরে কোথায় আকাশভাঙা ঠাটার শব্দে দরজাটা খোলা রেখেই দ্রুত ভেতরের দিকে পা বাড়াল। ঠাটার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই থেমে এল বৃষ্টি। রাস্তার দিকে কার যেন গলার আওয়াজ শোনা গেল। ভয়ার্ত গুলনাহার জড়সড় হয়ে মিম্বারের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কারো কণ্ঠস্বর শোনা যায় কিনা কান পেতে রাখল। না, কোনো সাড়া-শব্দ নেই, শুধু বহেরা গাছের পাতা ছুঁয়ে পড়া জলের রিমঝিম শব্দ শোনা যায়। দরজা গলিয়ে বিজলির আলো ভেতরে এসে ঢুকছে। সেই আলোতে মেহরাবের উপরের দেওয়ালে খোদাই করা আরবি হরফের লেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈশবে পাড়ার মক্তবে কালোকাঠের চওড়া তক্তায় খড়িমাটি দিয়ে ঠিক এভাবেই লিখতেন গওহর মুন্সি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খোদার দরবারে নতজানু হয় গুলনাহার। বাহরাম কলন্দরের খানকায় কালো পর্দার ঘেরের ভেতর উবু হয়ে বসা মহিলাদের চেহারায় অপরাধীর যে ভাবটা দেখেছিল, সেই ভাব এখন তার চেহারায়। তারা যেভাবে হাতজোড় করে বসেছিল, ঠিক সেভাবে দুই হাত জোড় করে বসল সে। খোদার দরবারে এই প্রথম প্রার্থনা তার। সারা জীবন আর একটিবারও এভাবে মোনাজাত করার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু মোনাজাতে কী পাঠ করবে গুলনাহার? তহুরা মোনাজাত ধরে

BanglaBook.org

যেভাবে দোয়া-দরুদ পড়ে, তার কিছুই তো সে জানে না। অদেখা কবিয়াল মীরের গজল গাইলে তার মনের ভেতর যে পবিত্র ভাব সৃষ্টি হয়, সে ভাবল, মোনাজাতে সেই গজল গাইলেই হয়ত খুশি হবেন খোদা। কিন্তু মীরের গজল নয়, স্মৃতির কোঠা থেকে উঠে আসা উত্তর-দেশের কোনো এক কবিয়ালের লেখা গজল গাইতে শুরু করল সে :

ইয়া রব! হামেশা জলতী হী
রহেতী হ্যায় ছাতিয়াঁ
ইয়ে কৈসী আশিকোঁকে
দিলোঁমে রখী হ্যায় আগ?
এক হো কর এক হরি সে
প্রেম করনা চাহিয়ে
সব হরি সে প্রেম জো করে
উস পে রুনা চাহিয়ে।
মাইনে তুজকো দিল দিয়া হ্যায়
তুনে মুজকো কেয়া দিয়া
রোতে রোতে মেরা দিলকো
ফানা ফানা কর দিয়া।

কান্নার ধকলে পুরো গজলটা শেষ করতে পারল না। কম্পিত দুই হাতের তালু চোখের জলে ভিজে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় অবনত হলো। সেজদায় গিয়েও কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। চোখের সমস্ত জল নিঃশেষ না করে বুঝি কান্না থামাবে না। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে সোজা হয়ে বসল। চেহারা থেকে অপরাধীর ভাবটা মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারে আরবি হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। এই মুহূর্তে তার চাহনি দেখে করোরই বুঝতে অসুবিধা হতো না, খোদার ঘরে বসে যেন সে খোদাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সৃষ্টি নয়, স্রষ্টাই যেন এখন করুণাপ্রার্থী। এই নির্জন আঁধার রাতে অবুঝ বান্দার নালিশ শুনতে কুয়ার পানিতে রিমঝিম রিমঝিম শব্দ তুলে মেঘ হয়ে আকাশ থেকে নেমে এল বুঝি খোদা। গুলনাহারের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে চাপা পড়ে যায় সেই শব্দ। সে বলতে থাকে, আমি তো নটী হতে চাইনি খোদা, বাবা-মায়ের আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে তুমিই আমাকে বেশ্যা বানিয়েছ। হায়াত-মউত-রিজিক সবই নাকি তোমার হাতে বাঁধা, সবই নাকি তোমার কুদরত। তা-ই যদি হয়, তবে আমি কেন পাপী হবো? আমার তো কোনো দোষ নেই, সব দোষ তো তোমার।

BanglaBook.org

মসজিদের পাকা দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রশ্নগুলো আবার তার কাছেই ফিরে আসতে থাকে। জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া স্বজন-পরিজনের মুখগুলো একে একে ভেসে উঠতে থাকে মনের আয়নায়। তাতে বেড়ে যায় কান্নার গতি। কান্না ছাড়া কোনো কথাই আর সরে না মুখে। চোখের জলে স্নান করে আবার সেজদায় অবনত হলো সে।

ততক্ষণে দিগন্ত ছাপিয়ে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আকাশ ডেকে ডেকে ঘোষণা করছে, সুধাবতীতে ভয়াবহ বান নামবে।

নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে দাউদের। ইস্, কী ভুলটাই না সে করে ফেলল! সকালে ক্ষেতে যাওয়ার আগে নতুন মসজিদের কুয়ায় গিয়েছিল মুখ ধুতে। লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তার দৃষ্টি স্থির হলো মসজিদের ভেতরে। খোলা দরজা দিয়ে মিম্বারের সামনে সাদা কিছু একটা দেখতে পেল। প্রথমে ভেবেছিল চুনের ছোপ-টোপ হবে বুঝি। তার ধারণার মধ্যেই ছিল না মসজিদে মেয়েলোকের গয়না রুপার তৈরি কোনো হাঁসুলি পড়ে থাকতে পারে।

হাঁসুলিটা লুঙ্গির কোঁচায় নিয়ে সোজা সে হায়াত তালুকদারের বাড়ি চলে গেল। তালুকদার তখন সবে ফজরের নামাজ শেষ করে তসবিহ হাতে দক্ষিণ ভিটার কাঁটাবেগুনের ক্ষেতের পোকা আর কুঁড়ি দেখতে দেখতে বাড়ির দিকে ফিরছিল। দপাদপ পায়ের আওয়াজ শুনে পেছনে ফিরে তাকাল। দাউদের মুখে কথা সরছে না, উত্তেজনায় সে রীতিমতো রুদ্ধবাক। হাঁসুলিটি সে তালুকদারের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

কী? দাউদের নাকের ডগায় লেগে থাকা গাদল সিকনির দিকে তাকিয়ে খানিকটা বিরক্তিভরা কণ্ঠেই প্রশ্ন করল তালুকদার। দাউদের জবাবের আগেই ফের বলল, এ তো দেখছি রুপার জেওর! কোথায় পেলি?

মসজিদে পাওয়া গেল রুপার হাঁসুলি! নাহ্, ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না হায়াতের কাছে। কপালের ঝুনো চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে দাউদেরও গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। রাত করে বাড়ি ফেরার সময় বিজলির আলোয় দূর থেকে মসজিদের দরজার সামনে সে শাড়ি পরা কাউকে দেখতে পেয়েছিল। বৃষ্টি ধেয়ে আসছিল বলে ভালো করে খেয়াল করতে পারেনি। ভেবেছিল মইয়ের উপর হয়ত চটের বস্তা ঝুলছে। এখন তার মনে হচ্ছে চটের বস্তা নয়, শাড়ি পরা একটা মেয়েলোককেই দেখেছিল। কিন্তু এত রাতে মেয়েলোক কেন যাবে মসজিদে? নিশ্চয় জিন-পরী এসেছিল নামাজ

BanglaBook.org

পড়তে। হায় হায় সর্বনাশ! কার হাঁসুলিতে হাত দিল সে! তার গুষ্টি-জ্ঞাতিসুদ্ধ কাউকে তো ছাড়বে না জিন-পরীরা।

ধমক দিল হায়াত তালুকদার, দূর ব্যাটা! ফালতু কথার জায়গা পাস না।

তালুকদারের ধমক খেয়েও তার ভয় কাটে না। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সে তটস্থ, চোখে-মুখে মৃত্যুভীতি। কাঁপা গলায় বলল, কেন, শাহ সুজা মসজিদে জিন-পরীরা নামাজ পড়ে না?

তোর মাথা পড়ে। ছাগল কোথাকার! ওসব মানুষের বানানো কিস্‌সা।

হায়াতের কাছে পাত্তা না পেয়ে বাড়ি এসে বউয়ের কাছে ঘটনাটা বলা মাত্রই খেলো আরেক ধমক। হাঁসুলি পেয়ে সে বাড়ি না এসে তালুকদারবাড়ি কেন গেল—এজন্য বৌয়ের আফসোসের সীমা থাকল না। জিন-পরীরা দাউদের মতো ফকির-মিসকিন নাকি যে রুপার হাঁসুলি গলায় দেবে? তারা দেবে মণি-মুক্তা হিরা-জহরতের গয়না। বিলাপ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার বউয়ের।

তালুকদারবাড়ি যাওয়াটা কত বড় বোকামি হয়েছে, এতক্ষণে বুঝতে পারল দাউদ। অন্তত দেড়-দুই ভরি রূপা। এত দামি একটা গয়না হাতছাড়া হয়ে গেল তার! কেমন ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে গেল হায়াত। মনে হয় না সে আর ফেরত দেবে। হয় নিজের কাছে রেখে দেবে, নয় বলবে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস মসজিদ-মক্তবে দান করে দিতে।

হাঁসুলিটার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ শুরু করল হায়াত। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস আত্মসাৎ করার কোনো লোভ নেই তার, কিন্তু জিনিসটা মসজিদে এল কোথা থেকে, যে করেই হোক এ রহস্যের উদঘাটন করা চাই। নইলে তার স্বস্তি নেই। সে ভাবে, মসজিদে ঢুকে কেউ জেনা করেনি তো! ভাবে আর ছিঃ ছিঃ করে। নিজের গালে নিজে চড় মেরে তওবা পড়ে। তবু সন্দেহটা মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। হতেও তো পারে। কেউ তো আর ইচ্ছে করে হাঁসুলিটা মসজিদে রেখে যায়নি। কারণ তো একটা আছে নিশ্চয়ই। সেই কারণটা খুঁজে বের করতে বাড়িতে ডাকল নসির মণ্ডলকে। শুনে মণ্ডলের চেহারায়ও চিন্তার ছাপ পড়ে গেল। কোম্পানির সৈন্যরা মসজিদে ঢুকে কোনো অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়নি তো! রাত-বিরাতে নদী পার হয়ে মাঝে মধ্যে এদিকে তো আসতে দেখা যায় তাদের। তাদের কাছে কি আর মসজিদ-মন্দিরের মূল্য আছে?

ততক্ষণে ভেতরে গিয়ে হাঁসুলিটা নিয়ে এল হায়াত। জিনিসটা দেখে চমকে উঠল মণ্ডল। বলল, এটা তো মনে হচ্ছে গুলনাহারের হাঁসুলি!

BanglaBook.org

গুলনাহারের? বিস্মিত কণ্ঠ হায়াতের।

হ্যাঁ, ঠিক এরকম একটা হাঁসুলি তার গলায় দেখেছি।

ধূর্ত হাসি খেলে গেল হায়াতের ঠোঁটে। হাঁসুলিটা আসলেই গুলনাহারের কিনা, নিশ্চিত হতে হাঁসুলিটা নিয়ে একবার গুলনাহারের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল। হায়াত বলল, তুমি একা যাবে কেন? যেতে হলে পঞ্চায়েতের সবাই যাবে।

হায়াতের তির্যক কথায় চুপসে গেল নসির মণ্ডল। ভাবল, অনুমানের বশে কথা বলে আবার গুলনাহারকেই বিপদে ফেলল না তো! সূত্র যখন একটা পেয়েই গেছে হায়াত, ব্যাপারটা ঘোলা না করে কি আর ছাড়বে? হাঁসুলিটা গুলনাহারের না হলেও সে তার বলেই গ্রামে যে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চেহারা দেখেই বুঝি তার মনের কথা বুঝে ফেলল হায়াত। বলল, ব্যাপারটা তুমি যত সহজ মনে করছ তত সহজ না মণ্ডল। আমার কাছে খবর আছে, কাল রাতে নতুন মসজিদে মেয়েলোক ঢুকেছিল। তুমিই তো বললে হাঁসুলিটা সরকারের বেটির। তাহলে গুলনাহারই ঢুকেছিল মসজিদে, নাকি?

মণ্ডলের জবানে যেন সিল পড়ে গেল। হায়াতের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে চলে এল গুলনাহারের বাড়ি। মসজিদে হাঁসুলি পাওয়ার খবরটা শুনে হন্তদন্ত হয়ে হাঁসুলিটা সারা ঘরে খোঁজা শুরু করল গুলনাহার। কিছুতেই মনে করতে পারছে না কাল রাতে হাঁসুলিটা তার গলায় ছিল কিনা। তোরঙ্গ, কাঁথা-বালিশ, লেপের ফাঁক-ফোঁকর, কাঠের আলমিরা ও বেতের ঝুড়ি—কিছুই বাদ রাখল না। খুঁজে না পেয়ে অনেকটা অপরাধীর চেহারা নিয়ে নসির মণ্ডলের সামনে এসে দাঁড়াল। তার নীরবতা দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলল মণ্ডল। উঠে যেতে যেতে খেদোক্তি করল, পড়বি তো পড় একেবারে মালির ঘাড়ে।

গুলনাহারের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। মণ্ডলের প্রতি তার রাগ উঠল। হাঁসুলিটা যে তার, সে-কথা মণ্ডল কেন বলতে গেল হায়াতকে? ইস্, কীভাবে যে আংটা খুলে জিনিসটা পড়ে গিয়েছিল! গ্রামে এখন সে একটা হাঙ্গামার আশঙ্কা টের পাচ্ছে। চৌকাঠে হেলান দিয়ে বাজপড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

এক কান দু-কান হতে হতে কথাটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। মসজিদে হাঁসুলি পাওয়া যাওয়ার খবরটা চাউড় করে দেওয়াটা তো হায়াতের ঈমানি দায়িত্ব। এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় এতটা দিন সে মুখ বুজে সব সহ্য

BanglaBook.org

করেছে, সব অপমান হজম করে গেছে। এবার একটা শোধ না তুলে আর থামছে না।

আসরের নামাজের পর জামে মসজিদের কাঁঠালতলায় গ্রামের মুরব্বিরা জমায়েত হলো। হায়াত সেখানে সবার মুরব্বি। উপস্থিত সবার চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ঘটনাটা আসলে কী, হায়াতের মুখ থেকে শুনতে চায় সবাই। হায়াতের সাফ কথা। নসির মণ্ডলের উদ্দেশে সে বলল, মেয়েলোক মসজিদে গেছে, তাও আবার নিশিরাতে! তার মতলবটা জানতে চায় গ্রামবাসী।

রাজ্জাক সারেং বলল, হাঁসুলিটা আসলে কার?

কেন, মণ্ডলই তো বলেছে হাঁসুলিটা সরকারের বেটির। কী মণ্ডল, বলোনি?

পেছনের দিকে বসে ডান হাতে ঘাসের ডগা খুঁটছিল নসির মণ্ডল। বলল, হ্যাঁ, হাঁসুলিটা গুলনাহারের। সে স্বীকার করেছে।

প্রায় বুজেআসা ডান চোখটা আরো বুজে দিয়ে হায়াত বলল, তুমি জানতে চাইলে না আল্লাহর ঘর মসজিদে মেয়েলোকের কী কাজ?

উত্তর দিল জসিম। বলল, এত টাকা-পয়সা খরচ করে গুলনাহার মসজিদ বানাচ্ছে, একটিবার তো সে দেখতে আসতেই পারে। সমাজের ভয়ে দিনে না এসে রাতে এসে একবার ঘুরে গেছে। এতে দোষের কী আছে?

বিদ্রূপ ঝরে পড়ল হায়াতের কণ্ঠে, কোন মাদ্রাসায় উলা পাস দিয়েছ ঠাটা? কেতাবের হুকুম তুমি উল্টে দেবে নাকি?

দাঁত কটমট করে হায়াতের দিকে তাকাল জসিম। ঠাটা সম্বোধন শুনে রক্ত তার মাথায় চড়লেও বহু কষ্টে রাগ চেপে রাখল। হায়াতের এই সম্বোধনের প্রতিবাদ সে কখনোই করতে পারেনি, এখন তো প্রশ্নই আসে না। গোটা গ্রাম তো এখন তার হাতের মুঠোয়।

কাদের মৌলবিকে উদ্দেশ্য করে হায়াত বলল, কেতাব কী বলে হুজুর?

কোরআনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করে কাদের মৌলবি বলল, দেখুন, কেতাব আমার একার সম্পত্তি নয়। তেমনি আল্লাহর ঘরেরও একক কোনো মালিকানা থাকে না। এটা মুমিন-মুসলমান সবার এজমালি সম্পত্তি। মেয়েলোকেরা সবসময় পাক-পবিত্র থাকে না। তাদের মসজিদে ঢোকার ব্যাপারে কেতাবে নিষেধ আছে।

হায়াত বলল, এতদিন তো তা-ই শুনে এসেছি। ঠিক আছে, কথা যখন উঠেছেই তবে কলন্দরিয়া পীরের ফতোয়া আনা হোক। আপনার কথা হয়ত সবার বিশ্বাস নাও হতে পারে। কী বলো মণ্ডল?

BanglaBook.org

নসির মণ্ডল বলল, আমি আর কী বলব। সমাজ যা ভালো মনে করে তা-ই করবে।

কথা ছিল পরদিন শুক্রবার আসরের অক্ত থেকে নতুন মসজিদে পাঞ্জেগানা নামাজের জামায়াত শুরু হবে, সেই সিদ্ধান্ত আপাতত বাতিল ঘোষিত হলো। সকালে গ্রামের মুরব্বিরা কলন্দরিয়া পীরের খানকায় যাবে। পীরের কাছ থেকে ফতোয়া এনে তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে পঞ্চায়েত।

গ্রামের জামে মসজিদের ইমামের ফতোয়ায় বিশ্বাস না করে গ্রামবাসী যাচ্ছে কলন্দরিয়া পীরের কাছে, এটা কাদের মৌলবির জন্য অপমানজনক। হরিদশ্ব জামে মসজিদে প্রায় কুড়ি বছর ধরে সে ইমামতি করছে, হাদিস-কোরআনের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তোলেনি, অথচ সামান্য এই মাসয়ালাটার ব্যাপারে তাকে অবজ্ঞা করল সবাই! অপমান বোধ করাটাই স্বাভাবিক।

পরদিন সকালে গ্রামের মুরব্বিরা বৈষমপুর যাওয়ার জন্য মক্তবঘরের সামনে জড়ো হলেও কাদের মৌলবির অনুরোধে যাত্রা স্থগিত করতে হলো। দিনের প্রথম প্রহর তখন প্রায় শেষ। আরো আগেই রওনা হতো তারা, অপেক্ষা করছিল হায়াতের জন্য। হায়াত এসে পৌঁছানোর খানিক বাদেই মক্তব ছুটি দিয়ে তার কথাটি পাড়ল মৌলবি। বলল, কলন্দরিয়া পীরকে আমি অনেক সম্মান করি। তার কাছে যেতে হলে বিকেলেই যাওয়া হোক। আজ জুমার দিন। খুতবার আগে এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

হায়াত বলল, আপনার আবার কী কথা? যা বলার তো কালই বলে দিয়েছেন।

মৌলবি বলল, কথাটা জরুরি, আপনাদের না থাকলেই নয়।

হায়াত ইচ্ছে করলে মৌলবির অনুরোধ উপেক্ষা করে সবাইকে নিয়ে বৈষমপুর চলে যেতে পারত, কিন্তু সে একা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবার মতামত জানতে চাইল। সবার একই মত—ঠিক আছে, হুজুর যখন এত করে বলছেন, বিকেলে যেতে অসুবিধা কী? মোকতেয়ারের নৌকা ঠিক করা আছে, রাত বেশি হয়ে গেলেও ফিরতে অসুবিধা হবে না।

একটা টানটান উত্তেজনা দেখা দিল সবার ভেতর। শুক্রবার ছিল সেদিন। মসজিদে বড় কোনো শিরনির পাতিল বা তেলের পিঠার কোরা না এলেও মসজিদে হাজির হলো সবাই। অনেকে আজানের আগেই চলে এল। কী বলতে চায় মৌলবি তা জানতে দুপুরের দিকে বেশ কয়বার মক্তবঘরের

BanglaBook.org

আশপাশে ঘুরঘুর করেছে হায়াত। কিন্তু কাদের মৌলবি কোরান তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকায় কথা বলতে পারেনি।

একটু আগেভাগেই মিম্বারে উঠে বসল কাদের মৌলবি। লুঙ্গির বদলে নীল দেওয়া সাদা পায়জামা পরেছে, গায়ে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। দুই ঈদের জামায়াত ছাড়া এমন পোশাক সাধারণত পরে না। তার নীল দেওয়া পায়জামা দেখতে হোক বা জরুরি কথাটা শুনতে হোক, মুসল্লিরা সবাই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে। বয়ান শুরু হলে বারান্দার কাতারের অনেকেই জানালা ও দরজার পাশে এসে ভিড় করল। কাদের মৌলবি প্রথমে গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এই বলে—দেখুন মুসল্লিয়ানে কেরাম, নবীয়ে পাক কারো গীবত করতে নিষেধ করেছেন। হাদিসে এরশাদ হয়েছে, আল্ গীবাতু আসাদ্দু মিনায জেনা। গীবত জেনার চেয়েও বড় পাপ। নবীর উম্মত হিসেবে আমাদের গীবত থেকে দূরে থাকা উচিত। মানুষ একবার ভুল করে যখন খোদার কাছে ক্ষমা চায়, খোদা গাফুরুর রাহিম তাকে মাফ করে দেন। সেক্ষেত্রে বান্দা হিসেবে আমাদের তো মাফ করতেই হবে।

হায়াতের চোখ-মুখ খিঁচে উঠতে লাগল। সরকারের বেটির দালালি করছে নাকি মৌলবি? কথার সুরে তো তা-ই মনে হচ্ছে। মুসল্লিদের উৎকণ্ঠা খানিকটা মিইয়ে এল। হাসির রেখা ফুটে উঠল নসির মণ্ডল ও জসিমের মুখে। কিন্তু কাদের মৌলবি এরপর যে কথাটি বলল তা শোনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

মৌলবি বলল, কিন্তু কেউ যদি বারবার ভুল করে, তাকে ক্ষমা করলে মুমিন-মুসলমানের ঈমান-আকিদা ঠিক থাকে না। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সরকারের বেটি সারা জীবন জেনা করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানতে চেয়েছিল। আমি তাকে মসজিদটা নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে খোদার ঘরে ঢুকেছে। মেয়েলোক মসজিদে ঢোকা কবিরাহ গুনাহ। গুলনাহার কবিরাহ গুনাহ করেছে।

গুলনাহার সম্পর্কে কাদের মৌলবির মন্তব্যটা বুঝে উঠতে খানিকটা সময় নিল মুসল্লিরা। হঠাৎ সবাই বুক টানটান করে সোজা হয়ে বসল। মুহূর্তে মসজিদজুড়ে মৌমাছির ঝাঁকের মতো চাপা গুঞ্জন শুরু হলো। তাতে মৌলবির শেষের কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে হায়াত তালুকদার দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, মসজিদকে আপনারা মাছের বাজার পেয়েছেন? তারপর মৌলবির উদ্দেশে বলল, কী বলেন হুজুর! গুলনাহার সারা জীবন জেনা করেছে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, সে একটা নটী।

ঘটনার আকস্মিকতায় হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ। সমস্বরে সবাই প্রশ্ন ছুড়ে দিল—নটী?

মৌলবি বলল, হ্যাঁ, নটী। মেয়েলোকের মসজিদে ঢোকা হারাম—আমার এই কথা আপনারা কেউ বিশ্বাস করতে চান না। যদি বিশ্বাস না হয় তবে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন সে নটী কিনা। সে মিথ্যা বললে উদয়াচলে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিন হরিদশ্বের গুলনাহার নামের কেউ রাজমহলের মাইনেধারী নটী ছিল কিনা।

সুন্নত নামাজ আদায় তো দূরের থাক, তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কখন দু-রাকাত ফরজ নামাজ শেষ হয়ে গেল অনেকেই খেয়াল করতে পারল না। এমন একটা কথা শোনার পর কি আর এবাদত করার মানসিকতা থাকে?

ভয়ংকর কোনো দুর্যোগ যেমন মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, জুমার নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হরিদশ্ববাসীকেও এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিল নটী গুলনাহার ও তার মসজিদ। আধিয়ার-জোতদার, দেনাদার-মহাজন, শরিয়তপন্থী-মারেফতপন্থী, শত্রু-মিত্র সব একাকার। বসতবাড়ির সীমানা নিয়ে বা জমিনের আল নিয়ে বা গরু-ছাগলের পাল নিয়ে একজনের সঙ্গে আরেকজনের বিবাদ থাকতে পারে, সমাজে বাস করতে গেলে এমন বিবাদ থাকে, কিন্তু নটীর মসজিদ প্রশ্নে সবই ঐক্যবদ্ধ। না, এই মসজিদে কেউ নামাজ পড়বে না। এক অক্তও না। সিদ্ধান্তটি দিয়েছে হায়াত তালুকদার। তার হুকুম অমান্য করার সাধ্য নেই কারো। বহুদিন তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তারু সরকারের বাড়ি দখলের অভিযোগ আনা হয়েছে, সালিশ বসিয়ে তাকে অপমান-অপদস্থ করা হয়েছে। মুখ বুজে সে সব সহ্য করেছে। আর নয়। তার স্থান এখন সবার উপরে। তার ভাবসাব দেখে মনে হয় সে যেন এখন জমিদার অনিমেষ রায়ের চেয়েও প্রতাপশালী। তার হুকুমের গোলাম হরিদশ্বের চাষা-মজুররা। তার অঙুলি হেলনে গ্রামে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। গ্রামের মানুষদের সে আগেই সাবধান করেছিল এই নারীর ব্যাপারে, কেউ শোনেনি তার কথা। শুনবে কেমন করে? বাড়িঘরের জৌলুস আর গতরের রূপ দিয়ে, দু-এক টাকা দান-খয়রাত করে এতদিন গ্রামের আলাভোলা মানুষকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেখেছিল বেশ্যাটা। শেষ পর্যন্ত তালুকদারের কথাই সত্য হয়েছে। সবার মুখেই এখন এক

BanglaBook.org

রোল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই তাহলে সরকারের বেটির আসল রূপ! আগে জানলে কে গ্রহণ করত তার ওসব হারাম টাকা! কে করত তাকে এত সম্মান! যারা তার কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল, দু-চার টাকা ধার-কর্জ এনেছিল, তারা এখন পারছে না সব উগড়ে দিতে, তার মুখের ওপর ছুড়ে মারতে। খোদা তাদের ঈমান-আকিদা দিয়েছে, দেয়নি শুধু ধনদৌলত। সেই ঈমান-আকিদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলল এই বেহায়া বেশ্যা? জেনার টাকায় মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদে নামাজ পড়াতে চাইল গ্রামের মুমিন-মুসলমানদের? কী জঘন্য মিথ্যাচার গ্রামবাসীর সাথে! তার বিচার করবে না খোদা? নিশ্চয়ই করবে। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। খোদা এতদিন তামাশা দেখেছেন। তার ধৈর্যের বাঁধ এখন ভেঙে গেছে। নিশ্চয়ই তিনি এখন গজব নাযিল করবেন। তার ঘর নিয়ে তামাশা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

একটা মানুষও নেই যে কিনা গুলনাহারের পক্ষে কথা বলে। রাগে-ক্ষোভে বেসামাল হয়ে জসিম এসে গুলনাহারের জাত-গোষ্ঠী ধুয়ে দিয়ে গেছে। তার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে নানাজনের নানা কথা শুনতে হয়েছে তাকে। মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশি মনে করত গুলনাহারকে। অথচ তার কিনা এমন চরিত্র! নসির মণ্ডল বা রাজ্জাক সারেং, কেউ এখন সরকারের বেটির সঙ্গে কথা বলা তো দূরে থাক, তার নামটিও মুখে আনতে নারাজ। পারলে তার বাড়িঘরে গিয়ে আগুন দেয়। সবারই এক কথা—বেশ্যা কেনোদিন সতী হয় না। জমজমের পানি দিয়ে গোসল করালেও তার পাপ দূর হয় না। না জানি কত পাপাচার হয়েছে তার বাড়িতে। যে বা যারাই করুক, চোপাভাঙা ওই বদমাশ হামজাকে খুন করে উচিত কাজই করেছে। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে এই নটীর গোপন সম্পর্ক ছিল। দুজনের পাপাচারে অপবিত্র হয়ে গেছে এই বাড়ি, এই হরিদশ্ব গ্রাম। সাত নদীর পানি এনে ধুলেও এই পাপ দূর হবে না।

বিকেলে গ্রামের মহিলারা এসে গুলনাহারের বাড়ির চারপাশে ভিড় করে নানা অশ্লীল মন্তব্য করতে লাগল। ছেলেপিলেরা বুঝে না বুঝে বাড়ির চালে ঢিল মারতে লাগল, তরুণ-যুবকরা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে হাসাহাসি করতে লাগল। সেই হাসি বাঁশের চ্যালি হয়ে গুলনাহারের বুকে গিয়ে বিঁধে। শক্ত করে দরজার খিল এঁটে সে নির্বাক বসে থাকে। লাটিমের মতো ঘুরতে থাকে তার মাথা, শিরায় শিরায় দ্বিগুণ বেগে বয়ে যায় রক্তস্রোত। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। পিতৃভূমি হরিদশ্বের আকাশ-বাতাস গাছ-গাছালি নদীনালা খাল বিল চন্দ্র সূর্য সবই এখন তার বিরুদ্ধে। তার আত্মীয়-স্বজনরা তো আকালের পেটে

BanglaBook.org

চলে গেছে। বেঁচে থাকলেও এখন খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসত তাকে শায়েস্তা করতে। বলত, খেতে পাসনি তো গাঙে ডুবে মরলি না কেন হারামজাদি? তোর মা কি একা আকালের শিকার হয়েছিল? এই দেশের লাখ লাখ মানুষ আকালের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকেনি? বাঁচতে যারা পারেনি তারা মরেছে। কই, কেউ তো কারো মেয়েকে নটী বানায়নি! দূর হ এই গ্রাম থেকে। গলায় ফাঁস দিয়ে মর।

না, গুলনাহারের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও আর গড়ায় না। জোয়ার-ভাটায় সকাল-বিকাল যে নদীর পাড় ধসে, ভয়াল বন্যাকে তার কী ভয়। সারা দিন কিছু খেয়েছে কি খায়নি সেই খবর নেওয়ার মতো কেউ নেই তার। রেহেনা ও যে কয়জন দাসি-বাঁদি ছিল তারা চলে গেছে তাকে ছেড়ে। বেশ্যাবাড়িতে থেকে তারা অপবাদের শিকার হবে কেন?

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামল। গভীর থেকে গভীর হলো রাত। কালপুরুষ নিভে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষের আধো চাঁদ ডুবে যাওয়ার সময় হলো, তবু ঘুমাল না হরিদশ্বের মানুষ। বড় রাস্তায় নারী-পুরুষের গমগম আওয়াজ শোনা যায়। যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। চিরশত্রু ডোঙাতলাবাসীও এখন যোগ দিয়েছে হরিদশ্ববাসীর সঙ্গে। শুধু তারা কেন? নওচান্দিয়া, বৈষমপুর ও পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণের যত গ্রাম আছে সব গ্রামের মুমিন-মুসলমানরা এখন হরিদশ্ববাসীর পক্ষে। দ্বীন-ইসলামের ওপর আঘাত এসেছে। এই আঘাত প্রতিহত করতে হবে শক্ত হাতে। কেউ বলল এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে এই নটীর বাড়িঘরে আগুন দিতে হবে। কেউ বলল কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কেউ বলল ঝাঁটা-জুতোর মালা গলায় পরিয়ে অপমান করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। কারো পরামর্শ আমলে নেয় না হায়াত তালুকদার। এত কাঁচা মাছ খাওয়া লোক নয় সে। হৈ-হাঙ্গামা আর বৃষ্টি-বাদলের ভেতর বিকেলটা কেটে গেছে, কাল সকালেই গ্রামবাসীকে নিয়ে সে বৈষমপুর যাবে। কাদের মৌলবির ফতোয়ায় কাজ হবে না। দোষ তারও কম নেই। একটা নটীকে সে বহুদিন আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। তার টাকায় মসজিদ গড়ার পরামর্শ দিয়ে সে এই গ্রামের মুমিন-মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মরে গেছে জালাল মির্জা, আল্লাহ তাকে বেহশত নসিব করুক, বেঁচে থাকলে তাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ত না হায়াত। গ্রামের মানুষ বলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে কাদের মৌলবিকে। যাক, শেষ পর্যন্ত হলেও সে গোপন কথা প্রকাশ করেছে। এখন কলন্দরিয়া পীর যে সিদ্ধান্ত দেবেন সেই মোতাবেক শাস্তি হবে এই নটীর। হায়াতের বিশ্বাস, জেনার

BanglaBook.org

টাকায় মসজিদ নির্মাণের মতো এত বড় অপরাধের আরো ভয়াবহ শাস্তির ফতোয়া দেবেন কলন্দরিয়া পীর। পীরের ফতোয়া পেলে সে বুকে দ্বিগুণ বল পাবে।

রাত তখন তিন প্রহরের শুরু। অচেতনের মতো সন্ধ্যা থেকে খাটের ওপর শুয়ে ছিল গুলনাহার। চোখে ঘুম ছিল না। সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, এই অবস্থায় কি ঘুম আসে? কী করবে, কী করা উচিত, কার কাছে যাবে—কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। মধ্যরাতে একটু ঘুম এসেছিল চোখে। আবারও দেখল সেই দুঃস্বপ্নটি, সেই দীর্ঘকায় চিত্রল সাপের স্বপ্ন। আগের চেয়ে আরো লম্বা, আরো মোটা। মসজিদের ভিটা ফুঁড়ে সাপটা এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়ছে গুলনাহারের বাড়ির নিচে বিশাল খোড়লের ভেতর।

দুঃস্বপ্নের তাড়নায় কি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। তীব্র ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সামনের দরজায় ঠুক-ঠুক শব্দ শুনে ভয় আরো বেড়ে গেল। কে কড়া নাড়ছে এত রাতে? শোয়া থেকে উঠে বসল। মুখে রা নেই। এত রাতে কে এল, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করল না। দুঃস্বপ্নের তাড়নায় অবিরাম হাঁপাতে থাকে। দরজায় আবারও শব্দ হলো, সঙ্গে ফিসফিস গলার আওয়াজ। কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

কে? মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল গুলনাহার।

আমি জসিম, দরজা খোল।

একটা কপাট খুলে দিল গুলনাহার। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল জসিম। তার গায়ে পাঁক-কাদার গন্ধ। গ্রামবাসীর চোখ ফাঁকি দিয়ে জমিনের আল ধরে সে এখানে এসেছে।

গুলনাহার বলল, আমার গোপন কথা জেনে কাদের মৌলবির মতো তুমিও কিছু চাইতে এলে জসিম ভাই?

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জসিম, গুলনাহারের কথায় বলতে পারল না। সে খানিকটা বিব্রত হয়। সেই সঙ্গে বিস্মিতও। কিন্তু এখন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার মতো সময় নেই তার। হঠাৎ সে গুলনাহারের ডান হাতটি চেপে ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল, বোন, এক্ষুনি তুমি এই গ্রাম থেকে পালিয়ে যাও। তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি তাড়াতাড়ি পালাও।

জসিমের শেষের কথাগুলো কাঁপা কাঁপা, অশ্রুভেজা। একটা চাপা কষ্ট আন্দোলিত হচ্ছে বুকের ভেতর। মেরে ফেলার কথা শুনেও গুলনাহার নির্বিকার। হাত ছাড়ে না জসিম। বলে, আমাকে বিশ্বাস করো বোন। রাত পোহালেই তারা বাড়িতে হামলা চালাবে।

BanglaBook.org

গুলনাহার বলল, তারা বৈষমপুর পীরের খানকায় যাবে না?

আরে ধুর! পীর-ফকিরে মানে নাকি তালুকদার? ওসব তার ভাঁওতাবাজি। ভেতরে ভেতরে সে হামলার ফন্দি করছে। কলন্দরিয়া পীর দয়ার সাগর। আমি জানি, তার কাছে গেলে তোমার মসজিদে নামাজ পড়ার পক্ষেই তিনি ফতোয়া দেবেন। বলবেন, চুন-সুরকি তো আর গুনাহ্ করে না।

জসিমের কথা অবিশ্বাস হয় না গুলনাহারের। দয়ার সাগর বটে কলন্দরিয়া পীর। মনে পড়ে তার সেই কথা—মানবদেহ মহামহিম, ক্ষুদ্র পাপ তাকে নাপাক করতে পারে না।

গুলনাহারের চোখের পাতা ভিজে এল। ইচ্ছে হলো বৈষমপুর ছুটে যেতে, বাহ্রাম কলন্দরের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। জসিমকে খাটে বসতে বলে বাতি জ্বালাল সে। হাতপাখার ঝাপটায় দ্রুত বাতিটা নিভিয়ে দিল জসিম। বলল, সর্বনাশ! বাড়ির আশপাশে যে কেউ পাহারায় নেই তা তো বলা যায় না। কেউ দেখতে পেলে আমাকেও সমাজ থেকে বের করে দেবে।

গুলনাহার বলল, এতই যদি ভয়, তবে এলে কেন?

কেন এলাম জানি না বোন। কেন যেন তোমার জন্য খুব খারাপ লাগছিল।

কী করবে তারা? মেরে ফেলবে? মারলে মারুক।

মুখে হাত চাপা দিল জসিম—আমার চোখের সামনে তোমার কোনো ক্ষতি আমি সইতে পারব না। তুমি আমার ধর্মের বোন।

না, আমি যাব না।

গুলনাহারের গোঁ দেখে ঘাবড়ে গেল জসিম। বহুদিন আগে শরিফা নামের এক তরুণীর নির্মম পরিণতির কথা সে গুলনাহারকে বলল। গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পোয়াতি হয়ে পড়েছিল শরিফা। পঞ্চায়েতের নির্দেশে মসজিদের কাঁঠাল গাছের সঙ্গে তাকে পিছমোড়া বেঁধে খুব মারধর করা হলো। একঘরে করে রাখা হলো তার পরিবারকে। সইতে না পেরে গর্ভের সন্তানটা নিয়ে গলায় ফাঁস দিল বেচারি। গ্রামের গোরস্তানে তার লাশটাও দাফন করতে দেওয়া হয়নি, গাঙের চরে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

শরিফার নির্মম পরিণতির কথা শুনে গুলনাহারের চেহারায় কী প্রতিক্রিয়া হলো অন্ধকারে তা ঠাওর করতে পারল না জসিম। বলল, আর দেরি করো না বোন, কিছু কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। চল, আমি তোমাকে গাঙ পার করে দেব। এই সুযোগ, গ্রামের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

গুলনাহার নিশ্চুপ।

জসিম তাড়া দেয়, চলো চলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

গুলনাহার বলল, আমার বাড়িঘর জায়গা-জমির কী হবে? কার কাছে রেখে যাব?

বেঁচে থাকলে ধন-সম্পদ আসবে জীবনে, মরে গেলে তো সব শেষ। হায়াত তালুকদারকে তুমি চেনো না। সে একটা কালসাপ।

কালসাপ?

হ্যাঁ, কালসাপ। তার মতো জঘন্য কীট জাজিনগরে আছে কিনা সন্দেহ।

চমকে উঠল গুলনাহার। খানিক আগে স্বপ্নে দেখা সেই বিশাল সাপটি যেন অন্ধকারে ফণা তুলে লেজে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সেদিকে তাকিয়ে তার মাথাটা ঘুরে উঠল।

নিজের সঙ্গে লড়াই শুরু করল গুলনাহার। এই ঘর, ঘরের খুঁটি, দরজা-জানালার কপাট, কারুকাজ করা পালঙ্ক, তক্তপোষ, তোরঙ্গ সব কিছু যেন তার দিক চোখ মেলে তাকিয়ে। কী করুণ দৃষ্টি তাদের! যদি তাদের হাত থাকত, গুলনাহারের পা জড়িয়ে ধরত। যদি মুখ থাকত, রাও ধরে কাঁদত। জানালার ফাঁকে অন্ধকারে জোনাকজ্বলা বিলের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল গুলনাহার। মসজিদের দরজা-জানালার জন্য জয়গুনপুর থেকে যে কাঠ আনা হয়েছিল, কিছু কাঠ রেখে দিয়েছিল একটা বজরা বানাবে বলে। দেউড়ির সামনে বৃষ্টিতে ভিজে সেগুলোর ওপর এখন ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। বজরায় চড়ে মাঝ-বিলে গিয়ে গান গাওয়া বুঝি আর হলো না তার।

তারপর কদমগন্ধি ভোর। পুবের আকাশ আলতারাঙা। দিনের প্রথম উৎসবে মেতে উঠল অসংখ্য পাখি। সুধাবতীর বাঁধ ধরে পশ্চিমমুখী হেঁটে চলছে গুলনাহার। হাতে সেই পুরনো থলে, একদিন যে থলে হাতে পিতৃভূমি হরিদশ্বে এসেছিল। ভেতরে কিছু কাপড়-চোপড়, একটা চিরুনি, একজোড়া ঘুঙুর এবং একটা সুরমাদানি। জয়গুনপুরের নির্জন রাস্তা ধরে একদিন যেভাবে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি আজ। সেই পথ দুর্গম ছিল, সেই পথে পাহাড় ছিল, হিংস্র জীবজন্তু ছিল, এই পথে সেসবের কিছু নেই। আছে বর্ষার জলভরপুর বিল, বিলের জলে কচুরিপানার দঙ্গল, আছে সুধাবতীর তীব্র স্রোত, স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলা খড়কুটো। সারা রাত মাথার ভেতর চেপে বসা জেদের ওপর স্থির ছিল সে। অনেক আকুতি-

BanglaBook.org

মিনতি করেছে জসিম, পালিয়ে যেতে রাজি করাতে পারেনি তাকে। তার এক কথা—কপালে যদি জন্মভূমির মানুষের হাতে আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তবে এ গ্রামেই হোক আমার কবর, হামজার কবরের পাশে।

কিন্তু ভোরে যখন ভেজা বাতাসে কদমফুলের গন্ধ এসে ঝাপটা দিল তার নাকে, এক মধুর আবেশে বুক টানটান করে দাঁড়াল সে। তার চেহারায় তখন অপার্থিব জ্যোতি ফুটে উঠল। পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি এক দুরন্ত টান অনুভব করতে লাগল। নিজেই নিজেকে বলল, আমার জীবনসূর্য তো এখনো মাঝ-আকাশে। সন্ধ্যা নামতে তো এখনো অনেক দেরি। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাই। প্রতিদিন ভোরের পবিত্র আলো দেখতে চাই। গোলাপের ঝাড়, ঘাসের ওপর পড়ে থাকা হলুদ-বোঁটার শেফালি দেখতে চাই। আরো কিছুদিন জোনপহরের মুগ্ধতা পেতে চাই। শিরীষ ও মেহগনির ছায়ায়, অশোক আর জুঁই-চামেলির ফুলে ঢাকা পথে আরো কিছুদিন হাঁটতে চাই। আমি চলে যাব, এক মুহূর্তও আর এই গ্রামে থাকব না। আমি বাঁচতে চাই।

ভোরের নির্জন পথ। কোথাও কেউ নেই। গুলনাহার হঠাৎ দেখতে পায়, দূরে একটা থলে কাঁধে এক বুড়ো লাঠি ঠুকে ঠুকে হরিদশ্বের দিকে আসছে। আকন্দ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল গুলনাহার। বুড়ো তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় কী বুঝে হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার চোখের কোণে পিঁচুটি, মুখে সাদা দাড়ি, কাপড়-চোপড়ে ধুলোবালির আস্তর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোকটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে উঠল হঠাৎ। অশ্রুতে ভিজে যেতে লাগল তার দুই চোয়াল।

গুলনাহার বলল, এই পথ কোথায় শেষ হয়েছে কাকা?

লোকটার মুখে দাঁত নেই। চোখ মুছে কাঁপা কণ্ঠে সে বলল, এই পথের তো শেষ নেই গো মা। কত গ্রাম, কত পরগণা, কত রাজ্যের বুক চিরে পানামনগর হয়ে বহু দূরে চলে গেছে।

বুড়ো হঠাৎ কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতে আবার হাঁটতে শুরু করল। তার পানে তাকিয়ে রইল গুলনাহার। লোকটিকে খুব চেনা মনে হয় তার। চোখের আড়াল হয়ে গেল বুড়ো, তবু সে তাকিয়ে রইল তার চলে যাওয়া পথের দিকে।

ততক্ষণে ভোরের সূর্য হেলান দিয়েছে পুবের আকাশে। সূর্যের আলোয় চিকিয়ে উঠছে নতুন মসজিদের সুদৃশ্য গম্বুজ। গুলনাহার ভাবে, একদিন

BanglaBook.org

ঘোর বর্ষায় সুধাবতীতে বান ডাকবে। খাল-বিল ঘরবাড়ি ভাসিয়ে ধানি জমিনে পলি জমিয়ে উজান দেশের পানি ভাটির দেশে নামবে। উত্তাল স্রোতে ঝুরঝুর শব্দে ভেঙে পড়বে সুধাবতীর বাঁধ। ভাঙতে ভাঙতে ভাঙন হয়ত মসজিদ পর্যন্ত ঠেকবে। মসজিদটি হয়ত স্রোতের তোড়ে ধসে পড়বে, স্রোতে ভেসে যাবে। কে জানে, হয়ত কালের সাক্ষী হয়ে টিকে থাকবে বহু বহু দিন।

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে আবার হাঁটতে শুরু করল গুলনাহার। কোথায় যাচ্ছে সে? কে জানে। এই পথ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে তার হদিস! হাঁটতে হাঁটতে গুলনাহার শুনতে পায় ঘুঙুরের শব্দ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোনো এক জলসাঘরে নৃত্যরতা এক নটী। কোথা থেকে আসছে এই শব্দ? যেখানে ভিনদেশের জাহাজ ভিড়ে সেখান থেকে?

গুলনাহারের মনের আয়নায় উঁকি দেয় বহু দূরের পানামনগর।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org